*Bastubadtadir Bharat Jignasa*

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক :
রুশো মিত্র
সাহিত্য প্রকাশ
৬০, জেমস লঙ্ সরণি
[ আগের সত্যেন রায় রোড ]
কলকাতা : ৭০০০৩৪

মুদ্রক :
শ্রীমতী রেখা দে
শ্রীহরি প্রিণ্টার্স
১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলকাতা : ৭০০০০৪

পল্লব ও ছন্দা মা-মণিকে

# বস্তুবাদীর ভারতজিজ্ঞাসা

ভারত ইতিহাসের ব্যাখ্যার গতানুগতিক যে ধারাটি এতদিন চলে এসেছে, পরিবর্তিত যুগ ও জীবনের আলোয় আজ তার কিছুটা অদলবদল দরকার। সেই দিককার কয়েকটি কথাই বলছি এখানে। বৈদিক আর্যেরাই প্রথম ভারতে সভ্যতার আলো জ্বালিয়েছিলেন এবং ভারতের বর্তমান সভ্য জাতি গোষ্ঠীগুলি সবাই আর্য সন্তান, এই ছিল আমাদের পুরান দিনের ধারণা। এই ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পার প্রান্তিক অনুসন্ধান প্রমাণ করেছে যে বৈদিক আর্যদের ভারতে আসার অনেক আগেই এবং যীশু খ্রীস্টের হাজার তিনেক বছর আগেই ভারতবর্ষ সভ্য দেশ ছিল। সে সভ্যতা বয়সে মিশর ও সুমেরীয় সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক এবং ঠিক ঐ দুই সভ্যতার মতই উন্নত। এঁদের হাজার দুই বছর পরে বৈদিক আর্যেরা ভারতবর্ষে এসে বসতি স্থাপন করেন। আর্যেরা ছিলেন যাযাবর জাতি। তাঁরা লোহার ব্যবহার জানতেন এবং আরণ্যক ঘোড়াকে পোষ মানাতে শিখেছিলেন। এ দুইয়ের সাহায্যেই তাঁরা উত্তরাপথ দখল করে নেন। তত্রত্য অধিবাসীদের এক অংশ পালিয়ে যান পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে, অপরাংশ উত্তরেই থেকে যান, বিজয়ী আর্যদের দাস রূপে। এঁরাই হলেন ভারতের শূদ্র জাতি, সংখ্যায় এঁরা ভারতের প্রায় বার আনা অংশ। এই প্রাগার্য জাতিরা পরাজিত হয়েছিলেন বলেই, তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্নগুলি মুছে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এবং প্রচার করা হয়েছে যে তাঁরা অসভ্য জাতি ছিলেন। অনার্য শব্দটাই চলিত হয়েছে অসভ্যের প্রতিশব্দ রূপে। কিন্তু আজ জানা যাচ্ছে, তাঁদের নগরবিন্যাস, গৃহনির্মাণ প্রণালী, ভাস্কর্য, অঙ্কন, লেখন, বয়ন, সবই ছিল উন্নত পর্যায়ের এবং আর্যেরা তা থেকেই বেশীর ভাগ শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁদের ধর্ম এবং পূজাপদ্ধতিও ছিল নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত, যার অনেকটুকুই আর্যদের শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছে। আজকের হিন্দুধর্মের প্রচলিত পূজাপ্রতীক ও রীতি-পদ্ধতিগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করলে, এখনো তার অনেক নিদর্শনই পাওয়া যাবে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়েছে।

তাঁরা পিতৃদেবতা ও মাতৃদেবতার পূর্ণাঙ্গ বা খণ্ডিত প্রতীকসমূহ পূজো করতেন এবং সৃষ্টি-কর্তারূপী-ব্রহ্মা, পালন-কর্তারূপী-মিত্র [ বিষ্ণু ] ও সংহারক-রূপী রুদ্র, পিতৃদেবতার এই ত্রিমূর্তি, আর জননীরূপিণী অম্বা, বসুমতীরূপিণী ভবানী ও সামর্থ্যরূপিণী শক্তি, মাতৃদেবতার এই ত্রিমূর্তি ছিল তাঁদের আরাধ্য। কালক্রমে এই আদি পিতৃদেবতা ও মাতৃদেবতা পরস্পর সম্মিলিত হয়েছেন

সঙ্গে ধর্ম নিয়ে, সামাজিক ও রাজনীতিক অধিকার নিয়ে একটানা লড়াই-ই করে চলেন। সার্থক সমন্বয় কোন দিন হয় নি, যদিও চেষ্টা হয়েছে বরাবরই। সব শেষে আসেন ইংরেজরা এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্য পর্ব থেকে বিশ শতকের মধ্য পর্ব পর্যন্ত, প্রায় দুশো বছর হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই করে রাখেন পদানত। এই বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রধানত হিন্দুরাই লড়াই চালান, মুসলমানরা বা তথাকথিত অনুন্নত হিন্দুরা খুব কমসংখ্যকই তাঁদের সহযাত্রী হন। পুরাতন ঐতিহাসিক শত্রুতাই বাধা হয়েছে তার। শিক্ষার অভাবও আর একটা কারণ।

শেষোক্ত দুই শ্রেণীই ইংরেজের কাছে নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী পৃথক রাষ্ট্র দাবী করতে থাকেন। অবশেষে ইংরেজ শাসন শেষ হয়, মুসলমানদের জন্যে পূর্ব ও পশ্চিমের বৃহৎ দুই ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান স্বীকার করে নিয়ে এবং সৌভাগ্যবশত অনুন্নত বলে কথিতদের ভারতীয় রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে রেখেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত বর্ণহিন্দু ও অসবর্ণ হিন্দুতে সত্যকার মিল হয়েছে কি? সমাজের অন্তর্লোকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে যে তা হয় নি। তাহলে ভারতেতিহাস পর্যালোচনার এই সংক্ষিপ্ত ছকে আমরা কি দেখলাম? দেখলাম যে বহিরাগত আর্যেরা এ দেশের পরাজিত সংখ্যাগরিষ্ঠ আদি বাসিন্দা অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের যখন থেকে শূদ্র বা অস্পৃশ্যরূপে চিহ্নিত করে মানবাধিকারে বঞ্চিত করেছেন, তখন থেকেই জাতীয় ইতিহাসে অনৈক্যের বিষবৃক্ষ শিকড় গেড়েছে। বৌদ্ধদের সাম্যবাদ, ইসলামের গণতন্ত্র, বৈষ্ণবও সন্তদের সমন্বয় বাদ, খ্রীষ্টানদের মানবতাবাদ, কিছুই এ দেশে সর্বাত্মক ঐক্য এবং মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। হাজার পাঁচেক বছর ধরে সেই আদি আর্য-প্রাগার্যের বিরোধই নানা আকারে ও প্রকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে। একরাষ্ট্রিক ও একজাতিক সংগঠন কোনদিনই দানা বাঁধে নি। আজও দেখছি স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতে নানা খণ্ডস্বার্থ দিকে দিকে নানা অজুহাতে মাথা তুলছে। ভারতেতিহাসের এই গলদের জায়গাটা তাই আমাদের চিনতে হবে এবং সর্বপ্রযত্নে একে অপসারিত করেই নতুন ভারত গড়তে হবে। শুধু বেদ-উপনিষদ ও রামায়ণ-মহাভারতের মহিমাকীর্তনে এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের নীতিবিশুদ্ধি, আর বৈষ্ণব ও সাধুদের প্রেমদর্শন-ব্যাখ্যানে তন্ময় হয়ে বাস্তব ভুললে, আমরা কিছুতেই বাঁচব না। এত বড় ঐতিহ্যের সঞ্চয় নিয়েও কেন জাতি হিসাবে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে

পারলাম না, স্পৃশ্যে অস্পৃশ্যে হিন্দুতে মুসলমানে, বাঙালী বিহারীতে, তামিল তেলুগুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলাম, আর তারই ফলে গ্রীক হুন আফগান তুর্কী ইংরেজ ফরাসী পর্তুগীজ, সকলের হাতে বার বার মার খেলাম, তার রহস্য ভেদ করতে হবে।

কে না জানেন দ্বাদশ শতকে যে মুসলীম অভিজেতারা ভারতে এসে শাসন কর্তৃত্ব অধিকার করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন মুষ্টিমেয়। এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করেই তাঁরা মুসলীম সংহতি তৈরি করেন এবং বিশ শতকে আমরা দেখলাম, তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আট কোটি। আর দেখলাম স্বতন্ত্র ধর্ম ও সংস্কৃতির দাবীদার রূপে তাঁরা ভারতবর্ষকে দুভাগ করে পৃথক একটি দেশ গড়ে নিলেন। এই নতুন দেশটি ইদানীং এক গৃহযুদ্ধের পর আবার দুই দেশে বিভক্ত হয়ে গেছে। দক্ষিণের দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগামও একই-ভাবে প্রাগৈতিহাসিক আর্য ও আর্যেতর গোষ্ঠী-বিরোধের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র দ্রাবিড়ভূমি চেয়েছিলেন। তাঁদের আন্দোলন আপাতত দমিত হয়েছে, কিন্তু মানসিকতা বদলায় নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত সমন্বয় হয় নি আমাদের জীবনচিন্তা ও সমাজ-মানসিকতায়, যা হয়েছে মার্কিন মল্লুকে বা সোভিয়েট রাষ্ট্রে। কত বিচিত্র জাতি ধর্ম ও সংস্কৃতির খণ্ডাংশ নিয়ে অখণ্ড এক জাতিত্বে উন্নীত হয়েছেন তাঁরা! অবশ্য আমাদের সমাজ-সৌধের উপর তলায় সাজান একটা ঐক্য দেখা যায়, যা মূলত সাংস্কৃতিক এবং জীবনের বাস্তব সংস্থিতির সঙ্গে যার সম্পর্ক অল্পই। ভাবের রাজ্যে আমরা সর্বজীবে ব্রহ্মের স্থিতি প্রচার করেছি, অথচ মানুষকে অচ্ছ্যুৎ করে রেখেছি। নীতি হিসাবে অহিংসা, অস্তেয় ও বৈরাগ্য প্রচার করেছি, কিন্তু কার্যত হিংসা দুর্নীতি ও ভোগলালসাকেই পদে পদে প্রশ্রয় দিয়েছি। অন্যান্য জাতির তুলনায় বাস্তব মানবপ্রীতি আমাদের যথেষ্ট কম, সমাজ মঙ্গলের চেতনা অনেক অপরিস্ফুট, যদিও এ সম্বন্ধে শাস্ত্রবচন পাওয়া যাবে আমাদের দেশেই সব চেয়ে বেশী। আমার ধারণা ইতিহাসের কল্পনাত্মক ব্যাখ্যা দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করার ফলেই ঘটেছে এই স্ববিরোধিতা। এ পাঁক থেকে মুক্ত হতে হলে, যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোয় সমগ্র ইতিহাসের পুনর্বিচার দরকার। সে কাজের যোগ্য মানুষ আমি নই। আমি শুধু গোঁজামিলের সূত্রগুলো ধরিয়ে দেবার এবং তা থেকে কি ভাবে দ্রুত বেরিয়ে আসা সম্ভব, তারই যৎসামান্য আভাস দেবার চেষ্টা করছি এই আশায়

যে প্রকৃত অধিকারীরা কোনদিন অবহিত হবেন এ সম্বন্ধে ?

## । কাল্পনিক ইতিহাস বনাম ঐতিহাসিক কল্পনা ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে কতকগুলি অলীক বিশ্বাস ও আজগুবি ধারণা চলতি আছে। বিশিষ্ট লেখক বা যশস্বী জননেতা শ্রেণীর মানুষরাই এই সব ধারণা সৃষ্টি করেছেন। আর তার ফলেই সর্বজনের মধ্যে এরা সত্য প্রত্যয় রূপে চলিত হয়েছে। সত্যকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে এই বাজার-চলিত প্রত্যয়গুলির মূল্য যাচাই ভিন্ন ভারতবর্ষকেও আমরা চিনব না, ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমাভিব্যক্তির স্বরূপও বুঝব না। বর্তমান প্রবন্ধে এই চলতি ধারণার কয়েকটিকে যাচিয়ে বাজিয়ে দেখার চেষ্টা হচ্ছে। প্রথমে আলোচ্য হল বৈদিক আর্যেরাই পৃথিবীতে প্রাচীনতম সভ্যতার অধিকারী কিনা এবং মানব সংস্কৃতির মুখ্য শাখাগুলি সবই এই সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত কিনা ? দ্বিতীয় আলোচ্য হল ভারতবর্ষে কোনদিন তপোবন সভ্যতার যুগ সত্যিই দেখা দিয়েছিল কি না এবং মুনি-ঋষি শ্রেণীর মানুষরা সমাজ ও সংস্কৃতির নেতৃত্ব করতেন কি না ? তৃতীয় আলোচ্য হল ভারতীয় সমাজ-মানস ও জীবন দর্শনের প্রবণতা চিরদিন সমন্বয়ের অনুকূল কি না ? অর্থাৎ বিরোধের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্যের মধ্যে ঐক্যকেই ভারতবর্ষ চিরদিন কাঙ্ক্ষিত মনে করেছে কি না ? আসলে প্রশ্ন তিনটি পরস্পর-সংলগ্ন এবং যে কোন একটা ধরে আলোচনায় অগ্রসর হলে অন্য দুটির কথা কিছু না কিছু আপনিই এসে পড়বে। তবু আমি চেষ্টা করব তিনটি প্রশ্নকে পৃথক পৃথক রেখেই বিশ্লেষণ করতে, পাঠক পাঠিকার বিষয়টি প্রণিধান করতে সুবিধা হবে বলে। তাছাড়া প্রশ্ন তিনটির মধ্যে গুরুত্বের তারতম্য আছে, যা পরিষ্কার করে তুলে ধরা না হলে, তালগোল পাকিয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

প্রথম কথা বৈদিক আর্যসভ্যতার প্রধান নিদর্শন ঋক্‌বেদ খ্রীষ্টজন্মের হাজার দেড় বছর আগে সংকলিত হয়েছিল, অধিকাংশ পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, তার ভাষাতাত্ত্বিক বিচার থেকে। কাজেই তার আরো শ-তিন চার বছর আগে আর্যেরা ভারতে এসেছিলেন ধরা যেতে পারে। সুমের মিশর ও মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা এর চেয়ে প্রাচীনতর এবং এই শেষোক্ত তিন সভ্যতা যেমন প্রায় সমসাময়িক, তেমনি জাতি প্রকৃতিতেও একে অন্যের ঘনিষ্ঠ। সুতরাং বৈদিক আর্যদের যে ধারা ইরাণ হয়ে মধ্যপ্রাচ্য গ্রীস ও দূরবর্তী পশ্চিমে ব্যাপ্ত হয়েছিল, পূর্বাঞ্চলীয় সভ্যতার তা অনুজ, এ প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানেই

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গত বক্তব্য যে বেদ ও বেদানুগামী সাহিত্য-গ্রন্থগুলি ছাড়া বৈদিক সভ্যতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন কিছুই হাতে আসেনি আমাদের। এ থেকে অনুমান করা হয় যে বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামীণ, তাই তার কোন প্রাত্মিক উপকরণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। পক্ষান্তরে মহেঞ্জোদাড়ো, হরাপ্পা ও নর্মদা উপত্যকায় যে প্রাক্‌বৈদিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল সমৃদ্ধ নাগরিক সভ্যতা। তাই সেখানে যে সব মনোরম পথঘাট, পয়ঃপ্রণালী, কোঠাবাড়ী ও স্নানাগার তৈরি হয়েছিল, তার ভগ্নাবশেষ এখনো রয়েছে। তত্রত্য মানুষের উন্নত শিল্পরুচির নিদর্শন রূপে খেলনা, তৈজস, অলংকার, অংকন, ভাস্কর্য, নানা জিনিস হাতে এসেছে আমাদের। এছাড়া তাঁদের পূজাপ্রতীক ও ধর্ম পদ্ধতির আংশিক পরিচয়ও আমরা পেয়েছি পোড়া মাটিতে উৎকীর্ণ নানা মূর্তি থেকে, যার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। এ থেকেই আমার অনুমান যে তন্ত্রই ছিল এঁদের আদি ধর্মগ্রন্থ এবং সাংখ্য ও বৈশেষিক এঁদেরই দর্শন। তন্ত্রোক্ত নানা আভিচারিক প্রক্রিয়া ও কৃষ্ণ-বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক লক্ষ্য করে বোঝা যায় যে অথর্ব বেদও এঁদেরই বেদ, যা আর্যরা মেনে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনের যে বস্তুবাদী ধারাটি আর্যদর্শনের চাপে দমিত হয়েছে, তা এঁদেরই সৃষ্টি। তার মানে ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান গণিত রসায়ন চিকিৎসা ইত্যাদিরও আদি প্রবর্তক এঁরা। এ সভ্যতা এঁরা কোথায় পেয়েছিলেন? কোথায় পেয়েছিলেন এঁদের জ্ঞাতি-গোত্ররূপী মিশর ও ব্যাবিলনের মানুষেরা? নিশ্চয় বেদ থেকে নয়। মহেঞ্জোদাড়ো লিপির পাঠোদ্ধার হলে এই রহস্যের যবনিকা আরো কিছুটা উন্মোচিত হবে হয়ত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত। তপোবন সভ্যতা নামক কোন সভ্যতার সন্ধান ইতিহাস-সম্মত যুগ বিভাগের মধ্যে পাওয়া যায় না। ভারতীয় সমাজ বিকাশের ইতিহাসে দেখি, খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ নাগাদ প্রাক্‌-বৈদিক ও বৈদিক সভ্যতার সম্মেলন থেকে ধীরে ধীরে মিশ্র একটা সমাজ ও সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে, যার নাম হিন্দু সংস্কৃতি। এর আগে যে সংঘাতের অধ্যায় গেছে তার পটভূমিটা পাওয়া যায় রামায়ণে, যাতে আর্যাবর্তের রাম দক্ষিণ প্রত্যন্তের রাজা ও রাজ্যগুলিকে পর্যুদস্ত করে উত্তর দক্ষিণে সংযোগ স্থাপন করেন। আর মহাভারতে পাওয়া যায় ক্ষমতাকামী হিন্দুদের স্বগৃহ বিরোধের পটভূমিটা, যাতে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ বিবদমান আর্যগোষ্ঠীর এবং আর্য-অনার্যের মধ্যে আবির্ভূত হন সাম্য-সংস্থাপকের ভূমিকায়। এঁরা ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছেন

ঈশ্বরাবতার রূপে এবং এঁদের কীর্তি কাহিনী মহাকাব্যে বিবৃত হয়েছে, যদিও আসলে কিন্তু এঁরা উভয়েই প্রাগৈতিহাসিক ভারতের লোকনেতা। আর এঁদের আবির্ভাব কাল ধরতে হবে খ্রীষ্ট জন্মের হাজার খানেক বছরের মধ্যে বা কিছু আগে পরে। এই হাজার খানেক বছর অবশ্য ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে খুবই সমুন্নতির কাল, কারণ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত ভাগবত পুরাণ স্মৃতি ও ষড়দর্শন এ সময়ের মধ্যে রচিত হয়েছে। তবে ভারতীয় সংস্কৃতির বৃহত্তর গৌরবের অধ্যায় যেটি, তা দেখা দেয় আরো পাঁচ-ছশো বছর পরে, বুদ্ধের আবির্ভাব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিস্তারের পর। কারণ পাণিনি, কৌটিল্য, নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, ভাস্করাচার্য, বরাহমিহির, চরক, সুশ্রুত, কেউই সনাতনী হিন্দু ছিলেন কিনা সন্দেহ। বরং অনেকে বৌদ্ধ ছিলেন বলেই জানা যায় এবং বৌদ্ধদের খুব বড় একটা অংশই ছিলেন প্রাগার্য জাতি গোষ্ঠীভুক্ত। কাজেই তাঁরা তাঁদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারই বৌদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত করেছিলেন, একথা মনে করা যেতে পারে অনায়াসে। সুতরাং যে-যে জ্ঞানকে আমরা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দান বলে প্রচার করি, তার অনেকটুকুই যে বৈদিক আর্যদের কীর্তি নয়, একথা নিয়ে বোধ হয় তর্কের অবকাশ নেই।

২.

পূর্বের অধ্যায়ে অনবধানতা বশত একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। এখানে সেটা বলে নিই। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পার সভ্যতা যে প্রাক্-বৈদিক সভ্যতা,এ বিষয়ে বেশীরভাগ বিশেষজ্ঞই যদিও একমত, তবু কেউ কেউ, যেমন স্বামী শঙ্করানন্দ, ভিন্নমত পোষণ করেন। স্বামীজী বলেন, বৈদিক সভ্যতার কোন প্রাত্নিক নিদর্শন পাওয়া যায় না, একথা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে মহেঞ্জোদাড়ো, হরাপ্পা ও লোথালের সভ্যতা বৈদিক সভ্যতাই। আর্যেরা মধ্যএশিয়া থেকে ভারতে এসে পাঞ্জাব ও সিন্ধুতীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই সিন্ধুকে গ্রীকরা বলেছেন ইণ্ডুস, আরবরা বলেছেন হিন্দু এবং অভিধাটি পরে দেশ ও জাতি উভয়ের পরিচায়ক সংজ্ঞায় পরিণত হয়েছে। মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতাতে যে স্তরভেদ দেখা যায়, তাঁর মতে তা হল বৈদিক সভ্যতারই ক্রমবিকাশের নির্দেশক। বলা দরকার যে একথা যুক্তিসিদ্ধ নয় কোন মতেই। আর্য ও আর্যেতর জাতিগোষ্ঠীগুলির সংমিশ্রণের ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরই তথাকথিত হিন্দু জাতির উৎপত্তি হয়। তখনই অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ নাগাদ আর্যেতর

জাতিদের শিব-শক্তি প্রতীক আর্য পূজায়তনে স্থান পায়। আদি আর্যদের মধ্যে যে একমাত্র নিসর্গদেবতাদের উপাসনাই চলিত ছিল, বেদই তার প্রমাণ। কিন্তু আর্যেতর সমাজে শিব-শক্তিই ছিলেন প্রাচীনতম দেবতা, যাঁর নিদর্শন মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া যায়। তাছাড়া বেদে দেখা যে আর্যেরা লোহার ব্যবহার জানতেন, আরণ্যক ঘোড়াকে তাঁরা পোষ মানিয়েছিলেন। লক্ষণীয় যে মহেঞ্জোদাড়োর শীলমোহরে এত প্রাণী আছে, ঘোড়া নেই। সেখানকার লোকে যে তামার ব্যবহার জানতেন, লোহার নয়, তারও প্রমাণ মাটি থেকে মিলেছে। এ সবই তাঁদের বেদ-পূর্বকালীনতার নিঃসংশয় সাক্ষ্য নয় কি ?

কিন্তু ও কথা থাক। আমরা আমাদের পূর্বের আলোচনাতে ফিরে আসি। বাস্তবিকই তপোবন সভ্যতার যুগ বলে কোন যুগ ভারতবর্ষে প্রকাশমান হয়নি কোন দিন। খ্রীষ্টের হাজার তিনেক বছর বা আরো কিছু বেশী আগে থেকে বুদ্ধের কাল পর্যন্ত, এই দীর্ঘ অধ্যায়টি হল ভারতেতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক যুগ, যাকে প্রাকবৈদিক, বৈদিক ও পৌরাণিক, এই তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে বুদ্ধের আবির্ভাব থেকে পরের পর মৌর্য সুঙ্গ গুপ্ত প্রভৃতি বংশের ঐতিহাসিক যুগারম্ভ। এই দীর্ঘ পথে পরিক্রমা করলে আমরা দেখি, প্রধান প্রধান গ্রামে তখন পণ্ডিতদের চতুষ্পাঠী ছিল, অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের ছেলেরা সেখানে এসে থাকতেন এবং ব্যাকরণ অলংকার কাব্য দর্শন ও জ্যোতিষ পড়তেন। বলা বাহুল্য চতুষ্পাঠীর পরিচালক এই পণ্ডিতরাই বই পুঁথি লিখতেন এবং এ জন্যে এবং ছাত্র রক্ষণ ও শিক্ষণের জন্যেও, রাজা ও ভূম্যধিকারীদের কাছ থেকে বৃত্তি পেতেন তাঁরা। এর বাইরে আর কিছুই ছিল না দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের জন্যে এবং বিদ্যা-বিকিরণের গণ্ডীও নিতান্তই সীমিত ছিল, কেন না শূদ্রেরা প্রবেশাধিকার পেতেন না কোন চতুষ্পাঠীতে। বৌদ্ধেরাই প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্বজনের মধ্যে বিদ্যা বিকিরণে অবহিত হন, নালন্দা তক্ষশীলা উদ্দণ্ডপুরী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দরজা সর্বজনের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়ে এবং পণ্ডিতী সংস্কৃতের বদলে পালি ও প্রাকৃত কথ্যভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে। আর বৌদ্ধেরাই যে রসায়ন চিকিৎসা বিজ্ঞান গণিত জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে অমূল্য দান রেখে গেছেন, এ ত আগেই বলেছি। তার মানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বসে উপনিষদ, দর্শন ও সংহিতাদি সৃষ্টি করলেও,

বৌদ্ধেরাই ফলিত বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি দিয়েছেন সারা ভারতবর্ষকে, এ কথা মনে রাখতে হবে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরও খুবই সংক্ষিপ্ত। জীবন চর্যায় বৌদ্ধেরাই ভারতবর্ষে প্রথম দেন একটি সাম্যাশ্রিত নূতন সমাজ বোধ, যার প্রেরণায় নিষাদ কিরাত শবর পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি তথাকথিত উন্নতদের সঙ্গে এক কৌমভুক্ত হয়েছিলেন। ভোগ করেছিলেন কিছুটা সামাজিক সমানাধিকারও, কেননা গুপ্ত সম্রাটদের সময়টুকু বাদ দিলে, অশোক থেকে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত, একটানা প্রায় হাজার বছরই ভারতের শাসন কর্তৃত্ব থেকেছে বৌদ্ধদের হাতে। খ্রীঃ পূঃ ৩০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক পর্যন্ত সময়টাকে তাই কল্যাণ যুগ বলা যাবে এবং লক্ষণীয় যে গুপ্ত সম্রাটরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হলেও বৌদ্ধপীড়ক ছিলেন না। কিন্তু হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ল এবং তারপরই দক্ষিণ থেকে অভ্যুত্থান হল হিংস্র সনাতনীদের, যার ধাক্কায় বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হল ভারত থেকে এবং অনুন্নত বলে কথিত মানুষরা অবস্থাবিপাকে অস্পৃশ্য দাসই হয়ে গেলেন আবার। এঁরাই দ্বাদশ শতকে আগত মুসলীমদের ধর্ম গ্রহণ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান হিন্দুসমাজ থেকে এবং সে ভাঙন যে কি পরিণতি ডেকে এনেছে কয় শতাব্দীতে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ হল ভারত বিভাগ, যার ফলভোগ করছি আজ আমরা ছোট বড় সবাই। অর্থাৎ আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতা চিরদিন সমন্বয়মুখী, সমস্ত বিরোধ ও বৈষম্যকে আমরা ঐক্যের মধ্যে পূর্বাপর মিলিয়ে নিই, একথা ঠিক ততখানিই মন গড়া, যতখানি ভ্রান্ত তপোবন সংস্কৃতির যুগ নামক অলীক কবি-কল্পনাকে সত্যের চেহারা দিয়ে লালন করার বুদ্ধি। অথচ এই শ্রেণীর অপব্যাখ্যানই অব্যাহত ধারায় চলেছে বিদ্বৎসমাজ থেকে রাজনীতিক মঞ্চ পর্যন্ত সর্বত্র। এ থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করে সত্য ইতিহাসের সরণিতে এনে দাঁড় করানোর জন্যেই বর্তমান গ্রন্থের অবতারণা। স্মরণ রাখতে হবে মিথ্যা দিয়ে কোনদিনই বড় করা যায় না দেশকে।

**। বেদ ও বৈদিক সাহিত্যের উপজীব্য ।**

বেদ সম্বন্ধে অধিকাংশ হিন্দুর মনেই বেশ একটা রহস্য মিশ্রিত সম্ভ্রমের ভাব দেখা যায়। তাঁরা বেদকে মনুষ্যরচিত গ্রন্থ বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে তা হল স্বয়ম্ভূত পরমার্থ বাণী, যা চিরদিন আছে, চিরদিন থাকবে। বেদ হল সর্বজ্ঞান, সমস্ত ধ্যানের আকর। মানুষ যেখানে যা ভেবেছে করেছে,

ভবিষ্যতে ভাববে করবে, বীজাকারে তার সবই ধরা আছে বেদের সূক্তগুলিতে।

বস্তুত নৈষ্ঠিকদের সিদ্ধান্ত যাই হোক, বিচারশীল মানুষ আমরা বেদকে পুস্তক হিসাবেই দেখি এবং তা দেখি বলেই বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নিরিখে তার সময় এবং বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করি। আমরা আগেই বলেছি বৈদিক আর্যেরা খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের পরবর্তী কোনো সময়ের মধ্য এশিয়ার কোন স্থান থেকে ইরাণে ও ভারতে এসে বসতি বিস্তার করেছিলেন। বলা বাহুল্য আসার সময় তাঁরা তাঁদের সাংস্কৃতিক সম্পদ, সঙ্গীত, স্তোত্র ও পূজা পদ্ধতি-বিষয়ক বিধিবিধানগুলি সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন। এখানে যথোচিত বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনার পর সেগুলিই গ্রন্থনিবদ্ধ হয়। তাই হল আমাদের বেদ এবং ইরাণীয়দের আবেস্তা, যা বেদেরই সমগোত্রীয় রচনা, সে ভাষাতেও যেমন, বিধিবিধানের ঐক্যেও তেমনি। বেদ চারখানি—ঋক্, সাম, যজুঃ, অর্থব। তার মধ্যে ঋক্‌বেদ সকলের মতেই প্রাচীনতম এবং তাতে আছে বিভিন্ন নিসর্গ দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গিত অসংখ্য স্তোত্র। সামবেদে আছে ঋগ্বেদেরই স্তোত্রগুলির আবৃত্তি ও গায়নবিধি, তা অনেকটা তাই স্বরলিপি স্বরূপ। যজুর্বেদে গ্রথিত হয়েছে বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞ এবং লৌকিক ক্রিয়া-কৃত্য বিষয়ক রীতি-নীতি। তা মূলত অনুশাসন বা আচরণ বিধি-বিষয়ক গ্রন্থ। আর অথর্বে আছ তুকতাক মন্ত্র-তন্ত্র ও অভিচার ইত্যাদির প্রসঙ্গ। এক কথায় তাকে ব্ল্যাক আর্ট বা কৃষ্ণ বিদ্যার পুঁথি বলা যেতে পারে। এ ছাড়া অন্য জিনিসও আছে কিছু কিছু।

অনেকে অথর্বকে অবশ্য কুলীন বেদের পদবীভুক্ত করতে চান না। তাঁরা বলেন, ভারতের আদিবাসী আর্যেতর গোষ্ঠীর মানুষদের যখন আর্যকৌমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখনই তাঁদের বন্দনা ও পূজা পদ্ধতি-বিষয়ক সাহিত্য তথা মন্ত্রতন্ত্রকে বেদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে স্থান দেওয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে তা অপরাপর বেদের চেয়ে অনেক বেশী প্রাচীন ও অপরিশুদ্ধ এবং সেই কারণেই তার নাম অথর্ব। এই মতাবলম্বীরা অনেকে বেদকে ত্রয়ী বলেন। অনেকে আবার যজুর্বেদকে শুক্ল ও কৃষ্ণ দুভাগে ভাগ করে চার বেদের হিসাব ঠিক রাখেন। বস্তুত তন্ত্রশাস্ত্রে যে সব বন্ধ-ধন্ধ ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, অথর্বে তার অনেকগুলিরই যে উৎস খুঁজে পাওয়া যায়, এতে আর সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে তার মূল কাঠামোটা বেদ-পূর্ব কালের হওয়া খুব অসম্ভব নয়। তবে চারখানি বেদের মধ্যে ঋক্ ও অর্থব এ

স্থানি বেদেই শুধু সাহিত্য রসসমৃদ্ধ কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, আর অংশত অথর্বে এবং সমগ্র যজুর্বেদে পাওয়া যায় কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধীয় নানা নির্দেশ। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির পুরাসাহিত্যে পাওয়া যায় একই সঙ্গে দুটি দিকের সাক্ষাৎ, তার একাংশে সহজ সরল কবিতার আকারে জগৎ ও জীবনের অপরূপ শোভা সুষমার এবং জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-দুঃখের বিচিত্র সুন্দর উপলব্ধি-গুলির অভিব্যক্তি। আর অপরাংশে যা আত্মিক কল্যাণের সহায়ক এবং মানুষকে যা অলৌকিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে বলে এক সময় ভাবা হত, এমন সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান ও উপায় উপকরণের বিবরণ। অর্থাৎ বেদ হল আদিম কবিতা এবং আদিম ম্যাজিকের সমাহার। যাই হোক বেদের স্তোত্রগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, বৈদিক আর্যেরা ছিলেন মূলত পিতৃতান্ত্রিক। সেইজন্যেই ইন্দ্র বরুণ অগ্নি প্রমুখ দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন তাঁরা। মাতৃদেবতা তাঁদের বিশেষ নেই।

উষা রাত্রি সরস্বতী প্রভৃতি কয়েকটি নারীসত্তার কথা অবশ্য বলেছেন তাঁরা, কিন্তু এঁরা কেউ প্রধান দেবতা-পদবাচ্য নন। বেদে আরো দুটি দেবতার দেখা পাওয়া যায়, তাঁদের একটি হলেন বিষ্ণু, অপরটি রুদ্র। এই দুজনই পরে পৌরাণিক যুগে এসে হয়েছেন বাসুদেব কৃষ্ণ ও পশুপতি শিব। তার মধ্যে শিব নিঃসংশয়ে আর্যেতর দেবতা, কেন না মহেঞ্জোদাড়োর মাটিতে তাঁর মূর্তি এবং লিঙ্গ প্রতীক দুই-ই পাওয়া গেছে। নিঃসন্দেহে আদিতে আর্যেরা ছিলেন বহুদেববাদী। কিন্তু এই বিভিন্ন দেবতা যে আসলে একই আদি দেবের স্বরূপ, এ কথা পাওয়া যায় ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে। সম্ভবত তা থেকেই পরবর্তী ধাপে উপনিষদের ব্রহ্ম প্রকাশমান হয়েছেন। এখানে জেনে রাখা দরকার যে বৈদিক পূজা পদ্ধতি ছিল মূলত কৃত্যপ্রধান, তাতে ভক্তির অংশ ছিল অতি নগণ্য। রকমারি ছাঁচের বেদী নির্মাণে, পাইকারি হারে পশুহত্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠানে এবং সোম পানে, আর পার্থিব সুখ সম্পদ ভিত্তিক রাশিরাশি প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণেই ছিল তাঁদের ধর্মবোধ সীমিত। তার মানে আদিম যাযাবর প্রকৃতির মানুষদের ধর্মবোধ যেমনটি হওয়া স্বাভাবিক, ঠিক তেমটিই ছিল তাঁদেরও। আর্যপূর্ব দ্রাবিড়দের ধর্মীয় চেতনা ও পূজাপদ্ধতি নিঃসংশয়ে তাঁদের চেয়ে উন্নত স্তরের ছিল, তাই আর্য ও প্রাগার্য সংমিশ্রণের পর যখন তথাকথিত হিন্দু ধর্ম জন্মাল, তখন প্রাগার্যদের দেব প্রতীকগুলির সঙ্গেই ভক্তিমূলক পূজা-উপাসনাও আর্য ধর্মায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হল। আজ দুইয়ের মাঝখানকার

ভেদরেখা মুছে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে আর্যদের আদি ধর্ম-প্রত্যয়ের রূপটি এখনো পুরোপুরিই দেখতে পাওয়া যায়। এই রূপটি পরিবর্তিত হয়েছে পরবর্তীকালে রচিত বেদানুগামী আরণ্যক ও সূত্র গ্রন্থগুলির দ্বারা, যার কথা পরে বলছি।

২.

আগের অধ্যায়েই বলেছি যে বেদে একদিকে যেমন আছে সরল কাব্যরস সমৃদ্ধ অজস্র স্তোত্র ও প্রার্থনা, অন্যদিকে তেমনি আছে রকমারি মন্ত্র তন্ত্র ও তুকতাক। অর্থাৎ বেদ একই সঙ্গে লিটারেচার ও লিটার্জি, বা সাহিত্য ও ধর্মীয় অনুশাসন সংগ্রহ। আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষের কাম্যবস্তু যা হতে পারে, আমাদের পর্যাপ্ত বৃষ্টি দাও, আমাদের শস্যক্ষেত্রগুলিকে সমৃদ্ধ এবং গাভীগুলিকে দুগ্ধবতী কর, আমাদের শত্রুদের বধ কর, আমাদের ব্যাধিমুক্ত কর··· বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে সেই রকম প্রার্থনাই নিবেদিত হয়েছে বেদের স্তোত্র ও প্রার্থনামূলক সঙ্গীতে। আর মন্ত্রতন্ত্র তুকতাকগুলিতে আছে মারণ উচাটন বশীকরণ বৈর নাশ গ্রামবন্ধ গৃহবন্ধ প্রভৃতির অব্যর্থ উপায় বলে বিবেচিত এবং প্রাক্ সভ্যতাকাল থেকে প্রচলিত নানা তুকতাক, যা আসলে অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের ফসল মাত্র। এই শেষোক্ত বিভাগটিতে অস্পষ্টতা বা হেঁয়ালির পরিমাণ যথেষ্ট থাকলেও, তথাকথিত তাত্ত্বিক জটিলতা বা দর্শনের কচকচি নেই কোথাও। সে জিনিস এসেছে পরে এবং তারাই বেদকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে। এখানে বলা দরকার যে বেদের সঙ্গীত ও মন্ত্রগুলির সাধারণ নাম হল সংহিতা, আর তাদের বেষ্টন করে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে যে টীকা ভাষ্য ও ব্যাখ্যাদি, তাদের বলা হয় ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণগুলিই সরল ও সুবোধ রচনাগুলিকে দুর্বোধ্য করে ফেলেছে।

ব্রাহ্মণই হল বৈদিক বা বেদাশ্রিত সাহিত্য এবং তা উপনিষদ ও সূত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। চার বেদের এক একটিকে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এক এক গুচ্ছ করে উপনিষদ ও সূত্র। ঋক্ ও সাম বেদের উপনিষদ হল ছান্দোগ্য, কেন, সূত্র হল আশ্বলায়ন লাট্যায়ন বা গোভিল গৃহ্য সূত্র, আর ব্রাহ্মণ হল ঐতরেয় ও কৌষীতকী। যজুর্বেদের কৃষ্ণাংশের উপনিষদ হল কঠ, শ্বেতাশ্বতর, সূত্র হল বৌধায়ন, আপস্তম্ব আর শুক্লাংশে উপনিষদ হল বৃহদারণ্যক, ঈশা, সূত্র হল কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র পারস্কর গৃহ্যসূত্র। কৃষ্ণের ব্রাহ্মণ হল তৈত্তিরীয়

ব্রাহ্মণ, আর শুক্লের শতপথ ব্রাহ্মণ। অথর্ব বেদের উপনিষদ হল প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, সূত্র হল বৈতান সূত্র, ব্রাহ্মণ হল গোপথ ব্রাহ্মণ। এ ছাড়া আছে ব্যাকরণ অলংকার ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয় নানা গ্রন্থ, যা বেদাঙ্গ নামে অভিহিত এবং যার মধ্যে বেদভাষার কুঞ্চিকা হিসাবে যাস্কের নিরুক্ত খুব প্রসিদ্ধ। এই বিশাল বৈদিক সাহিত্য আদ্যোপান্ত অধ্যয়নে কারো কোনো লাভ আছে কিনা জানি না। তবে সূত্রগ্রন্থগুলির বেশীরভাগই ব্যাখ্যা ও তত্ত্বকথার বাগাড়ম্বরে পূর্ণ হলেও, উচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো কমই বিকিরণ করে। আরামভোগী একদল অন্নচিন্তাহীন পণ্ডিতের বৌদ্ধিক কেরামতির নিদর্শন হলেও, সূত্রগ্রন্থগুলিতে তাই সারবস্তু, তার মানে জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি, গতি-প্রকৃতি বা পরিণতি সম্বন্ধে কোন বিচারযোগ্য প্রসঙ্গ খুঁজে পাবেন না কোনটাতেই। বলা বাহুল্য উপনিষদ তা নয়। তার কতকগুলি উচ্চ তত্ত্বজ্ঞানের ধারক এবং বাহক ত বটেই, অনুপম সাহিত্যও। অবশ্য ঈশ্বর, আত্মা, জন্মান্তর ও মোক্ষ এই চতুবর্গ অপ্রামাণ্য প্রত্যয়ের উপর তার স্থিতি। অবশ্য বেদাশ্রিত সংস্কৃতির সবটাই তাই।

বৈদিক আর্যেরা যে গোড়ায় বহু দেববাদী ছিলেন এবং তা থেকেই ক্রমে এক আদি দেবতার ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন তাঁরা, একথা সুপ্রমাণিত। ঐ আদি দেবতাই ব্রহ্মে বিবর্তিত হন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় হলে। উপনিষদ হল সেই ব্রহ্ম বিষয়ক রচনা এবং একদিকে তা যেমন জগৎ ও জীবন-চিন্তা-বিষয়ক কাব্য এবং অধ্যাত্মমুখী তত্ত্ব-সাহিত্যের অনুপ্রেরণা দিয়েছে ভারতবর্ষে, অন্যদিকে তেমনি ভাববাদী দর্শনেরও উৎস স্বরূপ হয়েছে। উপনিষদের সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে যেমন বুদ্ধের সমকালীন বা ঈষৎ পূর্ববর্তী রচনা আছে, তেমনি আছে আল্লোপনিষৎ শ্রেণীর অর্বাচীন রচনাও। এর মধ্যে প্রধান যে কয়খানিকে শংকরাচার্য স্বীকৃতি দেন, তার নামই আমরা উল্লেখ করেছি এখানে। অনেকেই জানেন আশা করি যে শাজাহান পুত্র দারা শিকোহ্ উপনিষদ ও কোরাণের মধ্যে ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে লিখেছিলেন একদা মজ্‌মে উল বাহেরিণ বা দুই সমুদ্রের মিলন নামক বই এবং সে বই মধ্যযুগেই ইরাণ ও আরব হয়ে ইউরোপে পৌঁছেছিল। তখন থেকে শোপেনহাউয়ারের কাল পর্যন্ত উপনিষদ নিয়ে ইউরোপে পর্যাপ্ত মাতামাতি হয়েছে প্রাচ্য-প্রেমিক মহলে, যা এখনো হয়। আমাদের দেশেও রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, উপনিষদ চর্চার ধারা প্রায় অব্যাহতই রয়েছে। আমাদের প্রতিদিনের জীবন-

চর্যায় এবং দর্শন, সাহিত্য ও ভারততত্ত্ব ব্যাখ্যায় বৃহদারণ্যক কেন কঠ ঈশ প্রভৃতির শ্লোক নির্বিচারে উদ্ধৃত হয়। মনোরম সাহিত্য গুণান্বিত রচনা হিসাবে উপনিষদের অনেকগুলি যে বিশেষ উপভোগ্য, এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নেই। কিন্তু বেদানুগামী বলে কথিত হলেও, বেদের সঙ্গে উপনিষদ-গুলির সম্পর্ক কি বা কতটুকু, তা যুক্তির আলোয় যাচাই করে দেখার কোন চেষ্টা কখনো হয়নি। যেমন হয়নি সূত্রগ্রন্থগুলির মূল্য বিচারেরও কোন উদ্যোগ। তারই প্রাথমিক কয়েকটি কথা তাই এখানে বলা রইল।

॥ জীবন ও দর্শন ॥

ভারতবর্ষে ছয় শাখায় বিভক্ত আস্তিক্য দর্শনই সর্বসাধারণের মধ্যে দর্শন রূপে স্বীকৃত: ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত, যোগ, সাংখ্য ও বৈশেষিক…এই ছয় দর্শনের কোন কোনটা হয়ত সরাসরি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার ও প্রচার করেনি, কিন্তু যেহেতু তারাও বেদের প্রামাণিকতা কবুল করে, তাই তাদের এক পদবীভুক্ত করা হয়। আর নকুলীশ পাশুপত দর্শন বা বীরশৈব দর্শন, শঙ্করীয় অদ্বৈত তত্ত্ব, রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্ব অথবা গৌড়ীয় অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব যেহেতু এই কুলীন দর্শনেরই কোন না কোন শাখার পরিপূরক, তাই তাদের পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ দর্শন বলে গণ্য করার সার্থকতা নেই। তারা ওদেরই অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন স্পষ্টত ঈশ্বরাস্তিত্বে অবিশ্বাসী। কিন্তু বৌদ্ধদের নির্বাণবাদ এবং জৈনদের অনেকান্তবাদ বা স্যাদবাদ হিন্দু দর্শনের ভিত্তিরূপী মোক্ষবাদের সমধর্মী এবং উভপক্ষই কর্মফল ও জন্মান্তরে প্রত্যয় সম্পন্ন, তাছাড়া আহার-আচার ও অর্চনার ক্ষেত্রে শুচিতার সমর্থক বলে, বর্ণাশ্রমী পণ্ডিতরা তাদেরও যৎকিঞ্চিৎ মর্যাদা দিয়েছেন, যা দিতে সম্মত হননি তাঁরা লোকায়তিক বা বাস্তববাদী দর্শনকে। কেন না তা ঈশ্বরকে স্বীকার করে না, বস্তু থেকেই বিবর্তনের ধারায় জগৎ ও জীবনের উদ্ভব হয়েছে বলে প্রচার করে। কর্মফল ও জন্মান্তর মানে না, জৈব কারণ পরম্পরায় জীবনের উৎপত্তি এবং মৃত্যুতেই তার চরম সমাপ্তি বলে মানে। আর এই আত্মস্বতন্ত্র ধারণার অনুগামী বলে, আহার, আচার এবং জীবনযাপন প্রণালীতে তা আর্য-শাস্ত্রের অনুশাসনকে স্বীকার বা অনুসরণ করে না।

কিন্তু সুপ্রাচীনকাল থেকেই ব্রাহ্মণ্য বা বেদানুগ কুলীন দর্শনের পাশাপাশি বস্তুবাদী দর্শনের ধারাটিও চলে এসেছে ভারতবর্ষে এবং প্রভূত প্রতিকূলতা ও নিগ্রহ সহ্য করেও আত্মরক্ষা করেছে। মখলীপুত্র গোসাল, কেশকম্বলী ও

চার্বাক এই লোকায়তিক দর্শনের প্রধান প্রচারক। অন্যদের নামই শুধু কিংবদন্তী আশ্রয় করে বেঁচে আছে। চার্বাকের কিছু কিছু খণ্ডিত রচনা বিরুদ্ধ বা অশ্রদ্ধেয় সিদ্ধান্তের নিদর্শনরূপে কুলীন দর্শনের কোন কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থে, যেমন মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহে, উদ্ধৃত হয়েছে। তা থেকেই তাঁর বক্তব্যের নিষ্কর্ষ পাওয়া যায়। চার্বাক কোন ব্যক্তির নাম, না যে সম্প্রদায় চারুবাক বলে লোকের বুদ্ধিবিভ্রান্তি ঘটাতেন তাঁরাই চার্বাক, তা নিয়ে অনেক জল্পনা আছে। বলা প্রয়োজন যে দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরদের তমোগ্রস্ত করার জন্যে এই অলীক দর্শন প্রচার করেছিলেন, এমন আলোচনাও করেছেন কেউ কেউ। বস্তুত চার্বাক নামধেয় এক ব্যক্তির কাহিনী আছে মহাভারতে এবং বহু বর্ণাশ্রমী লেখক তাঁকে উদ্দিষ্ট দার্শনিক বা তাঁর বংশোদ্ভূত কোন একজন লোক জ্ঞানেই গালাগালিতে সম্বর্ধিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে চার্বাক আমাদের উদ্দিষ্ট দার্শনিকই এবং খুব সম্ভবত সনাতনীরা তাঁকে ও তাঁর রচনা সমূহকে ধ্বংস করেই নিষ্কণ্টক হতে চেয়েছেন। সে ধরণের লোককাহিনীও আছে ইতস্তত। কিন্তু লক্ষণীয় যে এই দর্শন ও তার প্রবক্তাকে চেষ্টা করেও বিলুপ্ত করা যায় নি। তা আপন প্রাণশক্তির জোরেই আজকের দরজা পর্যন্ত চলে এসেছে এবং আজকের সমুন্নত বৈজ্ঞানিক চেতনার আলোয় এই দর্শনের নূতন মূল্যায়নই প্রয়োজন হয়েছে। সেই প্রয়োজনের উপলব্ধি থেকেই বাংলা ভাষায় ইদানীং চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বই পুঁথি লেখা শুরু হয়েছে। এই দর্শনের প্রতিপাদ্য কি, জগৎ ও জীবনের আদি কারণ রূপে এঁরা কি বা কাকে নির্দেশ করেন, জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে এঁদের সিদ্ধান্ত কি, সব দিকের আলোচনাই করা হচ্ছে এই সব বইয়ে, যদিও তা হচ্ছে বিরোধী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনুপ্রেরণায়।

আগেই বলেছি, চার্বাক বা চার্বাকপন্থীদের লেখা কোন বই আজ পর্যন্ত কারো হাতে পড়েনি। তাঁদের কোন কোন উক্তি ও যুক্তি খণ্ডনের বা তাঁদের নামে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণের উদ্দেশ্যে সনাতনীরা নিজ নিজ রচনায় যে সব অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকেই তাঁদের দৃষ্টি ও মননশৈলীর একটা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এরকম জিনিস নির্ভুল বা নির্ভরযোগ্য হয় না হয়ত সর্বক্ষেত্রে, তবু কিছুটা আভাস অবশ্যই পাওয়া যায়। সেটুকু নিয়েই আলোচনা করা যাচ্ছে এখানে। চার্বাকীরা বস্তুবাদী, একথা আগেই বলেছি। এই কারণেই প্রত্যক্ষতা বা বাস্তবতা ছাড়া বিচারের আর কোন মাপকাঠি

মানেন না তাঁরা। তাঁরা বলেন, মাটি, জল, আগুন ও বায়ু এই চারভূতের সম্মিলিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় জগৎ এবং জীবনের উৎপত্তি। আকাশ বা শূন্য অদৃশ্য, তাই তাঁরা তাকে গ্রহণ বা স্বীকার করেন না। প্রাণ বা চেতনাকে তাঁরা সজীবতার অংশ বলে মনে করেন, তাঁদের বিচারে তাই আত্মা বলে কিছু নেই। তাঁদের মতে জীবনান্তের সঙ্গে সঙ্গেই হয় সব কিছুর অবসান, প্রাক্তন কর্মফল বলে কিছু নেই, সুতরাং তার পুরস্কার তিরস্কার ভোগ করার জন্যে জন্মান্তর প্রাপ্তির সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভূয়ো। যেমন তথাকথিত পাপপুণ্য এবং স্বর্গনরকের অথবা মোক্ষলাভের, অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওয়ার প্রত্যয়ও ভূয়ো। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য যে নির্মিত বস্তু মাত্রেরই কেউ না কেউ নির্মাতা থাকেন, নিছক এই নজীরেই সৃষ্টিকর্তাকে মানুষের সামনে খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু প্রাণময় এই জগৎ পদার্থটি ক্রমে ক্রমে বস্তুপুঞ্জের স্বয়ংক্রিয় শক্তিতে গড়ে উঠেছে। কোন মিস্ত্রি বা কারিগর হঠাৎ একদিন তাকে গড়েননি। অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা সর্বৈব ভিত্তিহীন। তার মানে চার্বাকীরা আত্মা ও আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন অদৃশ্য বলে। ভবিতব্য, জন্মান্তর ও মোক্ষকে অস্বীকার করেছেন কল্পিত বলে। ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন অপ্রামাণ্য বলে। পূজা-উপাসনা, ব্রত উপবাস ও শ্রাদ্ধ তর্পণ বর্জনীয় বলেছেন অনাবশ্যক বলে।

২.

আস্তিক্য অর্থাৎ ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনের মৌল পার্থক্য কোনখানে তা আগেই দেখিয়েছি। সেই সঙ্গেই বলেছি যে ছয় শাখায় বিভক্ত আস্তিক্য দর্শনের কোন কোন শাখা, যেমন কপিলের সাংখ্য দর্শন এবং কণাদের বৈশেষিক দর্শন, সরাসরি ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। এ দুই দর্শনের প্রতিপাদ্য কি একটু যাচিয়ে দেখা যাক। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্মিলিত প্রভাবে জগৎ এবং জীবনের উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতি অনন্ত শক্তির আধার, কিন্তু তিনি স্বয়ং পরিণামিনী নন, তিনি সক্রিয় হন পুরুষের সংস্পর্শে। পুরুষ নিত্য ক্রিয়াশীল, কিন্তু প্রকৃতির আধার ভিন্ন তিনি নিরর্থক। পরস্পর-অচ্ছেদ্য এই পুরুষ-প্রকৃতি প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান নির্দেশিত এনার্জি ও ম্যাটার ছাড়া কিছু নয়। বৈশেষিক দর্শন এই জগতের মূলীভূত কারণরূপে গণ্য করেন পরমাণুকে এবং জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তাকে মন বুদ্ধি অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্রা, এই চার ভাগে ভাগ করেন। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে এঁরা আদিতে নাস্তিক্য মতের-ই

সমর্থক ছিলেন। কিন্তু কালে পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব এবং পরমাণু তত্ত্বের কাঠামোতে প্রবেশ করেছে ঈশ্বর আত্মা ও মোক্ষ, অর্থাৎ ভব-বন্ধন থেকে মুক্তির কথা, যা বলাই বাহুল্য পরবর্তী ব্যাখ্যাতাদের সংযোজন। গৌতমের ন্যায় ও জৈমিনীর মীমাংসা দর্শনকে অনেকে বিশুদ্ধ দর্শনের পদবীভুক্ত করে দেখেন না। ন্যায় হল লজিক বা তর্কশাস্ত্র এবং ইতি ও নেতির তুলনা ও সাযুজ্য থেকে সত্যের প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য বলে কথিত। মীমাংসা অনেকটা আধুনিক মনস্তত্ত্বের অনুরূপ। বোধ ও বোধের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে তাতে, যদিও ন্যায় এবং মীমাংসা দুইয়েরই উদ্দেশ্যরূপে চিহ্নিত হয়েছে ঈশ্বর সন্ধিৎসা।

অবশ্য এই চার শাখা অপেক্ষা পতঞ্জলির যোগদর্শন ও বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনই ভারতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে। একমাত্র বাংলায় ও মিথিলায় মধ্যযুগে একদা ন্যায় ও স্মৃতিচর্চার অত্যধিক আড়ম্বর হয়েছিল, যার ফলে,নব্যন্যায় নামে নূতন একটা শাখাই তৈরি হয়েছে। যোগদর্শনের মূল উৎস খুঁজে পাওয়া যায় বোধহয় অথর্ব বেদে। তা থেকেই যোগের তাত্ত্বিক ও ফলিত প্রকরণগুলি ক্রমে ক্রমে গঠিত হয়েছে। যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বস্তুবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আপন সত্তার মধ্যে সীমিত করা হলে, জন্মায় ষষ্ঠেন্দ্রিয়জাত একটি শক্তি, যা অলৌকিক ক্ষমতারই নামান্তর। সেই অলৌকিক ক্ষমতা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে, এই হল নৈষ্ঠিকদের বিশ্বাস। বেদান্ত মতে আদি ও অদ্বৈত সত্য হল ব্রহ্ম, জগৎ ও জীবন মায়ার প্রতিফলন মাত্র, অবিদ্যার বশে যা সত্য রূপে দেখি আমরা। যোগের সাহায্যে এই অবিদ্যা মুক্ত হলেই হয় সত্য সন্দর্শন। তখন আর কিছুই থাকে না, থাকে শুধু ব্রহ্ম। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বেদান্ত দর্শন ভারতীয় দার্শনিক মনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলেই গৃহীত হয় সারা পৃথিবীতে এবং শংকরাচার্য রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব প্রমুখের ভাষ্যে তা উত্তরোত্তর নানা মুখে বিস্তার লাভ করেছে। এর মধ্যে শংকর ছাড়া অবশিষ্টেরা সকলেই অবশ্য অদ্বৈত তত্ত্বকে টানতে টানতে দ্বৈতে অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টির যুগ্ম স্বীকৃতিতে নিয়ে এসেছেন, যা থেকে ভক্তিবাদী যুগলারাধনার উদ্ভব হয়েছে এবং তাতে হয়েছে অলক্ষ্যে কিছুটা ছায়াপাত সাংখ্যেরও। তবুও বেদান্ত দর্শনের মহিমা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। কেউ কেউ আইনষ্টাইন প্রবর্তিত আপেক্ষিক তত্ত্বের আলোয় বৈদান্তিক মায়াবাদের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত ব্রহ্মভিত্তিক বেদান্ত দর্শনও যে অন্য দর্শনগুলির মতই অবাস্তব ও অলীক কল্পনার

আশ্রয়ে পুষ্ট, এতে আর সন্দেহ নেই।

ছয় শাখার বিভক্ত এই আস্তিক্য দর্শনের সঙ্গে তুলনায় বস্তুবাদী বা চার্বাক দর্শনের দৃষ্টি ও বোধ কত বেশী ঋজু ও সত্যানুগামী, তা আমরা গোড়াতেই দেখেছি। আসলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মবাদী পুরোহিত সমাজের কায়েমী স্বার্থের প্রতিকূল বলেই চার্বাকীদের নামে নানা কুৎসা রটনা হয়েছে সুপ্রাচীন কাল থেকে। বলা হয়েছে তাঁরা ঋণ করে ঘি খেতে বলেছেন; যে কোন নারীতেই উপগত হতে বলেছেন! জগতের উৎপত্তির মূল এবং জড় ও চেতনার অচ্ছেদ্যতা সম্বন্ধে যাঁরা অবহিত ছিলেন, জীবনের গতি ও পরিণাম সম্বন্ধে যাঁদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, বস্তুবাদী ছিলেন বলেই যাঁরা হিতবাদকে অস্বীকার করতেন না, তাঁরা কোন শীল বা মূল্যমান মানতেন না, এ হতেই পারে না। বলতে পারি সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে হেগেল, ফয়েরবাথ, মার্কস ও এঙ্গেলস একালে যে মতবাদে পৌঁছেছেন, সেকালে ভারতে চার্বাক, কেশকম্বলী ও আদি বৌদ্ধেরা এবং গ্রীসে হেরাক্লিটাস, এপিকিউরাস প্রমুখ তারই প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। একমাত্র ব্যোম বা আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া একালীন বিজ্ঞানে সমর্থিত হয় না, এমন কথা কি আছে চার্বাকে? অথচ নিরীক্ষাহীন মূঢ় প্রত্যয়ে আস্থাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ্য সমাজ চার্বাকীদের ধূর্ত নিশাচর ও অপ-যুক্তিপরায়ণ সফিস্ট সাজিয়েই চিরদিন সংস্কৃতির রাজ্যে অপাংক্তেয় করে রেখেছেন। ভারতীয় সমাজ মনস্তত্ত্বের অনড়তায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম একদিন যেমন প্রচণ্ড ঘা দিয়েছিল, তেমনি দিয়েছে চার্বাক দর্শনও। বৌদ্ধ ধর্মে পরে দেবদেবী ভূতপ্রেত জন্মান্তর ও কর্মফল ইত্যাদি ঢুকিয়ে ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্বের দাপটে প্রায় নিশ্চিহ্নই করে ফেলা হয়েছে তাকে। বস্তুবাদী দর্শনেরও হয়েছে একই পরিণাম। তথাপি তার কাঠামোটা যে ধিক্কারের সর্বগ্রাসী তরঙ্গ অতিক্রম করে আমাদের কাল পর্যন্ত চলে আসতে পেরেছে, এতেই প্রমাণিত হয় যে তার প্রাণশক্তি দুর্মর। আজও তা মানুষকে আলো ধরে পথ দেখাতে পারে।

॥ তন্ত্র শাস্ত্রের প্রেক্ষাপট ॥

উপনিষদের মতই আর এক গুচ্ছ শাস্ত্রগ্রন্থ হল তন্ত্র। হিন্দু ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, বাংলা ও আসামে তন্ত্রের প্রভূত প্রচার দেখা যায়। প্রাচীন ও অর্বাচীন তন্ত্রের সংখ্যা ষাট-বাষট্টি খানা। তার মধ্যে খান পাঁচেক, যেমন মহানির্বাণ, ডামর, কুলার্ণব, ফেৎকারিণী, রুদ্রযামল ইত্যাদি খুব প্রসিদ্ধ। তন্ত্র কতদিনের পুরান তা নিয়ে তর্ক আছে। অনেকে মনে করেন

বৌদ্ধ অবক্ষয় ও হিন্দু পুনরভ্যুদয়ের কালে—অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতক নাগাদ তন্ত্র এবং তান্ত্রিকতার আবির্ভাব হয় এবং তা চলে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক পর্যন্ত। এ ধারণা বলা বাহুল্য, কেউ কেউ সমর্থনীয় মনে করেন না। তাঁরা বলেন, তান্ত্রিক আচার-অভ্যাসগুলি এমনই আদিম যে এদের অনায়াসেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের রীতি-পদ্ধতির অনুবৃত্তি বলে ভাবা যেতে পারে। মহেঞ্জোদাড়োর প্রত্ন-নিদর্শনগুলিতে যে সব রহস্যময় মুদ্রা ও প্রতীক দেখা যায়, তা স্পষ্টতই তান্ত্রিকতা বিজ্ঞাপক। অথর্ববেদেও পাই রকমারি তুকতাক ও মন্ত্রতন্ত্র, যার কতক আলকেমি বা রসায়নের, কতক ম্যাজিক বা ইন্দ্রজালের শ্রেণীভুক্ত। কে না জানেন তন্ত্রে এ দুইয়েরই সর্বাধিক প্রাদুর্ভাব? কাজেই প্রচলিত তন্ত্রগ্রন্থগুলি না থাকলেও, জীবনচর্যায় তান্ত্রিকতার প্রভুত্ব ছিল। হয়ত অধুনালুপ্ত অন্য কোন ভাষায় আদি তন্ত্রগুলি লেখা হয়েছিল, যা সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়ে অথর্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তারপর স্বতন্ত্র বইয়ের আকারে একে একে প্রকাশমান হতে হতে এবং টীকাভাষ্যে পল্লবিত হতে হতে বহুমুখে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। এই ধারণা করেছি এই কারণে যে কিছু সংখ্যক বৈষ্ণবতন্ত্র পরবর্তী কালে রচিত হলেও, শৈব ও শাক্ততন্ত্রই প্রধান এবং শিব ও শক্তি যে প্রাক্‌বৈদিক দেবতা এ ত আগেই দেখেছি। এই শিব-শক্তি আরাধনাই কাশ্মীরে বীর শৈব ও তামিলভূমিতে নকুলীশ পাশুপত দর্শনে রূপায়িত হয়েছে। আর শ্রীবিদ্যাতত্ত্বেরও জন্ম এ থেকেই।

শ্রীবিদ্যাতত্ত্ব আসলে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে ত্রিকোণ ভূমির অর্থাৎ যোনির পূজা এবং নানা জটিল পরিভাষা ও প্রতীকের সাহায্যে যে সব আচার ও আসন এই পূজার অনুষঙ্গ বলে ব্যবস্থিত হয়েছে, তার বিবরণ সর্বজনবোধ্য ভাষায় লেখা অসম্ভব। এ থেকে বোঝাই যায় যে তান্ত্রিকতার কাঠামোটি অতি পুরান্। পৃথিবীর অন্যতম আদি পূজাই ছিল লিঙ্গপূজা এবং মিশর, ব্যাবিলন, পারস্য, চীন, সর্বত্র যেমন ভারতেও তেমনি, যুগে যুগে বিবর্তিত হতে হতে এই পূজা আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। ভারতবর্ষে তা দর্শনান্বিত হয়ে যে চেহারা ধরছে, তাই তন্ত্রশাস্ত্র এবং তার একদিকে থেকে গেছে মারণ উচাটন বশীকরণ স্তম্ভন গাছ-চালা নল-চালা বাণমারা ঝাড়ফুঁক তুক-তাক প্রভৃতি সুপ্রাচীন ও আজগুবি কৃষ্ণবিদ্যার প্রত্যয়, অন্য দিকে এসেছে যোগ দর্শন ও বৌদ্ধ শীল ও শুচিতার প্রভাব। সব শুদ্ধ জড়িয়ে তন্ত্রশাস্ত্র তাই হয়েছে পরস্পর বিরোধিতার জগাখিচুড়ি বিশেষ! এই জন্যেই সত্ত্ব রজ ও তম এই

তিন গুণ অনুযায়ী মানুষকে ভাগ করে তিন পর্যায়ের আচার ব্যবস্থিত হয়েছে তন্ত্রে। দিব্যাচার বা শুদ্ধাচার অনুসরণ করতে বলা হয়েছে যোগীদের। বীরাচার নির্দেশিত হয়েছে ভোগীদের জন্যে, আর হীনাচার বা পশ্বাচার ব্যবস্থিত হয়েছে অবশিষ্টদের জন্যে। এই তিন আচারের স্বরূপ প্রকৃতি ও পরিণতি ব্যাখ্যা করে রাশি রাশি বই লেখা হয়েছে দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী ধরে। কি তাদের বক্তব্য, কি আদর্শ ও উদ্দেশ্য তাদের উপাসনার, তার বিশদ আলোচনায় আমাদের এখানে প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে জানাই যে দিব্যাচারী বা শুদ্ধাচারীদের বলা হয়েছে যোগের পথে ইন্দ্রিয়বোধ শুদ্ধ করে আপন চেতনার মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন ও মোক্ষ লাভে অগ্রণী হতে। বীরাচারীদের বলা হয়েছে ভোগ-উপভোগের তুঙ্গে উঠে তার প্রতিক্রিয়া সম্ভূত বিবেক ও বৈরাগ্যে উদ্বুদ্ধ হতে এবং সেই পথে মুক্তি অর্জন করতে। আর পশ্বাচারীদের দেখান হয়েছে ক্লেদ পঙ্ক ন্যাক্কারজনকতার মধ্যে দিয়ে নিস্পৃহ পৌরুষে তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হবার এবং সেই ভাবে মোক্ষ লাভের পথ।

আদর্শ যাই হোক, তিনটি পথই যে অবাস্তব, তা কোন যুক্তিমান মানুষকে বোঝাতে হবে না। যোগসঞ্জাত ব্রহ্মদর্শন ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে ষট্‌চক্র ভেদ সম্পর্কীয় তত্ত্বের উপর। কি সেই তত্ত্ব, বলছি। এই মতানুসারে মানুষের মাথায় আছে অপ্রস্ফুটিত একটি সহস্রদল পদ্ম এবং তার উপর ফণা মেলে আছে একটি সাপ। আর এই সাপ নাকি আমাদের মাথায়, বুকে ও পেটে, অবস্থানকারী এক জোড়া করে শিব শক্তিকে ঘিরে ওঁ রচনা করে স্থির হয়ে রয়েছে। নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই সাপের ফণাকে অপসারিত করলেই ফুটে ওঠে ঐ পদ্ম এবং তারই নাম হল সহস্রার বিকশিত হওয়া বা ষট্‌চক্র ভেদ করা। তখনই হয় আপন চেতনার দর্পণে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ এবং তাই মোক্ষ। দয়ানন্দ স্বামী গোড়ায় ডাক্তার ছিলেন। তিনি সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থে লিখেছেন, নরদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছি ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এই তিন নাড়ী এবং ষট্‌চক্র সম্পর্কীয় তত্ত্বটি সর্বৈব ভ্রান্ত। দ্বিতীয় পন্থা যেটি বীরাচার নামে পরিচিতি, তাতে বামাচারকে মহিমান্বিত করে দেখান হয়েছে। সামনে রমণকুশলা রামা, দক্ষিণে পানপাত্র, বামে মরিচ সম্বলিত শূকরের উষ্ণ মাংস …এই ভাবে আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন যিনি, তাঁকে বলা হয় কৌল। এই মতানুসারে পুরুষ শিবভাবে আবিষ্ট হয়ে নারী-তথা-শক্তির সঙ্গে কারণপানান্তে সুরতে রত হবেন এবং এই ভাবেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনরূপী মহাতত্ত্বটি

উপলব্ধি করবেন। অবশ্য তাঁর স্খলন হলে চলবে না। কারণ এ হল বিন্দু সাধন। এই ভাবে অর্জিত সিদ্ধিকে মৎস্য মাংস মদ্য মৈথুন ও মুদ্রা এই পঞ্চমকারের সিদ্ধিও বলে। দেখাই যাচ্ছে পানাসক্তি ও যৌন অনাচারকে ধর্মের সনদ দিয়ে সমাজে জলাচরণীয় করাই হল এই পন্থার আসল উদ্দেশ্য। তৃতীয় পন্থাটি কি, তা তার নামেই প্রকাশ। সমস্ত সংস্কার ও সম্পর্কের বোধকে সংহার করে ঘৃণা লজ্জা ভয় বিমুক্ত শিব হতে হবে জীবকে, এই হল এ পথের নির্দেশ। মৃতদেহ মূত্র পুরীষ রক্ত শুক্র, কিছুই অখাদ্য নয় এই মতানুসারে। গুরু লঘু আত্মীয় পর কোন নারীই অগম্যা নন এতে। ইষ্টের বেদীতে মানুষ পশু যে কোন প্রাণীকেই বধ করা হয় এই মতানুসারে সাধনার অঙ্গরূপে। নাগা হঠযোগী কাপালিক অঘোরপন্থী বিচিত্র সব নামে পরিচয় দিতে দেখা যায় এই বীভৎস পথের অনুগামীদের। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সবাই এরা পারভার্ট বা বিকৃতাসক্তিপরায়ণ মানুষ।

প্রাক্‌বৈদিক ও বৈদিক জাতিগোষ্ঠীর মিলনে হিন্দু সমাজের বনিয়াদ গঠিত হয়েছিল একথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। এই প্রাক্‌বৈদিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যেমন শিক্ষিত ও সমুন্নত রুচির অধিকারী মানুষ ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিষাদ কিরাত শবর পুলিন্দ প্রভৃতি আরণ্যক মানুষও। এঁদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁরা লিঙ্গপূজক এবং পিতৃ দেবতার প্রতীক রূপে লিঙ্গের ও মাতৃ দেবতার প্রতীক রূপে যোনির পূজা করতেন। ঋক্‌বেদে এঁদেরই শিশ্নদেবাঃ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের পূজোপাসনার মধ্যে মদ্যপান ও নানা উৎকট যৌনাচারের স্বীকৃতি ছিল। সেগুলিই নিঃশব্দে হিন্দুধর্মের পূজায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং শিবশক্তি আরাধনার অনুষঙ্গ রূপে তা পরে অনুমোদন পেয়ে ধর্মাচার রূপে প্রচলিত হয়। এই আদি তন্ত্রের চেহারা কি ছিল কেউ জানেন না। তবে অনুমান করা হয় তার উপকরণ নিয়েই অথর্ববেদ সংকলিত হয়েছে। এইসব অনাচার সুপ্রাচীন কাল থেকে সমাজে চলিত ছিল বলেই বৌদ্ধদের একাংশকে তা আবিল করে এবং কালে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় শুরু হলে সেগুলিই প্রাধান্য পেতে থাকে। বুদ্ধের পরিনির্বাণ অন্তে বৌদ্ধেরা প্রধান দুটি যান অর্থাৎ পন্থায় ভাগ হয়ে যান। যাঁরা বিশুদ্ধ বুদ্ধপন্থার অনুগামী তাঁরা হীনযানী, আর যাঁরা তন্ত্রাচারী বৌদ্ধ, তাঁরাই মহাযানী। মহাযান থেকে আবার ওঠে কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদি। বাংলার সহজিয়ারা এই সহজযানীদেরই উত্তর পুরুষ।

যাই হোক তন্ত্রাচারীদের মধ্যে কি কি ধরনের ন্যক্কারজনক রীতি পদ্ধতি চলিত আছে, তার কিছু আভাস আগের অধ্যায়েই দিয়েছি। আরো কিছু বলছি। পুরুষ প্রকৃতি বা শিবশক্তি মিলনের নামে নরনারীতে স্খলনহীন যৌনক্রিয়াকে এঁরা সাধনার অঙ্গ বলে প্রচার করেন। তার নাম বিন্দুসাধন। এ ছাড়া আছে পুং জননেন্দ্রিয়কে অশ্বের শক্তিতে অভিষিক্ত করা, অথবা কূর্মশুণ্ডের মত তাকে দেহাভ্যন্তরে নিয়ে নেওয়া। প্রথমটি হল বাজীকরণ, দ্বিতীয়টি হল খেচরী মুদ্রা। এই রকম অজস্র মুদ্রা আছে,যার কথা ভব্য সমাজে প্রকাশযোগ্যই নয়। কামাচারীদের মধ্যে একটি শ্রেণী আছেন, যারা বলেন, নারী হলেন পরমা প্রকৃতি, একই দেহে তিনি জননী ও প্রিয়া। অতএব মাতৃসম্ভাষণ ও রমণ একই সঙ্গে করা যেতে পারে। এ ছাড়া নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পায়ুদেশ দিয়ে উদরস্থ নাড়ী বের করে ধারাজলে তা ধৌত করা, চোখ দিয়ে আগুন বের করা, অথবা এক অঙ্গ দিয়ে প্রভূত জল আকর্ষণ করে নিয়ে অন্য অঙ্গ দিয়ে তা বের করে দেওয়া, যোগ বলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, শূন্যে ওঠা, কিংবা সূক্ষ্মতা লাভ করে শিশি-বোতল বা ঘটির মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করা ইত্যাদি অলৌকিক ক্ষমতাও তান্ত্রিকরা দাবী করেন। যে কোন ব্যাধি নিরাকরণ করার ক্ষমতা, মারণ উচাটন বশীকরণ ঘরবন্ধন গ্রামবন্ধন ইত্যাদির এবং এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিণত করার দাবীও সুবিদিত। বলা বাহুল্য এসবই অবাস্তব ম্যাজিক বা ভোজবাজী এবং এর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। অথর্ববেদ অথবা তার আগে থেকেই ভারতবর্ষে চলে আসছে এসবের অবাধ চর্চা। তন্ত্রে হয়েছে তারই শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি।

অবশ্য তন্ত্রে শুধু ম্যাজিক এবং কদর্যতারই যথেচ্ছ আবাদ হয়েছে ভাবলে ভুল হবে। তার একটা গঠনের দিকও আছে। শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, কামশাস্ত্র, আলকেমি বা রসায়ন ইত্যাদির আদি উৎসও নিহিত আছে তন্ত্রেই। সম্মোহনের দ্বারা চিত্তপ্রসাদনের ও উন্মাদ রোগ বিদূরণের, রক্ত মোক্ষণের দ্বারা বিষমজ্বর নিরাকরণের, পারদের সাহায্যে ধাতুদ্রাবণ ও শোধনের নানা কৌশল এবং খনিজ প্রাণীজ ও ভেষজ বিচিত্র পদার্থ ঔষধার্থে আহরণের রকমারি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে তন্ত্রে। চরক সুশ্রুত নাগার্জুন বাৎস্যায়ন কল্যাণমল্ল, অনেকেই তাই তন্ত্রের কাছে ঋণী। এই ঋণের কিছু প্রসঙ্গ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর পজিটিভ সায়েন্সেস অব দি হিন্দুজ বইয়ে আলোচনা করেছেন। দুঃখের বিষয় তন্ত্রের

এই ইতিমূলক দিকগুলির প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় না। হয় নোংরা দিকগুলির প্রতি। একালীন শিক্ষিত মানুষের কাছে তন্ত্রকে মহিমান্বিত ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত করেন প্রথম বিচারপতি উডরফ, যেমন সেকালীন ভদ্র সমাজে এই কাজ করেছিলেন চৈতন্য সমসাময়িক বলে কথিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁর প্রসিদ্ধ তন্ত্রসার বই লিখে। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে শাক্ত ও শৈব সহজিয়ারাই যদিও মূলত তন্ত্রের পালক ও পোষক এবং অঘোরপন্থী অশোকপন্থী কাপালিক বামাচারী সবাই-ই উঠেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে, তবে বৈষ্ণব তান্ত্রিকও আছেন। দ্বাদশ শতক নাগাদ যখন রাধাকৃষ্ণ আরাধনা শুরু হয় শিবশক্তি আরাধনার ছকে ফেলে, তখনই আউল বাউল সাঁই কর্তাভজা নানা শ্রেণীর উদ্ভব হয় সমাজচ্যুত মানুষদের মধ্যে থেকে। যৌন কদাচার ও তুকতাকে এঁরা শৈবশাক্তদেরই সহযাত্রী। নরনারীর দেহ মিলনকে এঁরাও রাধাকৃষ্ণের মিলন বলেই প্রচার করেন। এমন কি পুরুষকে কৃত্রিম স্তন ও বসন ভূষণে সাজিয়ে প্রকৃতি বানানর অভ্যাসও দেখা যায় এঁদের মধ্যে। এই সহজিয়াদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে নিয়ে আসেন সম্ভবত চৈতন্যের আদেশেই নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র। তা থেকেই হয় পরে বৈষ্ণব ইষ্টগোষ্ঠীর জন্ম এবং জন্মায় বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন।

।। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ ।।

ধর্ম-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকরগ্রন্থ বলে হিন্দু ভারতে সর্বদা বিবেচিত হয় যে সব বই এবং হিন্দুর সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে যাদের প্রভাব সর্বাধিক, সেই রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক এবার। নৈষ্ঠিক সমাজে এই তিন গ্রন্থ বিশুদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থ বলে গৃহীত হয় নি কোন দিন, বরাবরই পেয়েছে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা। উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র সীতা ও রাম এবং দক্ষিণ ও পূর্বভারতে, বিশেষত পূর্বভারতে, রাধা ও কৃষ্ণ যথাক্রমে লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রকট বিগ্রহ হিসাবে পূজিত হন। সেই কারণেই রামচরিত রূপে রামায়ণ ও কৃষ্ণচরিত রূপে মহাভারত ও ভাগবত সগৌরবে হিন্দুর পূজায়তনে স্থান পায়। এদেরকে সাহিত্য রূপে প্রথম গ্রহণ এবং বিশ্লেষণের প্রয়াস করেন বিদেশী ভারততত্ত্ববিদরা। ভারতবাসী পণ্ডিতরা অনুগামী হন তাঁদের। এঁরাই প্রশ্ন তোলেন, রামায়ণ ও মহাভারতে উপস্থাপিত ঘটনাগুলি নিছক কল্পনা-নির্ভর কাহিনী, না তার অন্তর্লোকে নিহিত আছে কিছুটা সত্য ইতিহাসের কাঠামো? যদি

সত্যাশ্রিত হয় আদি কাহিনীর কঙ্কাল দুটি, তাহলে রাম রাবণের যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আনুমানিক কোন সময়ের ঘটনা এবং এ দুই গ্রন্থ প্রকৃতই যথাক্রমে বাল্মীকি ও বেদব্যাসের রচনা কিনা? প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হওয়া যাক একে একে। প্রত্ন-ইতিহাসবিদরা সিদ্ধান্ত করেন যে উত্তর ভারতে উপনিবিষ্ট বৈদিক আর্যদের দক্ষিণাভিমুখী অভিযান ও আর্যেতর জাতি-গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে রামায়ণে, আর উত্তরাপথে অধিষ্ঠিত আর্যদের স্বগৃহ বিরোধ ও যুদ্ধের বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে মহাভারতে। আগে সম্প্রসার ও অধিকার স্থাপন, তারপর স্থিতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা হল সব দেশেরই ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা এবং সেই অনুসারেই উপরোক্ত দুটি সিদ্ধান্ত করা হয়। কিন্তু এই দুটি বৃহৎ ঘটনা ঘটে আনুমানিক কোন সময়ে, প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে তা হাতে কলমে প্রমাণ করার মত দলিল দস্তাবেজ আদৌ সুলভ নয়। কাজেই অনুমানের দূরবীক্ষণই একমাত্র সহায় আমাদের। আমরা দেখেছি, বৈদিক আর্যভাষীদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটে খ্রীঃ পূঃ ১৭শ-১৫শ শতাব্দ নাগাদ। তার চার-পাঁচশো বছরের মধ্যেই হয়ে থাকবে তাঁদের দক্ষিণা-ভিমুখী-অভিযান। সুতরাং রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার সময়টা খ্রীঃ পূঃ ১২শ-১০ম শতাব্দ হতে পারে। তার দু-তিনশো বছরের মধ্যেই যদি হয়ে থাকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, তাহলে তার সময় দাঁড়াচ্ছে খ্রীঃ পূঃ ৯ম-৮ম শতাব্দ নাগাদ। আর রামায়ণ ও মহাভারত দুই-ই যদি লেখা হয়ে থাকে ঘটনার দু-তিনশো বছর পরে, তাহলে রামায়ণকে খ্রীঃ পূঃ ১০ম-৮ম এবং মহাভারতকে খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ-৫ম শতাব্দের রচনা বলে অনেকটা নির্ভয়েই নেওয়া যেতে পারে বোধ হয়।

প্রথমোক্ত ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অযোধ্যাপতি রাম নামধেয় কোন প্রাগৈতিহাসিক রাজা, আর দ্বিতীয়োক্ত ঘটনায় কেন্দ্রীয় পুরুষ রূপে বিদ্যমান ছিলেন একই রকম প্রাগৈতিহাসিক দ্বারকাধীশ কৃষ্ণনামক কোন নরপতি। প্রথমজন আর্যাবর্তের অধিকারসীমা বিন্ধ্য অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত প্রলম্বিত করেছেন, দ্বিতীয় জন আর্যে-প্রাগার্যে মেল-বন্ধন ঘটিয়ে ক্ষাত্র-প্রাধান্য-মুক্ত নূতন হিন্দু ভারতের পটভূমি তৈরি করেছেন। দুজনেই তাই লোকা-বতার বা ঈশ্বরপুরুষ রূপে ভারতবাসীর পূজায়তনে সসম্মানে গৃহীত হয়েছেন। তারপর যুগে যুগে সাহিত্যে ও শাস্ত্রে তাঁদের মহিমা কীর্তিত হতে হতেই ক্রমে তাঁরা অতিমানবে, তারপর স্বয়ং ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়েছেন, একথা মনে করলে তাই ভুল হবে না খুব। কিন্তু সমস্ত বক্তব্যটাই দাঁড়িয়ে আছে

প্রধানত 'যদি' এবং 'হয়ত' আশ্রয় করে। প্রশ্ন উঠতে পারে, দুটি ঘটনার যাথার্থ্য প্রমাণের মত উপকরণ কি বা কতটা আছে? এক্ষেত্রে বলা হয় যে রামায়ণে পথঘাট নদী পর্বত অরণ্য ও জনপদের যা বিবরণ আছে, ভৌগোলিক দিক থেকে তা প্রায় নির্ভুল এবং বানর ও রাক্ষসের রূপকে যে আদিবাসী মানুষদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, তাতেও বিশেষ অসঙ্গতি নেই কিছু। দক্ষিণাঞ্চল যে মূলত ভারতের প্রাগার্য-অধ্যুষিত বলয়ই এবং তার নিজস্ব সভ্যতার ঐশ্বর্য যে কম ছিল না, আর সেই সভ্যতা যে আর্যাভিযানের আঘাতেই বিধ্বস্ত হয় এবং আর্য প্রাগার্যে সংমিশ্রণ হয়ে যে নূতন একটি সভ্যতার জন্ম হয়, এ ত ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্যই অতিরঞ্জিত হয়ে দশস্কন্ধ রাবণের কাহিনীতে রূপ ধরেছে। কিন্তু তাতে সত্যের কাঠামোটার ষোল আনা খোয়া যায় নি। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা আরো বেশী প্রামাণ্য এই কারণে যে, তার কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণ ইতিহাসপুরুষ। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম দেবকী পুত্র বাসুদেবের নাম পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দ নাগাদ রচিত। সেখান থেকে মহাভারত ভাগবত হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ পর্যন্ত হয়েছে ধারাবাহিক ভাবে কৃষ্ণকথার ব্যাপ্তি। অবশ্য মহাভারতে শুধু কৃষ্ণ জীবনের মাঝের অধ্যায়টিই পাওয়া যায়, আদি ও অন্ত্য অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে যথাক্রমে ভাগবত ও হরিবংশে, যা মহাভারতের তুলনায় অর্বাচীন। ভাগবত রচিত হয় সম্ভবত সাত্বত ধর্মের অভ্যুদয়কালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৮ম-৯ম শতকের আগে পরে কোন সময়ে। এ থেকে এই অনুমানই করা চলে যে কৃষ্ণকথার কিছুটা লিখিত হয়েছিল, বাকীটা ছিল কিংবদন্তীর মধ্যে ব্যাপ্ত, যা দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু করে, গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। এতদীর্ঘ দিনের স্থিতি নিশ্চিত কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার পক্ষে সব চেয়ে বড় সাক্ষ্য।

কিন্তু শুধু কৃষ্ণের নয়, পরাশর ব্যাস বিচিত্রবীর্য ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখেরও উল্লেখ পাওয়া যায় সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে এবং অন্যান্য বেদোত্তর গ্রন্থে যা খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দের মধ্যে লিখিত বলে ধরা হয়। অবশ্য ইন্দোগ্রীক, সিরীয়-রোমক ও অন্যান্য বহির্ভারতীয় জাতির নামও পাওয়া যায় মহাভারতে। পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয়কালে তাঁদের কাছে কর আদায় করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে মহাভারতে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, খাঁটি মহাভারত যেটুকু, তা খুবই পুরান, খ্রীঃ পূঃ ৯ম-৮ম বা তার কাছাকাছি সময়ের,

আর পরবর্তী অংশগুলো মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটদের শাসন কালের, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩য় থেকে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দের মধ্যে। ভগবদ্গীতার সংযোজন নিঃসন্দেহেই আরো পরের ব্যাপার এবং তা বৌদ্ধ প্রাধান্য বিলুপ্তি ও হিন্দু পুনরভ্যুত্থান কালের রচনা।

মোটের ওপর প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে মহাভারতের সংগঠন চলেছে। আর নানাদিকের দেশ থেকে আসা বিচিত্র কাহিনী উপকথা ও বীরগাথা যেমন তার জঠরে স্থান পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, বংশবৃত্তান্ত, ভৌগোলিক তথ্য, দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয় বিবিধ অনুশাসন। সম্ভবত সেই জন্যেই প্রাচীনেরা বলতেন, মহাভারতে যা নেই তা নেই ভারতবর্ষেই। কিন্তু এসবের ফলে তার কাহিনীর গ্রন্থনা কি শিথিল হয় নি ? অবশ্যই হয়েছে। অন্তত রামায়ণ তার তুলনায় ঢের বেশী সুগ্রথিত এবং অধিকতর কাব্যরসসমৃদ্ধ রচনা। তাতে যে সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তাও, ঢের বেশী পরিচ্ছন্ন এবং নীতিবোধ নিয়ন্ত্রিত। মহাভারতের সমাজ সে তুলনায় রীতিমত জটিল এবং তাতে যেমন চরম মহত্ত্বের বহু দৃষ্টান্ত আছে, তেমনি আছে অজাচার ব্যাভিচার বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপট্যের দৃষ্টান্ত। এই কারণেই কেউ কেউ বলেন, রামায়ণের ঘটনা মহাভারতের পূর্ববর্তী হলেও রচনাটা পরবর্তী কালের। কেউ কেউ আবার বলেন, আদি রামায়ণ অন্য ভাষায় লিখিত হয়েছিল, যার সংস্কৃত পুনর্লিখন পাই আমরা এখন এবং এটি পরবর্তী কালেরই।

কিন্তু সে যাই হোক রামায়ণ ও মহাভারত দুই-ই যে বই হিসাবে অসামান্য, এমন কি অদ্বিতীয়ই, তাতে আর সন্দেহ নেই। বিশেষ করে মহাভারত ত ভারতীয় মনীষার কোষগ্রন্থ স্বরূপই। বৈদিক ভারত, পৌরাণিক ভারত, বৌদ্ধ ভারত এক সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে তার দর্পণে। সেকালের ও একালের সন্ধিস্থলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তা অক্ষয় আলোক-স্তম্ভের মত। তাতে প্রেম প্রজ্ঞা ও পৌরুষের যেমন সম্মেলন হয়েছে, তেমনি হয়েছে, ভোগ যোগ ও সন্ন্যাসের। এরকম গ্রন্থে কাব্যত্ব গৌণ না হয়ে পারে না। সেই দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কি সাবেকী কাব্য মীমাংসকরা রামায়ণ-মহাভারতকে সাহিত্য হিসাবে দেখেন নি ?

২.

আগের অধ্যায়ে ইচ্ছা করেই একটি প্রসঙ্গে অনালোচিত রেখেছি। সে প্রসঙ্গটি হল বাল্মীকি ও ব্যাসের ব্যক্তিত্ব নিয়ে। মহর্ষি নামে অভিহিত এই

দুজন সত্যি কি যথাক্রমে রামায়ণ মহাভারতের রচয়িতা? দুজনই যে রকম ওতঃপ্রোত ভাবে মহাকাব্য দুটির ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে জড়িত, তাতে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। অবশ্য এমন হতে পারে যে দুজনই হয়ত যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারত কথার সংক্ষিপ্ত কাঠামো রচনা করেছিলেন, যা যুগে যুগে নানা হাতের স্পর্শে হয়েছে আমূল রূপান্তরিত। আবার এমনও হতে পারে যে এই দুই নামের আড়ালে পরবর্তী কালের কবিরা ইচ্ছা করেই আত্মগোপন করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, রামায়ণ চ্যবনের লেখা এবং তা দশরথ জাতক নামক পালিগ্রন্থের অনুসরণে লেখা। এ কথার পক্ষে বলা বাহুল্য কোন নিশ্চিত যুক্তি নেই। চ্যবনও বাল্মীকির মত তপস্যা করতে করতে বল্মীকস্তূপে আচ্ছন্ন হন গল্প আছে, কিন্তু সেই কারণেই তিনি বাল্মীকি নন, আর দশরথ জাতক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক নাগাদ লিখিত হয়, কিন্তু রামায়ণ তার ঢের আগে লেখা না হলে, তার আখ্যানবস্তু নিয়ে ভাস ও কালিদাস যথাক্রমে প্রতিমা নাটক ও রঘুবংশ কাব্য লিখেছেন কি করে? সুতরাং বাল্মীকির ব্যক্তিত্ব হেঁয়ালির গোলক ধাঁধাতেই আচ্ছন্ন থাকে। ব্যাসকে নিয়ে সমস্যা আরো জটিল। বেদের শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন বলেই তাঁকে বেদব্যাস বলা হয়, অর্থাৎ তিনি বেদের সংকলক। এ ছাড়া মহাভারত, ভাগবত এবং আঠারখানি পুরাণ, সবই তাঁর রচনা বলে দাবী করা হয়। এত পর্বতপ্রমাণ কাজ কোন একজন মানুষ, তিনি অমিত শক্তিধর হলেও, কখনোই করে উঠতে পারেন না। তাই ধরে নিতে হবে ব্যাস ব্যক্তিনাম নয়, তা একটি পদবী।

অধ্যবসায়ী পুরাবৃত্তকারদের চেষ্টায় প্রমাণিত হয়েছে যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড সুন্দরকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড কোনমতেই এক হাতের রচনা নয়। আর তাঁরাই প্রমাণ করেছেন যে মহাভারতেরও আদি কাঠামোতে শ্লোক সংখ্যা ১০ হাজারের বেশী ছিল না। কালে তা ব্যাপ্ত হয়েছে ১ লক্ষ শ্লোকে এবং সেই জন্যই তাতে ফুটেছে বিভিন্ন সময়ের ও বহু হাতের চিহ্ন। আগেই বলেছি, এই পরবর্তী কালের সংযোজনগুলির মধ্যে ভগবদ্গীতা অন্যতম, কেন না তাতে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়িত আদর্শ প্রচারিত হয়েছে, হিন্দু-পুনরভ্যুদয় কালে ভিন্ন যা হতেই পারে না। ভাগবত আরো পরের রচনা, যখন কৃষ্ণকে অবতারত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ও ভক্তিধর্ম মহিমান্বিত হয়েছে হিন্দুর জীবনচর্যায়। পুরাণগুলিরও রচনাকাল শুরু ধরা হয় এই সময় থেকেই। লক্ষণীয় যে শিব ও শক্তি ভারতের প্রাচীনতম দেবতারূপে পূজায়তনে অনুপ্রবিষ্ট

হয়েছিলেন মহেঞ্জোদাড়োর যুগ থেকেই। বেদের রুদ্রকে তারপর তাঁর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়, যেমন বৈদিক দেবতা বিষ্ণুই বাসুদেব কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়ে ভক্তি-ধর্মের কেন্দ্রীয় পুরুষ হন। এই শিব শক্তি ও বিষ্ণু মহিমা প্রচারার্থেই মূলত পুরাণের সৃষ্টি। অবশ্য অন্যান্য গৌণদেবতার মাহাত্ম্য, নানা তীর্থমাহাত্ম্য, কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধীয় নানা অনুশাসন, বিবিধ লোককাহিনী, ভূবৃত্তান্ত, বংশাবলী বিবরণ, আরো নানা জিনিসই আছে পুরাণে এবং ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র কামশাস্ত্র ভূগোল ইতিহাস জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদির সারসংগ্রহ রূপেও তা হিন্দুসমাজে সম্মানিত। কোন পুরাণেই বিষয়ের আনুপূর্বিকতা নেই, তার প্রত্যেকটা এক একখানি মিসেলেনী বা বিবিধ ভারতী বিশেষ এবং একসময়েরও রচনা সব নয়। ৮ম—৯ম থেকে ১৩শ—১৪শ শতাব্দীর মধ্যেই তাদের জন্ম।

পার্জিটারই প্রথম মনুর মহাপ্লাবন [ যার কথা গিলগামিস, বাইবেলের প্রাচীন বিধান, শতপথ ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতেও আছে ] থেকে মৌর্য ও গুপ্ত বংশীয় নরপতিদের কাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজবংশগুলির যথাসম্ভব ধারাবাহিক খতিয়ান তৈরি করে পুরাণের অন্তর্লোকে নিহিত একটি আধা-ঐতিহাসিক কংকাল আবিষ্কার করেন। আর তিনিই তাদের মোটামুটি কাল নিরূপণও করেন। প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি পুরাণের অনুক্রমণিকায় তাদের শ্লোকসংখ্যা যত বলে নির্দেশ করা হয়েছে, মূল বইয়ে অনেক সময়ে তার চেয়ে বেশী শ্লোক দেখা যায়, দু-একটায় শুধু দেখা যায় কম। প্রথমটি সংযোজনের আর নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়টি বিলোপের নিদর্শন এবং পাঁচ শতাধিক বৎসর ধরে এই চলেছে পুরাণ নিয়ে। মুখ্য পুরাণগুলির মধ্যে বায়ু, স্কন্দ, বিষ্ণু, ভাগবত, মার্কণ্ডেয় ও কালিকার নামই অগ্রগণ্য। মনে রাখতে হবে, বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে কৃষ্ণকথা থাকলেও, তাতে রাধা অনুপস্থিত। খিল হরিবংশ নামক মহাভারতীয় পরিশিষ্টে পর্যন্ত তিনি নেই। তিনি প্রথম আবির্ভূতা হয়েছেন ১০ম-১১শ শতকে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, যা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সম্ভবত বাঙালীর লেখা। এখান থেকেই জয়দেবের গীতগোবিন্দে তাঁর অনুপ্রবেশ হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেরই অংশ বিশেষ চণ্ডী নামে পৃথক গ্রন্থ রূপে প্রচার লাভ করেছে, যেমন করেছে মহাভারতের ভগবদ্গীতাও। প্রাচীনেরা বলেন, লোক শিক্ষা ও হিন্দু আচার সংস্কার প্রতিষ্ঠার জন্যেই পুরাণগুলি রচিত হয়েছে, তাই তাতে ভাল মন্দ নির্বিশেষে সব কিছুর সমাবেশ দেখা যায়। হয়ত তাই। তা না হলে ব্রহ্মা ও তাঁর মানসকন্যা সন্ধ্যার কাহিনী, ষড়ানন ও তাঁর জনয়িত্রী

পার্বতীর কাহিনী এবং যম যমী দুই ভ্রাতা ভগিনীর কাহিনী কি জন্যে পুরাণে ঠাঁই পেয়েছে? বোধ হয় জীবলোকে পাপ তাপ ও স্খলন পতনের জঘন্যতা কতদূর যেতে পারে, তা বুঝিয়ে তারই পটভূমিতে ধর্ম ও সৎক্রিয়ার আদর্শ ব্যাখ্যা করা ছিল রচয়িতাদের মূল উদ্দেশ্য। লক্ষণীয় যে এ জায়গায় গ্রীক পুরাণের সঙ্গে হিন্দু পুরাণের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। দুই-ই পরবর্তী কালে প্রভূত নাটক ও কাব্যের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

॥ হিন্দুত্ব বনাম মনুষ্যত্ব ॥

বেদ উপনিষদ ষড়দর্শন তন্ত্র রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদির প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সেই আলোচনার ভিত্তিতে এবার সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠবে, হিন্দু সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি এবং সার্বভৌম মানবতার নিরিখে বিচার করলে তার চেহারাটা আমরা কি রকম দেখি? প্রশ্ন দুটির মোকাবিলায় অগ্রসর হবার আগে বলা দরকার যে হিন্দু কথাটাই হিন্দু নয়। প্রাক্‌বৈদিক মহেঞ্জোদাড়োর প্রধান একটি কেন্দ্র ছিল সিন্ধু উপত্যকা। বৈদিক আর্যেরাও প্রথম উপনিবেশ গড়ে ছিলেন সিন্ধুতীরেই এবং সম্ভবত তা করেছিলেন মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা বিধ্বস্ত করে। এই সিন্ধুকে গ্রীকরা বলেছিলেন ইণ্ডাস এবং নদী মাটি মানুষ তিনেরই পরিচায়ক অভিধা হয় তা। এই ইণ্ডাসই আরবদের হাতে হয় হিন্দু এবং গ্রীকদের ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডিকাকে তাঁরা করে নেন হিন্দুস্থান। কিন্তু ও কথা থাক। জরথুষ্ট্রীয় বা জেন্দ, ইহুদী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি অপরাপর ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের একটি মৌল পার্থক্য চোখে না পড়ে পারে না। উপরোক্ত ধর্মগুলি সবই কোন না কোন আচার্যের দ্বারা মানব ইতিহাসের কোন না কোন অধ্যায়ে প্রচারিত হয় এবং তাদের তত্ত্ববস্তু ও আচরণবিধি আদি থেকেই নির্দিষ্ট একখানি-দুখানি বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। হিন্দুধর্ম ঠিক এরকম একাত্মিক প্রকৃতির জিনিস নয়। সুদীর্ঘকাল ধরে নানা মত পথ আদর্শ ও পূজাপদ্ধতির অনুগামী মানুষেরা একটি সাধারণ হিন্দু অভিধার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যেমন নিরাকার একেশ্বরবাদী আছেন, তেমনি আছেন সাকার-উপাসক বহু দেববাদীও। এই দুয়ের মধ্যে আবার কেউ মাতৃ-উপাসক, কেউ পিতৃ-উপাসক, কেউ নিরামিষাশী, কেউ মৎস্য-মাংসভোজী, কেউ খোঁজেন মোক্ষ, কেউ চান পারমার্থিক লীলানন্দে লীন হতে। কেউ সন্ন্যাস বৈরাগ্য ও যৌন সংহারের সমর্থক, কেউ পানভোজন ও ইন্দ্রিয় সেবার অতিশয়তাকামী। স্বভাবতই বাইরে থেকে

দেখে বুঝতে ধাঁধা লাগে, এঁরা সবাই একশ্রেণীভুক্ত কিনা। শুধু পূজোপাসনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নয়, স্নান পান ও খাদ্যাখাদ্য নির্বাচন থেকে শুরু করে জাতকর্ম বিবাহ অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি সামাজিক কৃত্যাকৃত্যের ক্ষেত্রেও এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্য দেখা যায় প্রত্যয় ও জীবনচর্যার ক্ষেত্রেও। এই জন্যেই বলা যেতে পারে যে হিন্দুধর্ম একটা ধর্ম নয়, তা একটা ধর্ম সমবায়ের মত এবং বহুদিন ধরে সংগঠিত হয়েছে বলেই, তার মধ্যে এত রকম পরস্পর বিরোধিতার চেহারা প্রকট।

এই পরস্পর বিরোধিতা কি মারাত্মক আকারে হিন্দুধর্মের মর্মস্থলে চেপে আছে,তা আমাদের প্রত্যয় ওপ্রতিদিনের অভ্যাসগুলির অসঙ্গতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। আমরা বলি প্রাণী মাত্রেই পরমেশ্বরের সন্তান, জীব মাত্রেই শিব, কিন্তু সমাজে মানব সংহতিকে এমন সুকৌশলে চার ভাগে ভাগ করে রেখেছি আমরা,যাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অর্থাৎ পুরোহিত শাসক ও বণিকরাই সমস্ত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হয়ে বসেছেন এবং শূদ্রেরা হয়েছেন সর্বাধিকারে বঞ্চিত। তাঁদের নারীর ইজ্জত ও পুরুষের মেহনত ভাঙিয়েই গড়ে উঠেছে হিন্দু সভ্যতার ইমারত। অথচ তাঁরা জনতার তিন চতুর্থাংশ হয়েও পশুর অধম বলে গণ্য। তাঁদের শিক্ষালাভ নিষিদ্ধ, কানে বেদমন্ত্র ঢুকলে সে কানে গরম শিসে ঢালার আদেশ আছে। তাঁরা কেউ নৃপতি ভূপতি রাজচন্দ্র প্রভৃতি জমকালো নাম নিতে পারবেন না, তাঁদের হতে হবে পদরেণু দীনদাস কাঙাল। তাঁরা কেউ তপস্যা করলে তার শিরশ্ছেদ হবে, যেমন হয়েছে রামের হাতে শম্বুকের। অস্ত্রবিদ্যা শিখলে হাতের আঙুল কাটা যাবে, যেমন গেছে একলব্যের দ্রোণাচার্যের শয়তানিতে। অথচ গুহক চণ্ডালের ভেলায় ভর দিয়ে নদী পার হতে আটকাবে না পুরুষোত্তম রামের। তরুণী ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধাকে দ্বীপে টেনে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করতে আটকাবে না বেদব্যাস-পিতা পরাশরের। এই বর্ণাশ্রমী ভেদবুদ্ধির সংগে সর্বাত্মক ব্রহ্মবাদকে, জীব শিব তত্ত্বকে খাপ খাওয়ানোর প্রয়াস করেন যাঁরা, বুদ্ধির তারিফ না করে উপায় নেই সেই সব ভারততত্ত্ববিদের। এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ভেদই ভারতে ইতিহাসের প্রধান কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আজও ঘোচে নি। প্রকৃত পক্ষে শূদ্র কারা? ভারতের প্রাগার্য অধিবাসীরা? যাঁরা বিজয়ী আর্যদের সঙ্গে আপস না-করে বনে জঙ্গলে পালিয়ে যান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষাদীক্ষার

উত্তরাধিকারভ্রষ্ট হন, তাঁরাই হলেন আজকের আদিবাসীরা। আর যাঁরা বশ্যতা কবুল করলেন, তাঁরাই শূদ্র এবং তাঁরা হলেন আর্য ভারতের দাস জাতি। এই শূদ্রের বেদ ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞ বিরোধী আন্দোলনই প্রকাশমান হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্যে দিয়ে। বৌদ্ধ অবক্ষয়ের পর আবার অন্ত্যজে পরিণত এই শূদ্রেরাই ১২শ শতকে আগত ইসলামকে স্বাগত করেন। ২০শ শতকের ভারত বিভাগ ও পাক-ভারত দ্বন্দ্বের আদি সূত্র নিহিত এর মধ্যেই, এই মর্মান্তিক সত্যটা ভুললে চলবে না।

চিন্তায় ও কর্মে অনুরূপ স্ববিরোধিতা দেখা যায় হিন্দু সমাজে নারীর স্থান ও অধিকার নির্ণয়ের ব্যাপারেও। এক দিকে আমরা স্রষ্ট্রীশক্তিকে আদ্যাশক্তি মহামায়া সাজিয়ে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছি এবং বসুমতী, নদী, অন্ন, বিদ্যা বিত্ত ও সামর্থ্য, জীবনের পক্ষে অপরিহার্য প্রত্যেকটি উপকরণকে এক একটি খণ্ড শক্তি রূপে স্বীকৃতি দিয়ে, অখণ্ড আদ্যাশক্তির পরিকল্পনাটিকে মহিমান্বিত করেছি, মুখে বলেছি যেখানে নারীরা সম্মানিত হন, সেখানে দেবতারা বিহার করেন, অন্যদিকে গৃহ-পরিবারে নারীকে ভারবাহী জীবের বেশী কিছু ভাবিনি। শূদ্রের মত নারীরও শিক্ষার অধিকার খর্বিত হয়েছে। দুচারটি গার্গী মৈত্রেয়ী লীলবতী খনা [ ক্ষণা ? ] প্রভৃতির নাম নিছক ব্যতিক্রম হিসাবে গণনীয় হলেও, সর্বসাধারণের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান কোন দিনই প্রবেশ করেনি। সপত্নী-বিড়ম্বনা, অকাল-বৈধব্য ও বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য, অথবা মৃত স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় দহন, কত রকম দুর্ভোগেরই শিকার হতে হয়েছে নারীকে, যার ফলে অনেকে বিপথগামিনী হয়েছেন, ধর্ম ও সমাজের বিরোধিতা করে অনেকে ভিন্ন ধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন। বার্ধক্যে তীর্থস্থানে গিয়ে অনেকে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করেছেন। মনু থেকে রঘুনন্দন পর্যন্ত নারীনিগ্রহের বিধানদাতাদের সুদীর্ঘ শ্রেণী চলে এসেছে একটানা উনিশ শতক পর্যন্ত। নারীত্রাতা রূপে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী রূপে বিবেকানন্দ ও গান্ধীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল, শুধু বিদেশী শাসনের রন্ধ্রপথ দিয়ে বাইরের আলো হাওয়া কিছু কিছু এসেছিল বলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও জাতিভেদ মরে নি, অন্তর্ভোজন ও অন্তর্বিবাহ এখনো সর্বজনীন রীতি হিসাবে চলেনি। বিধবা বিবাহ কিংবা বিধবার সাজ সজ্জা ও আহার বিহারের স্বাচ্ছন্দ্য এখনো সমাজ-স্বীকৃত ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হয় না। তথাকথিত বামনাই ও শাস্ত্রানুগত্য এখনো সমাজ চেতনার

সদর রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। বহুযুগ, বহুজাতি ও বিচিত্র আচার অভ্যাসের সমবায়ে তৈরি হয়েছে বলে হিন্দুধর্মের গঠনে বৈচিত্র্য বৈপরীত্য ও বহুমুখিনতার যে রকম সমাবেশ হয়েছে, তাতে তার জীবন-দর্শন নমনীয়, সহনশীলতা ও ঔদার্যের দ্বারা চিহ্নিত হবে, এটাই প্রত্যাশিত ছিল। দুঃখের বিষয় সুপ্রাচীন কাল থেকে তার আদর্শ ও অভ্যাসের মধ্যে একটি অনড় গতানুগতিকতাই গ্যাঁট হয়ে চেপে আছে। বৌদ্ধ জৈন ইসলাম খ্রীষ্টান, কোন সংস্কৃতিই তার ভিত আমূল নাড়াতে পারেনি।

হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ রূপে শিব, বিষ্ণু [ অথবা তাঁর অবতার রাম ও কৃষ্ণ ] এবং কার্তিক গণেশ প্রভৃতি পুরাণ-প্রকীর্তিত পুরুষ দেবতার পুজো যেমন প্রচলিত আছে, তেমনি আছে দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী শীতলা মনসা প্রভৃতি নারী দেবতার পুজো। তাছাড়া কিছু কিছু নারী ও পুরুষ আঞ্চলিক দেবতা, যথা ঘণ্টাকর্ণ জরাসুর দক্ষিণ রায় ওলাবিবি ঘেঁটু টুসু ভাদু প্রভৃতির পুজো যেমন দেখা যায় পশ্চিম বাংলার নানা জেলায়, তেমনি ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও আছে, বিচিত্র লৌকিক দেবদেবীর পুজো। কিন্তু লক্ষণীয় যে বিশেষ বিশেষ দেবতাকে কেন্দ্র করে উপাসক গোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি হিন্দুদের মধ্যে খুব বেশী সংখ্যায়। সম্প্রদায় হিসাবে শিব উপাসক শৈবেরা, বিষ্ণু উপাসক রামায়েৎ ও কৃষ্ণায়েৎ বৈষ্ণবেরা এবং শক্তি উপাসক শাক্তেরাই হলেন অগ্রগণ্য। সূর্য উপাসক সৌর, গণপতি উপাসক গাণপত্য এবং উনিশ শতকে উদিত নিরাকার ব্রহ্ম উপাসক ব্রাহ্মদের নামও অবশ্য এই সঙ্গেই উল্লেখ্য, যদিও সম্প্রদায় হিসাবে তাঁরা খুব বৃহৎ নন। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে ব্রাহ্মরা আদি গ্রন্থ রূপে উপনিষদের আনুগত্য করেন, অবশিষ্টেরা করেন পুরাণের। ব্রাহ্মরা জ্ঞানবাদী, আর শেষোক্তেরা সবাই ভক্তিবাদী এবং তাঁদের মধ্যে শিব-শক্তি,রাম-সীতা ও রাধা-কৃষ্ণের যুগল আরাধনা করেন যাঁরা, তাঁরাই সর্বাধিকসংখ্যক। শিবতত্ত্ব আশ্রয় করে তৈরি হয়েছে পরবর্তীকালে বীরশৈব বা নকুলীশ পাশুপত দর্শন, যা শংকরীয় অদ্বৈতবাদের অনুগামী, আর রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বকে ঘিরে তৈরি হয়েছে গৌড়ীয় ভক্তি দর্শন, যা রামানুজ ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থক। অন্য ধর্মমতগুলি কোন দর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। তবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছেন কিছু সংখ্যক করে সন্ন্যাসী বৈরাগী ও উদাসীন, যাঁরা স্ব-স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহস্থদের অন্নজলে পুষ্ট এবং স্তব-স্তুতিতে সংবর্ধিত হন। এঁদের যে অংশ শিব-শক্তি উপাসক, তাঁরা সাধনার

নামে কি ভাবে গৌরীগ্রহণ ভূতসিদ্ধি অঙ্গসিদ্ধি লিঙ্গসিদ্ধি ও বামাচারের উৎপাতে সমাজের স্বাস্থ্য কলুষিত করেন, আর রাধা-কৃষ্ণ উপাসকেরা কিশোরীভজন ও প্রেমচর্চিকার দাপটে ভদ্রজনকে বিপথগামী করেন, তা অভিজ্ঞ মানুষেরা অবশ্যই জানেন। আগ্রহীরা বর্তমান লেখকের 'সমাজ সমীক্ষা: অপরাধ ও অনাচার' পুস্তকে এসব প্রসঙ্গের বিবরণ প্রয়োজন হলে দেখে নিতে পারেন।

মোটের উপর যে কোন মত পথ ও উপাসনা পদ্ধতিরই আনুগত্য করুন, হিন্দুদের মধ্যে কতকগুলি প্রত্যয়গত একাত্মতা দেখা যায়। সবাই অবতার-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। সবাই কর্মফল বা ভবিতব্য ও পুনর্জন্ম মানেন। সবাই পাপ পুণ্য ও স্বর্গ নরকে আস্থা রাখেন এবং সৎক্রিয়ার দ্বারা কর্মক্ষয় ও মোক্ষ লাভ হয় মনে করেন। একমাত্র লোকায়তিক এবং চার্বাকপন্থী নিরীশ্বর-বাদীরা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁরা আর ক-জন ছিলেন? যাই হোক এই প্রত্যয়গুলির প্রকৃতি একটু যাচাই করে দেখা যাক। তার আগে বলা দরকার যে এসব প্রত্যয় শুধু হিন্দুদের মধ্যেই চলিত আছে তা নয়। বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানরাও মেশায়া, প্রেরিত পুরুষ, পয়গম্বর বা অবতারে বিশ্বাস করেন এবং সবাই কোন না কোন ভাবে ঐ যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিরভ্যুত্থানম-ধর্মস্য গোছের শাস্ত্রবাক্য আওড়ান। আসলে প্রতি যুগে বিশেষ বিশেষ ধরণের সংকট সমস্যা ও জটিলতার আবর্ত থেকে মুক্তির দিশা দেখান যাঁরা, যাঁরা মানুষের বেদনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দেন সার্থকরূপে, একালে তাঁরা হন লিনকন, লেনিন, গান্ধী, সেকালে হতেন বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ। তবে নৈষ্ঠিক মুসলমানদের প্রত্যয়ে এ জায়গায় একটু পার্থক্য আছে অন্যদের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, প্রভু মহম্মদই ঈশ্বরের শেষ নবী এবং মানব মঙ্গলের শেষ কথা যা তা বলে গেছেন তিনিই। একথার প্রতিবাদ করে পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে গত শতাব্দীতে উঠে ছিলেন আব্দুল আহমদ। তিনি বলেন, ইসলামের আধুনিকতম পয়গম্বর তিনি। তাঁর সম্প্রদায় কাদিয়ানী বা আহমদীয়া নামে পরিচিত। অনেকেই জানেন আশা করি যে এই নূতন নবী আব্দুল আহমদ কাবুলে ধর্ম প্রচারার্থে গিয়ে নিহত হন গোঁড়াদের হাতে। খাজা ইস-মাইলীরাও তাঁদের আচার্য আগা খাঁকে প্রেরিত পুরুষ বা ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজো করেন। নৈষ্ঠিকরা এঁদের বা এই রকম আর যে যে ব্যতিক্রমবাদীরা আছেন, তাঁদের খাঁটি মুসলমান বলে মানতে চান না।' কিন্তু ও প্রসঙ্গ থাক।

কর্মফল ও পুনর্জন্মের তত্ত্বটি নিয়ে একটু যাচাই করে দেখা যাক এবার।

হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এ জায়গায় আশ্চর্য মিল দেখা যায়। উভয়েই মনে করেন, কর্মের প্রতিক্রিয়াতেই মানুষকে জন্ম-জন্মান্তরের পথে পরিভ্রমণ করতে হয়। আর জন্মের স্তরও নির্ধারিত হয় নিজ নিজ সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে। বৌদ্ধেরা এ জায়গায় বলেন, কর্ম বিরহিত হয়ে জন্ম বিরহিত হওয়ার অর্থাৎ নির্বাণ লাভের কথা। আর হিন্দুরা বলেন, সৎক্রিয়ার দ্বারা কর্মক্ষয় করে মোক্ষ লাভ করার কথা। খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের প্রত্যয় সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা বলেন, মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানুষই কবরে ঘুমাবেন কল্পান্ত কাল পর্যন্ত। তারপর একদিন আসবে ডুমস ডে বা রোজ কেয়ামতের বেলা। তখন ভেরী বাজবে এবং সবাই উঠে ঈশ্বরের সম্মুখীন হবেন, দেবেন নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসাব। পুণ্যাত্মারা অতঃপর যাবেন স্বর্গে এবং পাপীরা যাবেন দোজখ বা নরকে। এই স্বর্গবাস ও নরকবাস ওঁদের মতে চিরন্তন, কাজেই কর্মফলের আবর্তনে পুনর্জন্মের আর সম্ভাবনা নেই। স্বর্গ ও নরক যথাক্রমে পুণ্য ও পাপের দ্বারা অর্জিত হয় একথা বলেন হিন্দুরাও। তাঁদের বিচারে কল্পান্তে দুয়েরই ক্ষান্তি আছে এবং তাই আবার জন্মবন্ধে ধরা পড়তে হয় মানুষকে।

স্বর্গ নরকের পরিকল্পনা পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতিই করেছেন। গ্রীকদের ইলিসিয়াম ও হেডস হল যথাক্রমে খ্রীষ্টানদের স্বর্গ ও নরকের আদি উৎস। দান্তে এবং মিলটন এই ছাঁচকেই কবি-কল্পনার ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করে দেখেছেন। নরকে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের পাপী নিগ্রহ চেহারায় হিন্দু নরক থেকে তফাৎ নয়। কিন্তু স্বর্গসুখের প্রকৃতিতে মুসলমানরা যে রকম হুরী পরী ও সাকী সরাবের ছড়াছড়ি করেছেন, অন্যেরা তা করেন নি। বলা দরকার যে সাকী কথাটা মদ্যবাহিনী সুন্দরী নারীর অর্থাৎ সখীর প্রতিশব্দ নয়, সাকী হল সুদর্শন কিশোর বালক এবং পুণ্যাত্মারা নাকি বেহস্তে তাও পাবেন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যে। পাপ বস্তুটা সম্বন্ধে কার কি প্রত্যয়, তাও একটু বলি। খ্রীষ্টানরা ও মুসলমানরা বলেন, আদি জননী ইভ যেদিন জ্ঞানবৃক্ষের ফল খান, অর্থাৎ যৌন বোধ লাভ করেন, সে দিনই প্রথম পাপ এসে মানুষকে আক্রমণ করে এবং ঈশ্বরের পাশাপাশি শয়তানও হয় মানুষের অনতিক্রম্য সহচর। সেখান থেকে মানুষ আর মুক্তি পায়নি। ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে এই ইবলিস বা শয়তানের পরিকল্পনা এসেছে বোধ হয় জেন্দাভেস্তায় বর্ণিত পুণ্যময় ও পাপময় দ্বিবিধ ঈশ্বরের ধারণা থেকে। আহুর মজদা হলেন

আভেস্তায় আলোকরূপী ঈশ্বর, অরহিমান তমোরূপী পাপ। বলা বাহুল্য এরকম কোন পাপ পুণ্যের কল্পনা হিন্দুরা করেননি, জন্মান্তরীণ পাপের অনুবৃত্তি যদিও স্বীকার করেন তাঁরাও। অবশ্য বৌদ্ধদের শাস্ত্রে মার নামে এক পাপপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু মার ঠিক আভেস্তার অরহিমান বা বাইবেলের ডেভিল নন। তা অনেকটা রূপকের মত। বৌদ্ধদের নির্বাণ, জৈনদের অনেকান্ত ও হিন্দুদের মোক্ষ সম্পর্কীয় ধারণা নিয়েও তুলনাত্মক আলোচনা দরকার, যা একই রকম অলীক ও অবিজ্ঞানসম্মত বিশ্বাসের ফল।

॥ বৌদ্ধধর্মের বিপ্লবী ভূমিকা ॥

আর্য প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বারবার ভারতের ইতিহাসে যে বিদ্রোহ হয়েছে, তা হয়েছে নিগৃহীত ও অসম্মানিত তথাকথিত নীচের সোপানের মানুষদের মধ্য থেকেই। দর্শনের রাজ্যে এই বিদ্রোহের বাণী ধ্বনিত হয়েছে মখোলী-পুত্র গোসাল, কেশকম্বলী ও চার্বাকের রচনায়। আর ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে বেদ, ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞ বিরোধী বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মে এই বিদ্রোহেরই বৃহত্তর বাস্তব রূপটি প্রকটিত হয়েছে। বুদ্ধ যে বংশে জন্মেছিলেন, তা লিচ্ছবি গোষ্ঠীভুক্ত, আচার-অনুষ্ঠানে তাতে আর্য কৌমব্যবস্থিত আচরণবিধির সঙ্গে মিলের চেয়ে গরমিলই বেশী ছিল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহোদরা বিবাহ প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। স্বয়ং বুদ্ধের খুল্লতাত পুত্র দেবদত্ত আপন ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু সে কথা থাক। বুদ্ধ যে সাম্যবাদী ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তাতে বর্ণাশ্রমিক আভিজাত্য ধ্বংস করে সর্বমানবিক ঐক্য স্থাপনই প্রধান লক্ষ্য ছিল, এই মোটা কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। এই বিদ্রোহেরই আত্মিক দিকটা আরো আগে প্রকটিত হয়েছিল বিশ্বামিত্র-বংশীয়দের আর্যাচার বিরোধিতায়। বস্তুবাদী চার্বাক দর্শন যে বেদোপনিষদ প্রভাবিত ধর্ম প্রত্যয়ের ওপর আঘাত হেনেছিল এবং সমাজে বাস্তব কল্যাণাশ্রিত জীবননীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, সেও এই বিদ্রোহেরই আদি বীজ স্বরূপ। বুদ্ধ এই নানামুখে ব্যাপ্ত ও বহুধা-বিক্ষিপ্ত অসন্তোষ ও বেদনাকেই তাঁর আন্দোলনে সংহত করেছিলেন। তাই ভারত ইতিহাসে তিনিই হলেন মানুষের প্রথম মুক্তিদাতা, প্রথম বিপ্লবী, আবার প্রথম জনগণমন অধিনায়কও।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী বিনয় ও বৈরাগ্যকেই এ দেশে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এরই সংগ্রামশীল বিদ্রোহের দিকটি আমরা

যে কারণেই হোক উচিত মূল্যে গ্রহণ করিনি। কিন্তু ভারতের আদি শৈব শাক্ত অধিবাসী যাঁরা আর্য প্রভুত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, পরিণত হয়েছিলেন সর্বাধিকারভ্রষ্ট শূদ্র দাসে, বৌদ্ধধর্ম সেই সুবৃহৎ মানব গোষ্ঠীকেই ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিল, নূতন নীতি ও জীবন চিন্তার আলোয়, ভারতীয় সমাজ সংগঠনের কাঠামোটি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য। তাই শুধু সমাজকর্তৃত্ব নয়, রাষ্ট্রশাসনকেও তা আপন আয়ত্তে এনেছিল, সেই গঠনের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে। অশোক থেকে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত, [ খ্রী: পূ: ৩য় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক পর্যন্ত ] প্রায় অল্লাধিক হাজার বছর বহালও থেকেছে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রভুত্ব। কিন্তু তার ধার ভোঁতা করে দেবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেনি কোনদিনই আর্য ভারত। পুরোহিত, রাজা ও শ্রেষ্ঠীরা দলে দলে বৌদ্ধ ধর্মায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের প্রভাবে তার গণতান্ত্রিক রূপটি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। এসেছে তাতে একদিকে দেববাদ, অবতার-বাদ, অদৃষ্ট ও পুনর্জন্মবাদ, অন্য দিকে এসেছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শ্রেষ্ঠীর সেই সাবেকী প্রাধান্য। তারপর হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারাল যখন বৌদ্ধ ধর্ম, তখন হিন্দু ধর্ম পুনরুদ্ধারের নামে উঠলেন দক্ষিণ থেকে পর পর কুমারিল ভট্ট ও শংকর এবং পাইকারি হারে বৌদ্ধ নিধন করেই আবার প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁরা সনাতনী হিন্দুত্বের একাধিকার। দেশের রাজন্যবর্গ ও বড় বড় ধর্ম সংস্থা তাঁদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। এই বৌদ্ধ বিদ্বেষের মূলে কি ছিল, তা কি আর বোঝাতে হবে ?

আগের কথার জের টেনে বলা যেতে পারে যে, সর্বাধিক সংখ্যায় কারা বৌদ্ধ হয়েছিলেন, তা বোঝা যায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিগ্রহ ও জবরদস্তি সইতে না পেরে দলে দলে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন কারা, তার হিসাব নিলেই। এই ঘরে-ফেরা হিন্দুদের হাতে বৌদ্ধদের নিরঞ্জন বা ধর্ম হয়ে পড়লেন শিব এবং তাঁর পিছু পিছু হেবজ্র, নীলতারা, বজ্রতারা, নানা নামে দেবী কালিকারও পুনর্বসতি হল। বৌদ্ধ শ্রমণ বা ভিক্ষুরাই দেখা দিলেন সিদ্ধাই, হঠযোগী, অবধূত, সহজিয়া, নানা আকারে। ব্রহ্মাশ্রিত উপনিষদ ও বেদানুগ ক্রিয়াকলাপ আকৃষ্ট করল না তাঁদের, তাঁরা নিলেন তন্ত্রের পথ, কারণ সেটাই ছিল হরাপ্পা যুগ থেকে তাঁদের পুরুষানুক্রমিক ধর্মমত এবং বুদ্ধবাদ তাঁদেরকেই পঞ্চশীলের মহৎ আদর্শে ধর্মান্তরিত করেছিল। কিন্তু সনাতনী হিন্দুরা আর তাঁদের সাদরে গ্রহণ করলেন না। তাঁরা রইলেন

সমাজে আবার আগের মতই অচ্ছ্যুৎ হয়ে। এই অবিচারেরই প্রতিশোধ নিলেন তাঁরা তিন শতাব্দী পরে আগত মুসলীম শাসকদের ধর্মকে স্বাগত করে। হিন্দু বৌদ্ধ ভারতের ইতিহাস এই ভাবে পরিণত হল হিন্দু-মুসলমানের ইতিহাসে। এর পর কৃতকর্মের অনুশোচনা বশেই হয়ত বুদ্ধকে হিন্দু দশ অবতারের অন্যতম এবং বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্মেরই শাখা বিশেষ বলে চালান শুরু হয়েছে এবং প্রাণান্ত চেষ্টায় হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে ভাগবত ঐক্য খুঁজে বের করা হয়েছে। বৌদ্ধদের বিনয় বৈরাগ্য ও আস্তেয়কে প্রাধান্য দেওয়া আরম্ভ হয়েছে তখন থেকেই। বুঝে-না-বুঝে তারই অনুবৃত্তি করে যাচ্ছেন সবাই। দুই ধর্মানুমোদিত দর্শনের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা উভয়ের মধ্যবর্তী এই মিল অমিলের প্রশ্নটির মূল্যাই যাচাই করব পরের অধ্যায়ে।

২.

বুদ্ধের জীবনান্তের পর বৌদ্ধেরা কতকগুলি বিভিন্ন যান অর্থাৎ পন্থায় ভাগ হয়ে যান। প্রধান দুটি বিভাগ হল হীনযান ও মহাযান। যাঁরা বুদ্ধের নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে রইলেন, তাঁরা হলেন হীনযানী, আর যাঁরা এই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার সংস্কার অনেকগুলি মেনে নিলেন এবং তাকে বুদ্ধ-নির্দেশিত পথ বলে প্রচার করতে লাগলেন, তাঁরা হলেন মহাযানী। আগেই বলেছি, এই শেষোক্ত সম্প্রদায় বৌদ্ধ মতবাদের আড়াল টেনে পুরাতন শিবশক্তি আরাধনা ও তান্ত্রিক রীতি পদ্ধতির ধারাই অনুসরণ করতে থাকলেন। মহাযান শাখাই ভেঙে ভেঙে কালক্রমে আরো অনেক যান তৈরি হল। তার মধ্যে বজ্রযান, কালচক্রযান এবং বিশেষভাবে সহজযান অগ্রগণ্য। বঙ্গদেশের সহজিয়ারা এই সহজযানীদেরই ধারাবক্ষক এবং এঁরাই বৈষ্ণব বাউল কর্তাভজা, নানা শাখায় পরবর্তীকালে ভাগ হয়ে গেছেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে বুদ্ধ কি বলেছিলেন, কি তাঁর স্বমুখনিঃসৃত বাণী, তা কেউ জানেন না। তাঁব বক্তব্য বলে যে সব আদেশ নির্দেশ বিভিন্ন বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার সবই তাঁর অনুগামীদের দ্বারা অনুলিখিত এবং বেশীর ভাগই পরবর্তী কালের সংযোজন। তথাপি বিনয়, সুত্ত ও অভিধর্ম, এই তিন ভাগে বিন্যস্ত ত্রিপিটক গ্রন্থে এবং ধম্মপদে বুদ্ধবাণীর যে নির্যাস পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় বুদ্ধ এমন এক পরিশুদ্ধ সাম্য ও সমানাধিকারভিত্তিক ধর্ম প্রচার করেছিলেন, যাতে ঈশ্বর নেই, উপাসনা নেই, মোক্ষ নেই, আছে সেবা,

সদাচার, সর্বমানবিক ঐক্য। শ্রেণীস্বার্থ-কলুষিত ও মোক্ষবাদ-কবলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্তির দিশা দেখেছিলেন তাঁর ধর্মে নিগৃহীত নীচু সোপানের মানুষেরা।

বৌদ্ধেরাই ভারতবর্ষে প্রথম গণতান্ত্রিক সমাজচেতনা ও রাষ্ট্রবোধের উদ্‌গাতা। ব্রহ্ম-সন্ধিৎসা ও আত্মা-পরমাত্মার তত্ত্ব ব্যাখ্যাবিষয়ক সূত্রগ্রন্থ এবং সংহিতাদির পরিবর্তে তাঁরা একাগ্র নিষ্ঠায় ফলিত বিজ্ঞানের নানা বিভাগকে পুষ্ট করেছেন। চরক সুশ্রুত নাগার্জুন ভাস্করাচার্য বাৎস্যায়ন কৌটিল্য পানিনি সবাই বৌদ্ধ অথবা বৌদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য একাধিকার থেকে মুক্ত করে বিদ্যাকে বৌদ্ধেরা সবজনগ্রাহ্য করার জন্যে নালন্দা তক্ষশীলা উদ্দণ্ডপুরী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা সকলের সামনে অবারিত করেছিলেন এবং সাধারণের কথ্য ও অধিগম্য ভাষাকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধর্মপ্রচারের প্রধান মাধ্যম করেছিলেন। কিন্তু এই শুভ বিধানগুলি ভারতের মাটিতে দীর্ঘজীবী হল না। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ও হিংস্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় দশম শতকের মধ্যেই ভারত ছাড়া করল বৌদ্ধ ধর্মকে। তা পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমিভাগে ব্যাপ্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং অদ্যাবধি বর্মা, শ্রীলংকা, সিয়াম, খ্মের, আনাম, চীন, কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়ায় সঞ্জীবিত আছে। কিন্তু আপন উদ্ভবভূমিতে বুদ্ধ বেঁচে আছেন শুধু হিন্দু দশাবতারের অন্যতম হয়ে, আর স্মৃতি হিসাবে পড়ে আছে তাঁর প্রচারিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও পঞ্চশীল এবং বিপুল পরিমাণ পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য। ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি যে অবক্ষয়ের অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্মে দেববাদ, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ, নানা জিনিস এসেছিল। এসেছিল শ্রেণীভেদ এবং সঙ্ঘ-মঠাদির জীবন যথেষ্ট আবিলও হয়েছিল দুর্নীতি অনাচার ও অশুচিতার দাপটে। তার সংগঠনকে চূর্ণ করা আরো সহজ হয়েছিল কুমারিল ভট্ট ও শংকরের পক্ষে, এই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগেই।

যে যে সামাজিক কারণে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল, ঠিক সেই সেই কারণেই তার পাশাপাশি উঠেছিল আর একটি ঈশ্বর ও পূজার্চনা-বিবর্জিত ধর্ম। সে হল জৈন ধর্ম। ঈশ্বর না মানলেও এবং বেদ ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞের কর্তৃত্ব অস্বীকার করলেও জৈনধর্ম কিন্তু ব্রাহ্মণ্য আচার-সংস্কারের সবটাই বাতিল করে নি। আর তা করেনি বলেই জৈনধর্ম দেশের বাইরে পা বাড়াতে না পারলেও, হিন্দু ভারতের বিরূপতা লাভ করেনি। আজ পর্যন্ত তা সজীব

আছে। জগৎ চিন্তা ও জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখ্য ঐক্য দেখা যায়। বৌদ্ধদের প্রধান দুটি যানের মত জৈনদেরও প্রধান দুটি শাখা আছে, তা হল দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। ভদ্রবাহু নামক গুরুর অনুগামী দিগম্বরেরা সর্বসংস্কারমুক্ত উলঙ্গতার আদর্শ মানেন এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রতার দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ হয় মনে করেন। শ্বেতাম্বরেরা গৃহী এবং তাঁরা বস্ত্র ব্যবহার করেন। জৈনেরাও বৌদ্ধদের মত বিশ্বাস করেন যে কর্ম অনুসারেই মানুষকে জন্ম জন্মান্তরের পথে ঘুরতে হয় এবং কর্মক্ষয়ের দ্বারা জন্মরহিত হতে হয়। সেই কর্মবন্ধ বিচ্যুত অবস্থাকে বৌদ্ধেরা বলেন নির্বাণ, জৈনেরা বলেন অনেকান্ত। বৌদ্ধদের মত জৈনেরাও বিশ্বজগৎকে জীব ও অজীব দুই প্রধান ভাগে ভাগ করেন। বৌদ্ধেরা জীব অজীব উভয়কেই পাঞ্চ-ভৌতিক উপকরণসম্ভূত এবং বিনাশশীল বলে মনে করেন। জৈনেরা জীবকে চিন্ময় ও অজীবকে পুদগল আকাশ ধর্ম কাল ও অধর্মের সমাহার বলে মনে করেন। পুদগল হল পৃথিবী ও জল, আকাশ হল ব্যোম, কাল হল সময়, ধর্ম হল গতি, আর অধর্ম হল বিনাশ। অর্থাৎ সেই পঞ্চ-ভূতেরই প্রকারভেদ।

বুদ্ধবাণীর মত জৈন তীর্থংকর আদিনাথ ঋষভদেব পার্শ্বনাথপ্রমুখের নির্দেশ অবলম্বনেও লেখা হয়েছে এগারখানি অঙ্গশাস্ত্র বা আচরণবিধি-বিষয়ক গ্রন্থ। এরই পরিশিষ্ট রূপে ধরা হয় অনুযোগ এবং তান্দী নামক আরো দুখানি বই, যা আসলে ব্যাকরণ জ্যোতিষ কামশাস্ত্র রাজনীতি সমাজতত্ত্ব, ওরফে সর্ববিদ্যার সংক্ষিপ্তসার। জৈনেরা বলেন উৎপত্তি ও পরিব্যাপ্তির কাল থেকে শুরু করে জীবন দুঃখময়। তা থেকে নিষ্কৃতির জন্যে চাই সম্যক্ জ্ঞান সম্যক্ দৃষ্টি, আর চাই কঠোর আত্মশাসন। এরই পারিভাষিক নাম অনুব্রত। এতে সিদ্ধির জন্যে অনশনে মৃত্যুবরণ তাঁদের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক আচরণ, যা দিগম্বররা করে থাকেন বলে প্রচার আছে। হয়ত গান্ধী অনশনের আদর্শটি জৈন ধর্ম থেকেই পেয়েছিলেন।

**॥ বুদ্ধ-সমসাময়িক এশিয়ার ধর্ম ॥**

খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দে অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের প্রায় পাঁচশো বছর আগে জন্মেছিলেন বুদ্ধ, আর খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে অর্থাৎ ছশো বছর পরে জন্মেছিলেন মহম্মদ। কিঞ্চিদধিক এই হাজার বছরে পৃথিবীর প্রধান তিনটি ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল এশিয়াতেই। কিন্তু এ-ই সব নয়, আরো অনেক ধর্ম জন্মেছিল এশিয়ায়। বুদ্ধের সমকালেই উঠেছিলেন ভারতে মহাবীর, উত্তর চীনে কংফুৎস ও দক্ষিণ চীনে

লাউৎজে, ইরাণে জরথুষ্ট্র, ইজরাইলে জেরেমিয়া ও ইজেকিয়েল এবং তাঁরা যথাক্রমে জৈন, কংফুৎসীয়, লাউৎজীয়, জরথুষ্ট্রীয় ও ইহুদী ধর্মের গোড়াপত্তন করেছিলেন। এঁদের প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব, কর্মাদর্শ এবং জীবন-দর্শনের মধ্যে মিল গরমিল দুই-ই দেখা যায়। মহাবীরও বুদ্ধের মতই ঈশ্বরে ও পূজাচনায় বিমুখ ছিলেন, তিনিও কর্ম ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং কর্মক্ষয়ে জীবন-মুক্তি হয় মনে করতেন, একথা আগেই বলেছি। কংফুৎসও ঈশ্বর ও পূজো-পাসনা বিমুখ ছিলেন, কিন্তু তিনি কঠোর নিয়মনিষ্ঠা এবং জীবনচর্যার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। অনেকটা লাইকারগাস বা এপিকটেটাসের অনুশাসনের মত অনতিক্রম্য আচরণবিধির ছক বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি অনুগামীদের জন্যে। তাঁর আগে চীনারা ছিলেন মূলত নিসর্গ-উপাসক এবং প্রকৃতির নানা উপাদান ও মৃত পূর্ব-পুরুষদের পূজো করতেন, ড্রাগন পূজোও চলিত ছিল সাধারণের মধ্যে। এঁদের সংহত এবং একটি সাংস্কৃতিক শৃংখলায় আবদ্ধ করেছিলেন কংফুৎস। সাংতি বা পরমেশ্বর সম্বন্ধে হয়ত একটা অস্পষ্ট ধারণা অনেকের ছিল এবং তিনি ইয়ুং ও ইন বা পুরুষ ও প্রকৃতির যুগ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, একথাও বই পুঁথিতে ছিল, কিন্তু জীবনে ছিল না বলেই তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না জনগণ। কংফুৎস তাঁদের উন্নত সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়তে চেয়েছিলেন, তাঁর আচরণবিধিতে তাই বৃদ্ধ সম্পর্কে শ্রদ্ধা, নারী ও শিশুসম্বন্ধে সুবিবেচনা এবং বিদ্যা ও দৈহিকশ্রম সম্বন্ধে নিষ্ঠাই প্রধান স্থান নিয়েছে। এ ছাড়া রাষ্ট্র ও সমাজকে জনকল্যাণের দিকে চোখ রেখে সংস্কারের কথাও বলেছেন তিনি। কারণ তাঁর মতে যে কোন বিধি-বিধানই কলুষিত হয়, প্রশ্নহীন আনুগত্যে দিনের পর দিন অনুসৃত হলে। লাউৎজে প্রচার করেছেন তাও তত্ত্ব, তাঁর ধর্ম তাই তাওবাদ নামে অভিহিত। তিনি বলেছিলেন, জ্ঞান বিত্ত ক্ষমতা কোনটাই সত্য বস্তু নয়, সবই আপেক্ষিক। যাকে কর্তব্য বলা হয়, তা নিছক ভ্রান্তির পিছনে দৌড়ান। সত্য বস্তু হল বৈরাগ্য বা নির্বেদ, অর্থাৎ যোয়ুই, তাও লাভের উপায় তাই। কিন্তু তাও কি? তাও সত্তাও, আবার অসত্তাও, অর্থাৎ সীমিত ভাষার গণ্ডীতে তাঁকে বাঁধা যায় না, তিনি অব্যক্ত ও অনির্বচনীয়। বাক্য মনের অগোচর অনির্বচনীয় ব্রহ্মেরই সগোত্র মনে হতে পারে তাওকে। কিন্তু লাউৎজে বারবার বলেছেন, ইনি সৃষ্টিকর্তা নন, তাঁরও পরে, ইনি নির্বিকল্প সমাধি, ইনি স্থিরমূর্তি ভূমা, ইনি জ্যোতির্ময় সত্যস্বরূপ, অথচ নিরুপাধিক। কাজেই

তাও প্রাপ্তি মোক্ষপ্রাপ্তির নামান্তর নয়। বলা বাহুল্য তাও তত্ত্বের এই দিকটা বেশ ধোঁয়াটে। খোদ কংফুৎসই তা বোঝাতে পারেন নি! তবে লক্ষণীয় যে জ্ঞান ও কর্ম পরিহার করে নির্বেদে আসার নির্দেশ বৌদ্ধেরাও দিয়েছেন মানুষকে এবং তাকেই বলেছেন তাঁরা নির্বাণ। খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী নাগাদ বৌদ্ধধর্ম যখন চীনে আসে, তখন তার নীতিমুখিনতা ও নির্বাণ তত্ত্বের সঙ্গে যথাক্রমে কংফুৎস ও লাউৎজের চিন্তাধারায় প্রাণগত সাদৃশ্য দেখেই হয়ত দলে দলে মানুষ তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম চীনে গিয়ে তার ছাঁচ বদল করেছে, সেই রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম চীনে জাপানে জেন বৌদ্ধধর্ম নামে চলে। তবে উল্লেখ্য এই যে বুদ্ধ কংফুৎস লাউৎজে তিন জনই চীনে দেবতায় পরিণত হয়ে পূজা-মন্দিরে স্থান পেয়েছেন।

লুন য়্যু প্রায় গ্রন্থটি কংফুৎসের এবং তাও-তে-চিং তত্ত্বগ্রন্থটি লাউৎজের সংগ্রহ-রূপে যেমন চীন-চর্চার ক্ষেত্রে অপরিহার্য,তেমনি জেন্দাভেস্তা হল জরথুষ্ট্রের এবং তাঁর অনুগামী পারসিক অগ্নি-উপাসকদের ধর্মকর্ম ও আচার সংস্কার উপলব্ধির উপায়। আভেস্তা বিশুদ্ধ বৈদিক ছন্দে সংস্কৃতের অনুরূপ ও পরে অপ্রচলিত ভাষায় রচিত শাস্ত্রগ্রন্থ এবং তা যশ্ন, বিস্পারদ, বন্দিদাদ, যশত, খোরদা, এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। এর মধ্যে যশ্ন বা যজ্ঞ অংশে আছে গাথা, যা বৈদিক গাথারই সমধর্মী। বন্দিদাদ হল প্রশ্নোত্তরে জগৎ ও জীবন সম্পর্কীয় যাবতীয় তত্ত্বকথার সংকলন, আর যশত হল ঈশ্বর ও দেবদূতগণের উদ্দেশে নিবেদিত যশস্তুতি। অগ্নি-উপাসক বা আদি ইরাণীয়েরা যে বৈদিক আর্যদের নিকটজ্ঞাতি এবং এক উৎস থেকেই দুই দল দু-জায়গায় গিয়ে উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন,একথা আজ মোটামুটি ভাবে স্বীকৃত। সেই আদি উৎসের সন্ধান মেলে ওঁদের ভাষায় সাহিত্যে এখনো কিছু কিছু। কিন্তু ধর্মমতে হিন্দুদের সঙ্গে ওঁদের মিল সামান্যই। আগেই ভিন্ন এক প্রসঙ্গে বলেছি যে জরথুষ্ট্র প্রচার করেছেন দ্বৈতবাদী এমন এক ধর্মমত, যাতে মঙ্গলময় ও অমঙ্গলময় দুই ঈশ্বরের চিন্তা স্থান পেয়েছে। এই দুই ঈশ্বর হলেন যথাক্রমে অহুর মজদা ও অরহিমান। অহুর হল বৈদিক অসুরেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মজদা হল আলোক অর্থাৎ মিত্র। এই আলোকরূপী মঙ্গল-বিধায়ক ঈশ্বর স্পেন্তো মৈন্যুস ও এংগ্রো মৈন্যুস অর্থাৎ সৃষ্টি দূত ও বিনাশ দূত, এই দুইয়ের সাহায্যে বিশ্বব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করছেন। আর অরহিমান তাঁর সুন্দর সৃষ্টিকে পাপ অন্যায় ও অনাচার দিয়ে কলুষিত করতে চাইছেন প্রতিনিয়ত। পাপ পুণ্যের এই মিলিত সংঘাত

চলেছে অনন্তকাল থেকে। এ থেকে ত্রাণের জন্যে চাই সত্য, শুচিতা ও ত্যাগ, যা দিয়ে পাপের শক্তিকে পরাভূত করে ঈশ্বর-সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে হবে পুণ্যাত্মাকে। ঈশ্বর শয়তান দেবদূত ও স্বর্গ নরকের এই ধারণা সম্ভবত পারসিকদের কাছ থেকেই ইহুদী খ্রীষ্টান এবং মুসলমানরা পেয়ে থাকবেন। তবে লক্ষণীয় যে ঐ তিন ধর্মের কোনটাই দুই ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়, তাঁদের শয়তান পাপপুরুষ হলেও ঈশ্বর নন তিনি। স্মরণ রাখতে হবে যে জেন্দ ধর্ম তার উদ্ভবভূমি থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের মত এবং তা হয়েছে ইসলামের আবির্ভাবে। মুষ্টিমেয় অগ্নি-উপাসক পারসীরা এখন শুধু আছেন ভারতবর্ষে। অর্থাৎ জেন্দ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে পুরোপুরিই ভারতীয় ধর্মই।

২.

কংফুৎস লাউৎজে ও জরথুষ্ট্র প্রচারিত ধর্মমতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আগের অধ্যায়ে লিখেছি এবং সেই সূত্রে দেখিয়েছি যে কংফুৎস প্রচারিত নীতি-নিষ্ঠার সঙ্গে বৌদ্ধদের পঞ্চশীল ও আচার বিশুদ্ধির যেমন মিল আছে, তেমনি লাউৎজে প্রচারিত তাওতত্ত্ব এবং নির্বেদ বা বৈরাগ্যতত্ত্বের সঙ্গে হিন্দুদের ব্রহ্মবাদ, বৌদ্ধদের নির্বাণ এবং জৈনদের অনেকান্তবাদের বেশ মিল আছে। আর জগৎ ও জীবনের উদ্ভব এবং পরিণতি নির্ধারণে হিন্দু বৌদ্ধ বস্তুবাদী চিন্তার সঙ্গে চৈনিক চিন্তার মিল ত আছেই প্রচুর। উভয়েই মনে করেন, বস্তুর মধ্যে নিহিত প্রাণশক্তি প্রাকৃতিক নিয়মে অভিব্যক্ত হতে হতে একদিন জগৎরূপে প্রকাশমান হয়েছে, তাতে এসেছে জীবন এবং সেই বিচিত্র সোপান-পরম্পরা পার হতে হতে তার বর্তমান রূপে পৌঁছেছে। অতএব সত্য অহিংসা ও প্রেমের আলোয় জীবনকে বিকশিত করাই শ্রেয় কর্ম। জরথুষ্ট্রীয় মতবাদ, বলা বাহুল্য এ থেকে পৃথক এবং আগেই দেখিয়েছি, তা দ্বৈত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে মানেকজী নামের জানজী বলেন, আভেস্তা মঙ্গলময় ও অমঙ্গলময় দুরকম ঈশ্বরের পরিকল্পনা করেছেন, একথা ভুল। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়ই। তবে তাঁর একই সঙ্গে যেমন আছেন একটি স্রষ্টারূপ, তেমনি আছেন একটি সংহারকরূপ, যেমন আছেন একটি পুণ্যরূপ, তেমনি আছে একটি পাপরূপ। সৃষ্টি ও লয়, শুভ ও অশুভ, এ দুইয়ের সমমাত্রিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই বিশ্বব্যাপার নির্বাহ করছেন তিনি এবং তিতীর্ষু মানবাত্মাকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করছেন। অর্থাৎ যে কোন ধর্ম-

ব্যাখ্যানের মত এখানেও গোঁজামিলের সাহায্যেই সমাধানে পৌছান হয়েছে। অনুরূপ গোঁজামিলের আতিশয্য দেখা যায়,জরথুষ্ট্রীয়দের অনির্বাণ আলোকশিখা প্রজ্জলিত রাখার এবং নিঃশব্দতার দুর্গে মৃতদেহ শায়িত রেখে তা চিল শকুন দিয়ে খাওয়ানর মহিমা ব্যাখ্যানেও। বলা বাহুল্য এ সবই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রচলিত আচার অভ্যাসের অন্ধ অনুবৃত্তি মাত্র। লক্ষণীয় যে পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক ও অবতারবাদে তাঁরাও বিশ্বাসী এবং মানুষকে উদ্ধারের জন্যে যে কোন দিন অপাপবিদ্ধ পরিত্রাতা জন্মাবেন, এ তত্ত্বটি আদিতে তাঁদেরই, যা ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা নিয়েছেন অন্যগুলির সঙ্গে।

এবার জুডাইজম বা ইহুদী ধর্ম সম্বন্ধে দু-চারটি কথা। আদিতে হিব্রু বা ইহুদীরা ছিলেন জুডিয়া ও ইজরাইল, এই দুই অংশে বিভক্ত প্যালেষ্টাইনের অধিবাসী এবং তাঁরা ছিলেন বহুদেববাদী ও নিসর্গ উপাসক। রাজা সলোমনই প্রথম সর্বশক্তিমান জিহোভার পূজো প্রবর্তন করেন এবং জেরু-জালেমে তাঁর নামে মন্দির স্থাপন করে ইহুদীদের সংহত করেন একটি শক্তিশালী জাতি হিসাবে, আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ প্রথম সহস্রাব্দে। কিন্তু আপন দেশে টিঁকতে পারলেন না ইহুদীরা বেশীদিন। আগে ব্যাবিলনের, তারপর পারস্যের ক্রমিক আক্রমণে স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে তাঁরা মিশরে আশ্রয় নেন। কয়েক প্রজন্মের পরে মিশরেও তাঁদের অবস্থা দুঃসহ হয়ে ওঠে। তখন লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে মোজেস বিপন্ন স্বগোষ্ঠীকে বের করে আনেন ইজরাইলে। এখানেই খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী নাগাদ জেরেমিয়া, ইজেকিয়েল, প্রমুখ আচার্যেরা একটি তাত্ত্বিক বনিয়াদের ওপর দাঁড় করান ইহুদী ধর্মকে। কিন্তু ফের রোমানদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হল তাঁদের সংগঠন এবং বিপন্ন ইহুদীরা ছড়িয়ে পড়লেন দুনিয়ার দিকে দিকে। এরপর প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরেই জন্মভূমিভ্রষ্ট যাযাবর জাতি হয়ে পড়েন তাঁরা। এই ইহুদীদের মধ্যেই যদিও জন্মেছেন কার্ল মার্কস, ফ্রয়েড, আইনষ্টাইন ও টমাস মানের মত মহান মানুষেরা, তবু তাঁরা ছিলেন চির গৃহহীন। সেই স্বভূমি পেয়েছেন তাঁরা মাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮-এ। কিন্তু ও কথা থাক। ইহুদী জাতির ইতিহাসের সঙ্গে যেহেতু তাঁদের ধর্মবোধ ও জীবন-প্রত্যয় অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত, তাই তাতে শান্তি এবং প্রসন্নতার ছবি সব সময় প্রতিফলিত হয়ে দেখা যায় না। বরং ইহুদীদের জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতি রক্ষার, বিনষ্ট ভূমি পুনরুদ্ধারের এবং ঈশ্বরের নির্বাচিত সন্তান রূপে ইহুদী জাতিকে প্রতিষ্ঠিত

করার আশ্বাসই বারবার উচ্চারিত হয়েছে তাঁদের সৃষ্টিকর্তার মুখে। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নেওয়া এবং ভিন্ন ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে ঘৃণাপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনই প্রকৃষ্ট নীতি বলে প্রচারিত হয়েছে তাঁদের শাস্ত্রে। আর প্রেরিত পুরুষ বা মেশায়ার আবির্ভাব হবে আগামী কোন দিন এবং তিন সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ ও পুণ্যাত্মাদের পুনর্বসতি বিধান করেই পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য ফিরিয়ে আনবেন, একথা বলা হয়েছে জোরের সঙ্গে। এছাড়া দৈহিক ও মানসিক শুচিতা, খাদ্যাখাদ্য বিচার, সত্যনিষ্ঠা এবং ত্যাগশীলতার আদর্শও প্রশংসিত হয়েছে ইহুদী ধর্মে। একথা সবাই জানেন, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলীম ধর্মের আদি ইতিহাস একই। সেই একই বাইবেলের পুরাতন অনুশাসন বা ওল্ড টেষ্টামেণ্টে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব, আদম-ইভের কাহিনী, নোয়া ও মহাপ্লাবনের কাহিনী, জেকব ডেভিড ও আব্রা-হামের কাহিনী, সবাই স্বীকার করেন। সবাই কবুল করেন ঈশ্বর ও শয়-তানের মধ্যে সংঘটিত শক্তিদ্বন্দ্বের এবং তার ফলে পৃথিবীতে পাপ ও মৃত্যুর অনুপ্রবেশের কাহিনী। স্বর্গ নরকের প্রত্যয়ও একই রকম প্রায় তিন ধর্মে। উপাসনা পদ্ধতিতে অবশ্য পার্থক্য আছে।

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১ম শতকে রচিত বাইবেলে প্রাচীন অনুশাসন বা ওল্ড টেষ্টামেণ্ট একই সঙ্গে ইহুদীদের ইতিহাস ও ধর্মশাস্ত্র যদিও, কিন্তু তার তত্ত্ববস্তু বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে পরবর্তী কালে রচিত তালমুদ গ্রন্থে। তালমুদ তোরা অনেকটা আমাদের বৈদিক সূত্রগ্রন্থগুলির মত এবং তাতে শব্দার্থ থেকে সত্য অসত্যের দার্শনিক বিচার পর্যন্ত, না আছে কি? অধ্যাপক ৎসিমার বলেন, বিষয় হিসাবে প্রাচীন অনুশাসনে না বোঝার কিছু নেই। কিন্তু ব্যাখ্যাতারা পদে পদে তত্ত্বকথার যে গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করেছেন দশ খণ্ডে ব্যাপ্ত তালমুদ গ্রন্থে, তার মর্মে প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। এখানে বলে রাখা দরকার যে বাইবেলের প্রাচীন অনুশাসন ও নূতন অনুশাসন আসলে কিন্তু একখানি বই নয়, অনেকগুলি বইয়ের সংগ্রহ এবং প্রাচীন অনুশাসন অংশ হিব্রুতে এবং নূতন অনুশাসন অংশ গ্রীকে লেখা হয়েছিল আদিতে। ইহুদী ধর্মের প্রধান প্রতিপাদ্যগুলির কথা ত আগেই বলেছি। লক্ষণীয় যে খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ১ম সহস্রাব্দে ওঁরা যখন সর্বশক্তিমান জিহোভার আরাধনা শুরু করেন, ভারতবর্ষেও তখনই ব্রহ্মমহিমা প্রকীর্তিত হচ্ছে উপনিষদের মাধ্যমে। তবে জিহোভা ব্রহ্মের মত অনির্বচনীয় তত্ত্ব মাত্র নন, তিনি প্রকট অধিশাস্তা

এবং তাঁর দশবিধ নির্দেশ তাঁর অনুগামীদের নির্বিচারে মানতে বলা হয়েছে ইহুদী ধর্মে। অবশ্য সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের অবতারণায় ইহুদী পাণ্ডিত্য হিন্দু মনীষার চেয়ে যে কম প্রখরতা দেখায়-নি, তা বোঝা যায় তালমুদের যে কোন অধ্যায়ের ওপর চোখ বুলালেই। পাপ পুণ্যের যে চুলচেরা বিচার ঠাঁই পেয়েছে ওতে, তা সত্যিই বুদ্ধি-বিভ্রান্তিকর!

**॥ খ্রীষ্টধর্ম ও ভারতবর্ষ ॥**

খ্রীষ্টধর্ম ভারতবর্ষে কবে এসেছিল, তার কোন নিশ্চিত ইতিহাস পাওয়া মুস্কিল। ধরা হয় খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের কোন সময়ে সেণ্ট টমাস কয়েকজন অনুগামী সহ দক্ষিণ ভারতের কেরল উপকূলে আসেন এবং সেখান থেকে মাদ্রাজে গিয়ে তিনি একটি গির্জা স্থাপন করেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতকেই প্রথম ভাগ্য ফেরানর আশায় খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী পর্তুগীজ ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজ বণিকরা জাহাজ ভাসিয়ে ভারতে আসতে থাকেন। সামনে ক্রুশধারী পাদ্রী ও পিছনে বন্দুকধারী সিপাই নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে হাজির হন তাঁরা। তারপর একে একে বসে যান ব্যবসার ঘাঁটি গেড়ে এবং বলাই বাহুল্য ভাবী সুযোগের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকেন। ক্রমে সুযোগ-সুবিধার বখরা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বেধে যায় মারামারি কাটাকাটি এবং অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজরা আর সবাইকে হারিয়ে দিয়ে কায়েম হন বাংলার শাসন তক্তে। সেখান থেকে পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই অধিকারসীমা পরিব্যাপ্ত হয় তাঁদের সারা ভারতে। শুধু পর্তুগীজ ও ফরাসীদের অধিকারে থাকে অল্প কয়েকটা ছিটতালুক, য তাঁরা প্যান সন্ধির শর্ত হিসাবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়। আমি বলছি খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের কথা এবং তা ইংরেজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরই সহজসাধ্য হয় এদেশে। কালিকটে ভাস্কো দা গামা ও আলবুকার্কের দল ১৫শ-১৬শ শতকে কিছু মানুষকে জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করিয়েছিলেন এবং তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন পরে সেণ্ট জেভিয়ার, যাঁর নামাঙ্কিত স্কুল কলেজ এখনো চলছে। অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম ভারতবর্ষে এসেছে বড় জোর দুশো বছর। যদিও বয়স তার প্রায় দু-হাজার বছর। নীচু সোপানের নিগৃহীত হিন্দুরাই যেমন ১২শ শতকে রাজশক্তির পীড়নে প্রলোভনে ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন, ১৮শ-১৯শ শতকে তেমনি খ্রীষ্টান প্রচারকদের প্রভাবে তাঁদেরই আর একাংশ স্বাগত করেছিলেন খ্রীষ্টধর্মকে।

কিন্তু ভারতে খ্রীষ্টধর্মের প্রবেশ ও পরিব্যাপ্তির সূত্রেই আর একটা কথা এ-কালীন প্রত্ন-ইতিহাসবিদ্‌দের মহলে গুরুত্ব লাভ করেছে। তা হচ্ছে স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট কি কোন দিন ভারতবর্ষে এসেছিলেন? তাঁর জন্মকাল থেকে বার-তের বৎসর পর্যন্ত বয়সের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় বাইবেলী নূতন অনুশাসন বা নিউ টেস্টামেণ্ট অংশের কয়েকখানা পুঁথিতে। তারপর আবার তাঁর কথা পাই আমরা যখন আঠাশ-উনত্রিশ বছরে তিনি লোকত্রাতা খ্রীষ্টরূপে দেখা দিয়েছেন। মাঝের ঐ তের চোদ্দ বছরের কোন হদিশ পাওয়া যায় নি কোনদিন। এখন বলা হচ্ছে, ঐ সময়ে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভ্রাম্যমাণ বণিকদের সঙ্গে। তরুণ জিজ্ঞাসুরূপে দীর্ঘদিন পাটলিপুত্র রাজগৃহ বারাণসী প্রভৃতি স্থানে বসবাস করে তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অনুশীলন করেন। পিতা জোসেফের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে অবশেষে তিনি দেশে ফিরে যান এবং এমন এক নূতন ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন দেশে, যার ফলে সমাজ বিপ্লব আসন্ন হয়ে ওঠে। দেহশ্রমী মজুর কৃষক কারিগর এবং ক্রীতদাসরা তাঁর বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে এসে দাঁড়ান তাঁর পতাকার নীচে। সন্ত্রস্ত হয়ে ভূম্যধিকারী ও পুরোহিত সম্প্রদায় তখন তাঁকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করেন এবং রোমক গভর্ণর পণ্টিয়াস পাইলেট ক্রুশে মৃত্যু বিধান করেন তাঁর। পরবর্তী অধ্যায়ের, বিশেষত ক্রুশাবসানের এই মহিমান্বিত ইতিহাস সকলেই পড়েছেন। কেন না বাইবেলে তার অপরূপ কাব্যভাষ্য স্থান পেয়েছে। কিন্তু মাঝের অধ্যায়টির আদি উৎস কি? বলা হচ্ছে যে লাডাকের হিমিশ মঠে রক্ষিত একখানি পাণ্ডুলিপিতে নাকি যশুয়া নামক কোন ইহুদী যুবকের প্রসঙ্গ আছে, যিনি ভারতের নানাস্থান পর্যটন করে ঘুরতে ঘুরতে শাস্ত্র-সন্ধানীরূপে লাডাকে এসেছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যু হলে মাতাকে সমবেদনাসূচক যে চিঠি লিখেছেন তিনি, এই পুঁথিতে তার নকল আছে এবং তাতেই নাকি জানা যায় যে তাঁর জন্মভূমি জুডিয়ায়, আর জোসেফ ও মেরী যথাক্রমে তাঁর পিতা মাতা। নিকোলাস নটোভিচ নামক রুশ পণ্ডিত নাকি ঐ পাণ্ডুলিপি দেখেই এই তথ্য প্রচার করেছেন গবেষকদের অবগতির জন্যে।

বলা দরকার যে স্পেন্সার লিউইস নামক আর একজন ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ও বলেন যে হিমিশ মঠে সত্যিই মানুষের চামড়ায় তৈরি পার্চমেণ্টে বিখ্যাত ঐ পাণ্ডুলিপি আছে এবং তার বয়স নাকি হাজার দুই বছরের রকম নয়। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ভারত সরকারের পুরাবৃত্ত ও প্রত্নসংরক্ষণ বিভাগ

একান্তভাবে অনুসন্ধান করেও ঐ পাণ্ডুলিপির দেখা পাননি। উক্ত মঠের প্রধান লামা এরকম কোন পুঁথির বিষয় শুনেছেন বলেও স্বীকার করেন নি। অর্থাৎ এ হল একটি প্রত্নতাত্ত্বিক গালগল্প এবং সম্ভবত খ্রীষ্টধর্মের পূজা-পদ্ধতি ও আচরণবিধিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই কোন কৌশলী গবেষক এটি চালু করেছেন। হিন্দু ভক্তিবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের নতি প্রেম ও আত্মসমর্পণের এবং বৌদ্ধ শীলের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্রতার বেশ কিছুটা মিল আছে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, সেবা সদাব্রত, সংযম, উপবাস ইত্যাদির অভ্যাসও তিন ধর্মেই শ্রেষ্ঠ সদাচার বলে স্বীকৃত। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম যেহেতু প্রাচীনতর, তাই তার প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং খ্রীষ্টধর্মের গঠনে তা ইহুদীর জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের মতই প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ কথা মনে করতে তাই অসুবিধা নেই। আর এ জন্যে যীশুখ্রীষ্টের ভারতে আসারও প্রয়োজন ছিল না, কারণ খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী বা তারও আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে রোম মিশর ও আরব প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল এবং ভ্রাম্যমাণ পর্যটক বণিক ও ধর্মপ্রচারকরাও নিয়মিত আনা-গোনা করতেন। এই ভাবেই যে এক দেশের চিন্তা আর এক দেশে যায় এবং তা যে মোটেই নূতন নয়, তা মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। তবে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে ও সাহিত্যে যীশু জীবনের আদি এবং অন্তের মাঝখানে যে একটা মস্ত নীরবতার অধ্যায় আছে, এটা স্বীকার্য।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রাণগত ঐক্য-অনৈক্য নিয়ে তিনের দশকে যখন বিদগ্ধ সমাজে নূতন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়, তখন ইন কোয়েষ্ট অব যীশাস ক্রাইষ্ট নামক বইয়ে যীশুখ্রীষ্টের অস্তিত্বেই সন্দেহ প্রকাশ করেন জনৈক কোয়েকার পণ্ডিত। তিনি বলেন, সেণ্ট পল ও সেণ্ট পিটার যীশু নামক এক কল্পিত চরিত্র খাড়া করে তাঁর দোহাইয়ে প্রথম খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন এবং জুডিয়া থেকে রাজধানী রোমে এসে তাঁদের শিষ্যেরাই ক্যাটাকুম্বে লুকিয়ে থেকে খ্রীষ্টবার্তা দিকে দিকে ছড়াতে থাকেন। নীরো ও ক্যালিগুলা শ্রেণীর স্বৈরাচারী সম্রাটরা তাঁদের প্রভূত নির্যাতন করলেও, কনষ্টাইনের আমলে খ্রীষ্টধর্ম রাজধর্ম রূপে সসম্মানে গৃহীত হল এবং তখনই রোম অধিকৃত এশিয়া ইউরোপে হল তার ব্যাপ্তি। অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় সুসমাচার এই সময়ের মধ্যে লেখা। সব চেয়ে প্রাচীন যে ম্যাথু এবং লূক, তাও খ্রীষ্টের শতাধিক বৎসর পরের রচনা। কাজেই প্রামাণ্য বা প্রত্যক্ষদর্শী প্রদত্ত কোন বিবরণ নেই

খ্রীষ্টের। সমসাময়িক কালের কোন ইতিহাসে বা দলিল দস্তাবেজেও তাঁর উল্লেখ মেলে না। শুধু একজন রোমান ডাক্তারের ডায়েরিতে নাজারেথের যশুয়া নামে জনৈক উন্মাদ রোগীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি মাঝে মাঝে নাকি ফাদার ফাদার করে শূন্যে দুহাত তুলে উঠে দাঁড়াতেন। তিনিই কি যীশু?

২.

যীশুখ্রীষ্টের ঐতিহাসিকতা নিয়ে সন্দেহের কথা আগের অধ্যায়েই বলেছি। উনিশ শতকে ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসবেত্তা ফরাসী পণ্ডিত আর্নেস্ট রেনা তাঁর ভিয়ে দ্য যীজাস নামক বইয়ে এই সন্দেহের অবতারণা করেন। তার পরই প্রত্ন-ইতিহাসবিদ্‌দের সমাজে বিষয়টি নিয়ে বেশ একটা নাড়াচাড়া শুরু হয়ে যায়। এর পর বিশ শতকের মনঃসমীক্ষকরা বাইবেল-বর্ণিত যীশু চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে বলেন, যীশু বলে কেউ থাকুন বা না থাকুন, তাঁকে যে ভাবে সাহিত্যে চিত্রিত করা হয়েছে, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি মৃগী রোগগ্রস্ত ছিলেন এবং ছিলেন ঈডীপাস মনোবিকার সম্পন্ন। নিরক্ষর কৃষক কারিগর ও ক্রীতদাসরা তাঁর ভেলকিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু উচ্চ কোটির কারোকে ভোলাতে পারেন নি তিনি। তাঁদের হাতেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায়ে প্রাণদণ্ড হয়েছিল তাঁর, পরবর্তী কালে যা গির্জাধীশদের কৌশলে মহিমান্বিত ক্রুশিফিকেশন নামে অভিহিত হয়। বলা বাহুল্য সংশয়বাদীদের এই সব সমালোচনা খুবই নিষ্ঠুর এবং তাঁদের বক্তব্যের সত্যাসত্য নিরূপণ সহজ নয়। তবে মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী যীশুকে অবতার পুরুষ বলে মানেন এবং মাত্র কার্ল মার্কস ছাড়া কোন একটি মানুষের এত বেশী সংখ্যক অনুগামী দেখা যায় না। মানুষের পাপ তাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ঈশ্বরের পুত্র ইমানুয়েল যীশু নাম নিয়ে অপাপবিদ্ধ কুমারী মেরীর সন্তানরূপে মর্ত্যে আসেন এবং ক্রুশাবসান স্বাগত করে মানুষকে সত্য ধর্ম শেখান, এ তত্ত্ব সবাই স্বীকার করতে রাজী নন যদিও। অর্থাৎ ভক্তিবাদীদের অতিরঞ্জন যাই এসে থাকুক, যীশু ইতিহাসেরই চরিত্র। রোমশাসিত মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশী শাসকদের পৃষ্ঠপোষিত দেশীয় ধনিক বণিক ও পুরোহিত গোষ্ঠীর শোষণ এবং নিগ্রহ থেকে নীচু সোপানের মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি বুদ্ধের মতই, একথা কবুল করেন তাঁরাও।

সবাই জানেন আশা করি যে সনাতন হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ত্রিরূপে পরিকল্পিত

হয়েছেন। ব্রহ্মারূপে তিনি সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন এবং মহেশ্বররূপে করেন সংহার। খ্রীষ্ট ধর্মেও অনুরূপ ত্রিতত্ত্ব আছে। তাঁরা ঈশ্বরকে দেখেন গড দ্য ফাদার, গড দ্য সন ও গড দ্য হোলী গোষ্ট অর্থাৎ স্রষ্ট', প্রতিপালক এবং অন্তিম অধিশাস্তা রূপে। তাছাড়া ভক্তিবাদী হিন্দুদের যেমন ঈশ্বর সান্নিধ্যে পৌছানোর পন্থা হিসাবে দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ও শান্ত এই পঞ্চ ভাব ব্যবস্থিত হয়েছে, খ্রীষ্ট ধর্মেও তেমনি আছে দাস্য বাৎসল্য এবং সখ্য মিশ্রিত কান্ত বা মধুর এই তিন ভাবের স্বীকৃতি। বৈষ্ণবধর্মে যেমন গোপীভাব বা নারী ভাবে আবিষ্ট হয়ে পরমাত্মাকে কামনা করার কথা বলা হয়েছে এবং বাসকসজ্জা অভিসার বিরহাদি নানা সাত্বিক ভাবকে সাধনার অঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে, প্রায় অনুরূপ জিনিসই দেখা যায় ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যেও। বৈষ্ণবদের অষ্টসখীর মত ওঁদেরও নয় কুমারীর প্রতীক্ষা, যা শাশ্বত বিরহ নামে কীর্তিত হয়েছে, খুব প্রসিদ্ধ। এছাড়া আছে মেরী মাদলিন ও যীশুর যুগলারাধনা, আছে মালা জপ ইত্যাদি, যা বৈষ্ণব ভাব-সাধনার অনুরূপ। লক্ষণীয় যে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান, সূফী ও বৈষ্ণবদের মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখেই অনেকে অনুমান করেন যে আদি রসাশ্রিত এই যুগলারা-ধনার উৎসটা এক। বস্তুত সে বিতর্কে প্রবেশ আমাদের প্রয়োজনের বহির্ভূত। তবে একথা ত সবাই জানেন যে ক্যাথলিকদের পূজায়তনে প্রেমাশ্রিত এই ভক্তিরসের ছড়াছড়ি দেখেই প্রোটেষ্টাণ্টরা উঠেছিলেন ১৫শ ১৬শ শতকে এবং নির্মল একটি খ্রীষ্টতত্ত্ব দাঁড় করান তাঁরাই। তাঁরাই প্রবর্তন করেন তিন প্রতি-শ্রুতি, ভাউ অব পভার্টি, ভাউ অব সেলিবোস, ভাউ অব পিউরিটি, অর্থাৎ দৈন্য বা নতির, ব্রহ্মচর্যের এবং শুচিতার প্রতিশ্রুতি। এই ত্রিবিধ প্রতিশ্রুতিই হল খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি। তাঁরাই সাম্‌স্‌ বা বন্দনা এবং সং অব সংস বা মহা-সংগীতের প্রেমার্তিমূলক পদগুলিকে রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে আবৃতকরেন। তাঁদের উপর আরো এক কাঠি যান ইগনেশিও লায়লার নেতৃত্বে জেস্যুইটরা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও খ্রীষ্টান গির্জা ও মঠগুলি বৌদ্ধ সংঘারামগুলির মতই পাপের আডডা হয়ে ওঠে। বৌদ্ধেরা তবু অবক্ষয়ের অধ্যায়েও জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বচ্ছ প্রবাহটুকু অবরুদ্ধ করেন নি, কিন্তু পাদ্রী ও ক্লেরিকরা দর্শন বিজ্ঞান গণিত ও ইতিহাসের কণ্ঠরোধ করে বাইবেলকেই সর্ববিদ্যার আকর বলে ঘোষণা করেন। তার ফলে অবৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও নৈতিক কর্মাদর্শ অধিকার করে বসে গোটা ইউরোপের লোকচরিত্র। অনেকটা আমাদের

নৈয়ায়িক-ও-তান্ত্রিক-শাসিত মধ্যযুগীয় সমাজের মতই কর্দমাকীর্ণ হয় তাঁদের সমাজ। তা থেকে মুক্তি আসে গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতির পুনর্জাগৃতিতে। তারই নাম রেনেসাঁস। তখন থেকেই ধর্ম-বিমুক্ত সমাজবোধ ও শিক্ষাধারার যাত্রা শুরু। তবে এই সময় থেকেই খ্রীষ্টধর্ম হয়ে ওঠে সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার। একদিকে জেরুজালেমে যীশুর কবর রক্ষার নামে খ্রীষ্টানরা যেমন মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত মুসলীম সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, ইতিহাসে যা ক্রুজেড নামে প্রসিদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি জাহাজ ভাসিয়ে এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার ঘাটে ঘাটে সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশ বানানর তৎপরতা চালাতে থাকেন, আগে পাদ্রী ও পিছনে আগ্নেয়াস্ত্রধারী সিপাহী নিয়ে। তারপরের ইতিহাস ত সবারই জানা। খ্রীষ্টধর্ম বন্দী হয়ে থাকে পুঁথির পাতায় এবং খ্রীষ্টানরা দুনিয়া ভোর মাতেন সুশিক্ষিত দস্যুবৃত্তিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্তে আজ এশিয়া আফ্রিকা থেকে খ্রীষ্টানরা সাম্রাজ্যের কারবার গোটাতে বাধ্য হয়েছেন। এদিকে সাম্যবাদের উদ্ভব খ্রীষ্টধর্ম তথা সমস্ত ধর্মেরই সামনে দেখা দিয়েছে প্রকাণ্ড একটি চ্যালেঞ্জ বা সমরাহ্বানরূপে। কাজেই আগামী কয়েক দশকে হয়ত বেদ উপনিষদ তন্ত্র আভেস্তা তালমুদ বাইবেল থাকবে পুরাসাহিত্য রূপে এবং সন্ধিৎসু লেখক এবং গবেষকরা তা পড়বেন, এইসব ধর্মের আদি ইতিবৃত্ত জানার প্রয়োজনে। জীবন্ত ধর্মের সঙ্গে সংশ্রব ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের।

সব শেষে বক্তব্য যে বেদ উপনিষদের মত বাইবেলও সাহিত্য হিসাবে উপাদেয়। আগেই বলেছি বাইবেল একখানি বই নয়, তা একগুচ্ছ বইয়ের সমাহার। তার প্রথম পর্যায় ওল্ড টেষ্টামেণ্ট বা পুরাতন অনুশাসনে সৃষ্টিবৃত্ত নীতিকথা কাহিনী আচরণবিধি বিচিত্র উপকরণ পরিবেশিত হয়েছে, বিভিন্ন ছোট বড় পুস্তিকায়। তার কিছু অংশ সত্যিই উচ্চ সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। নব অনুশাসন মূলত ম্যাথু মার্ক লুক জন প্রমুখ খ্রীষ্টীয় সাধুদের সুসমাচার সংগ্রহ। এছাড়া তাতে সংকলিত হয়েছে খ্রীষ্টশিষ্য পিটার ও পলের পত্রাবলী, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এরা বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন হাতের রচনা। একত্র সংকলিত হয়েছে শুধু ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের আদি ইতিহাস অভিন্ন বলে। সম্ভবত আগেই বলেছি যে জার্মান ভাষায় লুথার ও ইংরেজীতে ওয়াইক্লিফ, তাঁর পর টিনডাল প্রথম বাইবেল অনুবাদ করেন, রেনেসাঁসের পরবর্তীকালে ছাপাখানার জন্ম হলে। তার আগে পর্যন্ত বাই-

বেলের হস্তলিখিত পুঁথি ছিল পাদ্রী সমাজের কুক্ষিগত। অবশ্য এখন আমরা যেইংরেজী বাইবেল পড়ি, তা হল রাজা জেমসের অনুমোদিত ভাষ্য ; অর্থাৎ আরো পরের লেখা।

**॥ ভারতে ইসলামের আবির্ভাব ॥**

ডক্টর এম. এস. হিলালী রচিত ইসলাম অ্যাজ ইউনিভার্সাল ফেথ এবং ইসলাম কামস টু ইণ্ডিয়া, অর্থাৎ সার্বভৌম ধর্মরূপে ইসলাম এবং ভারতে ইসলামের আবির্ভাব নামক দুইখানি বই হয়ত অনেকেই পড়েছেন। হিলালী দর্শন ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত। দীর্ঘদিন তিনি ইরাণ মিশর ও আরব মুল্লুকে বসবাস এবং শিক্ষালাভ করেছেন। ঐস্লামিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনায় তাঁর মতামত তাই প্রামাণ্য বলে গ্রাহ্য। তাছাড়া তিনি হিন্দু গ্রীক চৈনিক ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রাদির প্রতিপাদ্যের সঙ্গে ইসলামের মূলতত্ত্বগুলির তুলনাত্মক আলোচনা করেছেন, সেজন্য তাঁকে ধর্মীয় গোঁড়ামি-মুক্ত বিচারক বলেও গণ্য করা হয়। বই দুটি তাই সকলের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রথম বইটিতে তিনি দেখিয়েছেন ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায়ান্ধকার দিনে আরবের এক মরুপ্রান্তে উদ্ভূত হয়ে ইসলাম কি করে নিজ শক্তিতে একদিকে বার্বারী ও স্পেন পর্যন্ত, অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, একথা তাঁর মতে বিদ্বেষপ্রসূত। তিনি বলেন, ইসলামের অন্তর্নিহিত মৈত্রী ও গণতন্ত্রের আদর্শই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিস্তীর্ণ ভূমিভাগে তাকে ব্যাপ্ত হতে সাহায্য করেছে। তাঁর মতে বেশীর ভাগ মুল্লুকেই সে সময়ে লিঙ্গপূজা এবং জড়বাদী নিসর্গ উপাসনা চালিত ছিল। মানুষ পরমাত্মা বা শুদ্ধ ধর্মের সন্ধান পান নি। তাছাড়া ছিল হুজুর-মজুরে সমাজ জীবনে দুরপনেয় দূরত্ব।

ইসলাম এ দুইয়ের অবসান ঘটিয়েছে এবং একদিকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ব্যক্ত করেছে, অন্যদিকে প্রবর্তন করেছে সাম্যাশ্রিত সামাজিক আদর্শ। তার ফলে মানুষ ইচ্ছা করেই ইসলামকে স্বাগত জানিয়েছে মুক্তির সোপান জ্ঞানে। যুদ্ধ বিগ্রহ যা হয়েছে তা হয়েছে মূর্তিপূজক অজ্ঞ কাফেরদের ও সাম্রাজ্যবাদী খ্রীষ্টানদের সঙ্গে। দ্বিতীয় বইয়ে তিনি বিবৃত করেছেন ভারতে ইসলামের অভ্যুদয় কাহিনী। এখানেও তাঁর সিদ্ধান্ত একই। তাঁর বিচারে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থাপনায় উচ্চবর্ণের একাধিকার ছিল, তাঁরা নিজেদের ধর্মায়তনে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূদ্রদের ঢুকতে দিতেন না। নীচুতলার মানুষদের কোন

সামাজিক বা রাজনীতিক অধিকার ছিল না। তাই তাঁরা সাম্যাশ্রিত ইসলামকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁরা বিবস্ত্র নারীমূর্তি ও প্রস্তরনির্মিত পুংজননেন্দ্রিয়ের কদর্য পূজায় ক্লিষ্ট হয়েও ইসলামকে আলিঙ্গন করে ছিলেন, জীবন ও জ্যোতিঃস্বরূপ অনির্বচনীয় ঈশ্বরকে পাবার উপায় রূপে। এখানেও যুদ্ধ বিগ্রহ যা হয়েছে, তা হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যকামী বা ধর্মদ্রোহী নাস্তিক ও উপজাতিদের সঙ্গে।

দুখানি বইয়েই ডক্টর হিলালীর প্রতিপাদ্য মোটামুটি এক। তাঁর মতে ইসলামই মানুষকে দিয়েছে ধর্মের ক্ষেত্রে অদ্বৈত ঈশ্বরের তত্ত্ব, সমাজের ক্ষেত্রে মানবিক সাম্য এবং এ দুইয়ের প্রভাবেই পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পৌত্তলিক সনাতনীরা ও সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণকামীরা শত্রুতাবশে এ ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করে দেখিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য যে একহাতে কোরান অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে ইসলাম প্রচার করেছিলেন, ওসমান ওমর ও আলি প্রমুখ খলিফারা। কিন্তু ডক্টর হিলালীর মতে ইসলামই মানুষের মন থেকে আদিকালের জড়তা ও অন্ধ প্রত্যয় হঠিয়ে সেখানে নবযুগের যুক্তিবাদ এবং জীবনদর্শন প্রবর্তন করেছে। গণিত আলকেমি চিকিৎসাশাস্ত্র এসবই তাঁর মতে মূলত ইসলামের দান। শুধু এই নয়, তার দান স্থাপত্য ভাস্কর্য ও কারু-কর্মের নূতন শৈলী, তথা সংসদীয় শাসনের উন্নততর রূপও। আগেই বলেছি অধ্যাপক হিলালীর পাণ্ডিত্য ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি আমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়েই আমি তাঁর সিদ্ধান্তগুলি একটু যাচিয়ে দেখতে চাইছি।

প্রথম কথা, ঐস্লামিক কেন কোন সাম্রাজ্য-বিস্তারই তরবারির সাহায্য ভিন্ন হয়নি। তাই ইসলামের ক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম হয়েছে, প্রমাণ করতে যাওয়ার অর্থ হয় না। পশ্চিম এশিয়ায় রোমক সাম্রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য, পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত মঙ্গোল সাম্রাজ্য, কোনটাই নিরস্ত্র অনুপ্রবেশের ফলে হয়নি। মুসলীম সম্প্রসারণও হয়েছে ঐ একই ধারায় এবং মুসলমান ইতিহাসকাররা সেকথা জাতীয় গৌরবের কাহিনী রূপে লিপিবদ্ধও করেছেন। তাছাড়া ঐস্লামিক বিশ্বভাবনা ত এর পরিপন্থী নয়। গোটা জগৎকে তা দার-উল-ইসলাম ও এবং দার-উল-হারাব এই দুই ভাগে ভাগ করে। দার-উল-হারাবকে স্বধর্মে আনার জন্যে ধর্মশাস্ত্র নির্দেশ দিয়েছে

জেহাদের এবং বলেছে তাতে মৃত্যু হলে মৃতজন হবেন শহীদ, জয়ী হলে বিজেতা হবেন গাজী। বলেছে বিধর্মীদের হয় ধর্মান্তরিত করবে, নয় কোতলে আম বা সমূলে নিপাত করবে, আর অসম্ভব হলে তাদের জিম্মি করে রাখবে ও মুণ্ডশুল্ক নেবে। এই শুল্কের নাম জিজিয়া। অগ্নি-উপাসক ইরাণী, পৌত্তলিক মিশরী ও আরবী, বাইজেন্তীয় গ্রীক ও মাতৃদেবতা ও পিতৃদেবতাপূজক হিন্দুদের মুল্লুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এর প্রমাণ এত স্পষ্ট ও প্রচুর যে তা মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু আদৌ তা মোছার প্রয়োজন আছে কি? প্রাচীন কালের দিগ্বিজয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার ত এই ভাবেই হত। তার কোন দেশ-কাল ও ধর্মগত পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রাচীন বলছি কেন! মধ্য যুগে ও আধুনিক যুগেও ত এই সুবিদিত ধারার ব্যতিক্রম হয়নি আগ্রাসী রাজনীতির ক্ষেত্রে।

ডক্টর হিলালীর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ইসলামের আগে পৃথিবীর সর্বত্র অপধর্মের দৌরাত্ম্য ছিল, একই রকম অপ্রামাণ্য। খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব, তাঁর পাঁচশো বছর পরে খ্রীষ্টের এবং খ্রীষ্টের ছশো বছর পরে মহম্মদের। এঁরা পরপর এশিয়ায় তিনটি বৃহৎ ধর্ম প্রবর্তন করেন। এর মধ্যে আদি বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরাবদী হলেও তার ভিত্তিতে ছিল অহিংসা মৈত্রী বিবেক বৈরাগ্য ও চিত্তশুচি। খ্রীষ্টধর্ম ঐশ্বরিক ত্রিতত্ত্বে বিশ্বাসী এবং তা প্রচার করেছে প্রেম ও মানব হিতৈষণার আদর্শ। সুতরাং অনাচার কদাচার কবলিত ধর্ম বলা যাবে না তাদের। আর ভারতের হিন্দু ধর্ম, চীনের কংফুৎসীয় ও তাও ধর্ম, জাপানের শিন্তো ধর্ম বা ইজরাইলের ইহুদী ধর্মকেও কোন বিবেকবান মানুষই অপধর্ম বলে অভিহিত করবেন না নিশ্চয়। এর মধ্যে কংফুৎসীয় ধর্ম অনেকটা আদি বৌদ্ধ ধর্মের মতই আচার-ভিত্তিক, আর তাও ধর্ম হল অদ্বৈত বেদান্তেরই চৈনিক প্রতিরূপ। শিন্তোধর্ম হল পিতৃগণের উপাসনা, আর ইহুদী ধর্ম হল জিহোভা বা পরব্রহ্মের আরাধনামূলক ধর্ম। হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা এখানে করব না, কারণ তা আগেই করা হয়েছে।

লিঙ্গ পূজা ও নিরাবৃত দেহ নারীমূর্তি পূজা বলতে হিলালী সম্ভবত শৈব ও শক্তি ধর্মকেই বুঝিয়েছেন এবং এই ধর্মকে আদি ফ্যালিক ওয়ারশিপ বা জননেন্দ্রিয় পূজার পর্যায়ভুক্ত করতে চেয়েছেন। বস্তুত জীব-জীবনের উৎসরূপে যৌনাঙ্গের পূজা শুধু ভারতীয় হিন্দুদেরই নয়, গ্রীকদের, মিশরীদের, চীনাদের এবং প্রাক্-মহম্মদ আরবী কোরেশদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। আবার আদিম রেড ইণ্ডিয়ান, মধ্য-দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা ও আজটেক এবং

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদিম গোষ্ঠীদের মধ্যেও ছিল। সুতরাং জিনিস-টাকে বিনা পরীক্ষায় বাতিল করা ঠিক নয়। অর্থাৎ এখানে ডক্টর হিলালীর বিচারে একটু ধৈর্য প্রয়োজন ছিল। অনুরূপ ধৈর্যই প্রত্যাশিত ছিল খ্রীষ্টান ধর্ম বনাম ইসলামের আলোচনাতেও। একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে অগ্রসর-মান ঐস্লামিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী খ্রীষ্টানদের যুদ্ধ হয়েছিল রাজনীতিক স্বার্থ নিয়েই। জেরুজালেমে যীশুর কবর রক্ষা একটা অজুহাত মাত্র, তবু ক্রুজেডের সমর্থক না হয়েও বলব যে খ্রীষ্টান ধর্মে ও সভ্যতায় ভাল জিনিস কিছুই নেই, একথা যুক্তিসহ নয়। গ্রীকো-রোমক সভ্যতার উত্তাপ অবসিত হলে, খ্রীষ্টানরাই যে ইউরোপকে জড়বাদ মুক্ত নূতন জীবন দর্শন দিয়েছিলেন এবং জ্ঞানে কর্মে শিল্পে সংস্কৃতিতে প্রতীচ্যে নূতন এক সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন, একথা ভুললে চলে কি ?

২.

ডক্টর হিলালীর মতে ইসলাম যেহেতু পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম, সেই হেতু পূর্ববর্তী ধর্মগুলির ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা ইসলামে এসে স্বাভাবিক ভাবেই সংশোধিত হয়েছে এবং ঈশ্বর-প্রত্যয়ে, জীবন-চর্যায়, প্রাত্যহিক আচরণ-বিধিতে, সর্বক্ষেত্রে ইসলামের পথই হতে পেরেছে সর্বাধিক বিজ্ঞান-বিশুদ্ধ ও মৌলিক। এখানে তার সঙ্গে অন্য কোন ধর্মের তুলনা হয় না। ডক্টর হিলালীর এই সিদ্ধান্তটিও বাজিয়ে দেখলে খাঁটি মনে হয় না. অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, পৃথিবীর মুখ্য ধর্মগুলি সবই প্রাচ্য ভূমিতে জন্মেছিল। তার মধ্যে জরথুষ্ট্রীয় ইহুদী খ্রীষ্টান ও ইসলাম, এই চারটি ধর্মের উৎপত্তিস্থল শুধু মধ্যপ্রাচ্যই নয়, এরা নানা ভাবে পরস্পর সংযুক্তও। জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি, জন্ম মৃত্যুর হেতু এবং ঈশ্বর শয়তান দেবদূত স্বর্গ নরক ও রোজ কেয়ামত-সংক্রান্ত প্রত্যয়ের ব্যাপারে যেমন, সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উচিতানুচিতের ব্যাপারেও তেমনি এদের মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশেষ করে ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে ত ইসলামের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ এবং তার কারণ এ তিনেরই বৈজিক উৎস এক।

ইহুদীদের আদিপুরুষ আব্রাহামের দুই পত্নী ছিলেন সারিয়া ও হাজেরা। সারিয়ার পুত্র আইজাকের বংশে জন্মান আবদুল্লা। এই আবদুল্লা ও আমিনার পুত্রই নবী মহম্মদ। স্বভাবতই তিন ধর্মের মধ্যে অচ্ছেদ্য একটি প্রাণগত ঐক্য বিদ্যমান। এছাড়া লক্ষণীয় যে ইহুদী ও ইসলাম উভয় ধর্মই

রিভীলড্‌ রিলিজীয়ন বা স্বয়ং-প্রকাশ ধর্ম বলে গৃহীত। জিহোভা যেমন সিনাই পর্বতে মোজেসের সামনে প্রকট হয়ে তাঁকে দশবিধ অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন; আল্লাতালার দূত তেমনি হিরা পর্বতে হজরত মোহম্মদের সামনে কয়েকবার আবির্ভূত হয়ে তাঁকে দিয়েছিলেন ধর্ম-কর্ম আচার-সংস্কার ও পূজা-উপাসনা সংক্রান্ত অজস্র নির্দেশ। এই নির্দেশগুলি ১১৪টি সুরা বা অধ্যায়ে গাঁথা হয়েছে কোরানে। তাতে ঈশ্বর ও রুহ বা আত্মার স্বরূপ, জীবনের লক্ষ্য ও উপাসনার পদ্ধতি, দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতার উপায় ইত্যাদি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র সমাজ ও লোকজীবনের বিধি বিধান পর্যন্ত যাবতীয় প্রসঙ্গেরই আলোচনা সংকলিত হয়েছে। তার কিছু গদ্যে, কিছু পদ্যে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে জেকবের বংশ ইতিহাসে ইজরাইলী এবং ইসমাইলের অবতংসরা ইসমাইলী নামে পরিচিত। এই ইসমাইলীরা আদিতে মূর্তিপূজক ও বহুদেববাদী ছিলেন। দেবরাজ আল্লা ও তাঁর তিন কন্যা, আলাৎ উজ্জা ও মানার উদ্দেশে মক্কায় তাঁরা একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁদের পূজা-পদ্ধতি ছিল খুবই আদিম ভাবাপন্ন, অনেকটা আমাদের তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতির অনুরূপ। পরমেশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভের পর হজরত মহম্মদ এই ধর্মবিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর জয়ী হয়ে অবশেষে তিনি মক্কা অধিকার করেন এবং মক্কার ঐ মন্দিরকেই কাবা বা ভজনালয়ে পরিণত করে সেখানে নূতন করে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরের পূজা প্রবর্তন করেন। আল্লা নামটিই অবশ্যই রক্ষা করেন মহম্মদ, যদিও অরূপ অনির্বচনীয় ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমে আল্লাই একমাত্র আরাধ্য হন গোটা আরবের। একে একে শিষ্য ও অনুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে মহম্মদের এবং তাঁরই প্রত্যাদেশলব্ধ বিবিধ অনুশাসনের ভিত্তিতে ক্রমশ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে পরিচিত হন মুসলীম অভিধায়।

মহম্মদের মহাপ্রয়াণের পর আবুবক্কর ওসমান উমর ও আলি প্রমুখ অনুগামীরা পরের পর ঐস্লামিক সাম্রাজ্যের অধিনায়ক বা খলিফা হন। আলির জীবনান্ত হলে, তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসেন এবং মোবিয়ার পুত্র এজিদের মধ্যে এই খিলাফতির দাবী নিয়ে বাধে ভয়াবহ যুদ্ধ। সেই যুদ্ধই হল কারবালার লড়াই এবং তার স্মারক অনুষ্ঠান হল ঐস্লামিক দুনিয়ার মহররম। এই যুদ্ধে নবীর দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হুসেন পরাজিত এবং নিহত হলে, এজিদের বংশ খিলাফতিতে মোতায়েন হন। অনেকদিন পরে অবশ্য আবার নবী বংশের

পুনরাবির্ভাব হয়।

কিন্তু লক্ষণীয় যে এই দীর্ঘ ভাঙাগড়ার মধ্যেও ঐস্লামিক সাম্রাজ্যের প্রভাব গোটা মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তার লাভ করে এবং সেখানে থেকে একদিকে উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপে, অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া ও ভারতে ব্যাপ্ত হয়। এর কারণ ইসলামের সাম্রাজ্যিক সংহতি ও সাংস্কৃতিক সজীবতা, যার মূলসূত্র কোরান ও হাদিসে অনুলিখিত হয়েছে। বৌদ্ধদের পঞ্চশীলের মত ধার্মিক মুসলীমদের জন্যে কোরানে যে চতুর্বর্গ কর্মবিধি বর্ণিত হয়েছে, তা হল হজ ওজু রোজা ও জাকাত বা তীর্থ দর্শন, স্নান ও দৈহিক পবিত্রতা, উপবাস ও দান। এই সঙ্গেই কোরানে বলা হয়েছে আল্লা একমাত্র সত্য, মহম্মদ তাঁর সর্বশেষ পয়গম্বর এবং ধর্মপরায়ণ মানুষের পক্ষে তাঁর আদেশ সর্বথা অলঙ্ঘ্য। বিরুদ্ধ পথ নেন যাঁরা ধর্মদ্রোহী।

৩.

কোরানের কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে দুচার কথা বলছি হাদিস সম্বন্ধে, যা মুসলীম জগতে সমভাবেই সম্মানিত। প্রভু মহম্মদ তাঁর শিষ্য অনুগামী ও সেবকদের জন্যে কোরানের আয়াৎগুলির যে ব্যাখ্যা প্রচার করেছেন এবং তাঁদের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের জন্যে যে উপদেশাবলী বিতরণ করেছেন, তা গ্রথিত হয়েছে হাদিসে। অর্থাৎ বেদের যেমন সূত্রগ্রন্থ, বাইবেল পুরাতন অনুশাসনের যেমন তালমুদ, কোরানের তেমনি হাদিশ হল পরিপূরক গ্রন্থ। বলা প্রয়োজন যে কোরান গ্রন্থ শুধু শাস্ত্র নয়, তা মুসলীম জগতের স্মৃতিশাস্ত্র এবং বিগত চোদ্দশো বছর ধরে তা পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ মানুষের জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কোরান ও হাদিসের বক্তব্যে কোথাও কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতা নেই। ব্যক্তিজীবনের পবিত্রতা ও সমুন্নতির এবং গোষ্ঠীজীবনের সংহতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এই আদেশ-উপদেশগুলি প্রণীত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের দার্শনিক পণ্ডিতরা এই সরলতার ধারাটি রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বস্তুবাদী, কোরানের ব্যাখ্যায় তাঁরা ধর্ম ও ঈশ্বরের চেয়ে জগৎ ও জীবনের উপর বেশী গুরুত্ব দিলেন। জড় ও চেতন দুইকেই তাঁরা ভৌতিক কার্য-কারণের সূত্রে আবদ্ধ করে দেখলেন। যাঁরা ভাববাদী, তাঁরা বস্তুসত্তা ও বিশ্বচেতনাকে একই ঐশী শক্তির প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করলেন।

বলা প্রয়োজন যে আলবেরুনি, ইবন খলিদুন, আভিসেন্না, আবু হানিফ

প্রমুখ আরবী দার্শনিকরা কেউ এম্পিডোক্লেস, কেউ আরিষ্টটলের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অনিবার্যভাবেই তাই তাঁদের হাত দিয়ে ইসলামের তত্ত্বব্যাখ্যা পরস্পরবিরোধী দুই ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। একটা ঈষৎ নাস্তিক্যের ধারা। তারপর দেখা দেন সুফীরা। তাঁদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানবাদী, তাঁরা বৈদান্তিক সোহংবাদের মত বিশিষ্ট একটি মতের অনুবর্তী। 'আনাল হক' বা আমিই পরম সত্য বা পরমাত্মা বলেছেন আল মনসুর। পরবর্তী কালে দার্শনিক গজ্‌জালি, আল হাল্লাজ, ধুল নন, সবাই এক হিসাবে ঐস্লামিক ব্রহ্মবাদের প্রবক্তা। আর যাঁরা প্রেমভক্তিবাদী, তাঁরা বৈষ্ণব ভক্তিসাধকদের মতই অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতকে দেখেছেন। এই দলের প্রসিদ্ধ কবি জালালুদ্দীন রুমী, জামী, হাফিজ ও সবিস্তারি বিদ্বজ্জনের সমাজে অপরিচিত নন। কিন্তু লক্ষণীয় যে বিশুদ্ধ ইসলামের সার্থকরা সুফীদের অনুরাগী নন, তাঁরা এঁদের হেরেটিক বা ধর্মদ্রোহী রূপেই গণ্য করেছেন। ডক্টর হিলালীও তাই করেছেন, যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে বহুক্ষেত্রে একমত হওয়া কঠিন। কারণ সুফী মনস্বীদের দান ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডারে অল্প নয়।

সবশেষে ভারতের ইতিহাসে ছশো বৎসরব্যাপী মুসলীম শাসন ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলেই এ প্রসঙ্গের উপর উপসংহার টানব। সবাই জানেন খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকে প্রথম ভারতবর্ষে মুসলীম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮শ শতক পর্যন্ত তার ধারা অব্যাহত থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে খিলিজী তুঘলক লোদী প্রভৃতি বংশ কোন স্থায়ী প্রশাসনের কাঠামো তৈরি করতে পারেন নি। তা পেরেছেন মুঘলরা এবং বাবর থেকে আউরঙজেব পর্যন্ত ছয় প্রজন্ম একাদিক্রমে তাঁরা ভারত শাসন করেছেন। ভারতকে এক কেন্দ্রীয় শাসনে সংহত করা, উন্নত স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত ও কলা-কৃষ্টিতে সমৃদ্ধ করা, এক ভূমি-ব্যবস্থা, রাজস্ব-ব্যবস্থা ও মুদ্রা-নীতির অধীনে আনা ইত্যাদি বহু গঠনাত্মক কাজ তাঁরাই প্রথম করেছেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতাতেও কার্পণ্য করেন নি তাঁরা। কিন্তু প্রতিমা-পূজক এবং গুরুবাদী, অবতারবাদী, অদৃষ্ট ও পুনর্জন্মবাদী হিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের ধর্মীয় সমঝোতা হয়েছিল কি? বলা বাহুল্য তা হয়নি।

নিম্ন সোপানের হিন্দুরা ইসলামে দীক্ষা নিয়ে রাজশক্তির পোষকতা খুঁজেছেন। নৈষ্ঠিকরা তফাতে থেকেছেন, নিজ নিজ প্রত্যয় ও আচার সংস্কারের অনড় গণ্ডী রচনা করে। উদার দৃষ্টি হিন্দু-মুসলমানরা অবশ্য সমন্বয়ের

প্রয়াসও করেছেন। অনামী কোন হিন্দু পণ্ডিত লিখেছেন, আল্লোপনিষদ এবং তাতে আল্লা ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করেছেন। শাজাহান পুত্র দারা লিখেছেন মজমে-উল-বাহেরিন বা দুই সমুদ্রের মিলন এবং তাতে উপনিষদ ও কোরানের তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। সন্ত সাধুরা, চৈতন্য নানক কবীর দাদু রজ্জবালি প্রমুখ সন্তরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে এক ধর্মীয় ঐক্যে বাঁধতে চেয়েছেন। চেয়েছেন চিশ্তি সম্প্রদায়ের গুরুরাও। তবু সমন্বয় হয়নি।

সম্ভবত হিন্দু সমাজে লোকসংখ্যার আধিক্য তার প্রধান একটা কারণ। কিন্তু দুঃখের কথা যে হিন্দু বা মুসলীম দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেই চিরদিন সমস্যাটির বিচার করা হয়েছে। তাই ব্যাখ্যাটা বরাবরই একপেশে হয়েছে। রাজা ও রাজন্যগোষ্ঠীতে এবং প্রজাসাধারণ্যে সম্প্রীতি অতীতে কোন দিন কোথাও ছিল না। বিশুদ্ধ খ্রীষ্টান ও মুসলীম মুল্লুকেও প্রজানিগ্রহ কি কম হয়েছে? বৌদ্ধদের হিন্দুরা উৎসাদন করেন নি ঝাড়ে বংশে? দেশে দেশে যুগে যুগে তাহলে এত বিদ্রোহ, এত বিপ্লব হয়েছে কেন? প্রকৃত পক্ষে এ হল অস্তিবান ও নাস্তিবানের যুদ্ধ, যা চিরকাল করেছেন শোষিতেরা শোষণের প্রতিভূ রাজা-রাজন্য ও বণিকচক্রের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া মধ্যযুগে সারা ভারতেই ছিল সামন্ততান্ত্রিক স্বাধিকার লাভের জন্যে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধাচরণ, যাঁর পরিচয় পাই আমরা শিখ, রাজপুত ও মারাঠা জাতির অভ্যুদয়ে এবং যার ফলে এককেন্দ্রিক মুসলীম শাসনই ভেঙে পড়ে আউরঙজেবের সময়।

**। শংকর: আস্তিক্য বনাম নাস্তিক্য দর্শন।**

অল ইণ্ডিয়া ইন্টিগ্রেশন বা সর্বভারতীয় সমন্বয় কথাটা ইদানীন্তন কালে যে রকম গুরুত্ব অর্জন করেছে, অতীতে কোনদিন তা ছিল না। একটা অস্বচ্ছ সর্বভারতীয়তামূলক ধারণা হয়ত ছিল জনমনে। সেই জন্যেই সারা ভারতে ব্যাপ্ত নদী ও তীর্থসমূহের নাম শ্লোকনিবদ্ধ করা হয়েছিল। ভারত বা ভারতবর্ষ নামটিও প্রচলিত হয়েছিল সুপ্রাচীন কালেই। তবু যে অর্থে চীন জাপান আরব ফ্রান্স বা জার্মানি এক একটা দেশ, আর সেখানকার মানুষেরা একটা জাতি, ভারতবর্ষ সে অর্থে একটা দেশও ছিল না, আমরা ভারতবাসীরাও একটি জাতি ছিলাম না। ছোটবড় অসংখ্য জনপদের নানা ভাষা-ভূষা ও আচার-সংস্কারে অভ্যস্ত অসংখ্য জাতিগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষ, যার একাংশের সঙ্গে অপরের ঐক্য ছিল না এবং তা ছিল না বলেই, একদিকে

যেমন পরস্পরের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি গ্রীক, হুন, তুর্কী, মুঘল, ইংরেজ, ফরাসী, নানাজাতি বরাবর হানা দিয়েছে ভারতবর্ষে। শুধু হানা দেওয়া নয়, দখলও করেছে তারা ভারতের কোন না কোন অঞ্চল। বিভিন্ন সময়ে অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, আকবর অনেকেই চেষ্টা করেছেন বিচ্ছিন্ন ভারতভূমিকে এক করতে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি।

এই একীকরণ সম্ভব হয় ইংরেজ শাসনের আমলে এবং ইংরেজী ভাষা হয় সেই একাত্মতার প্রধান বন্ধনরজ্জু। আর এই ইংরেজী আশ্রয় করেই আমাদের রাজনীতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় স্বাধীনতার একটি ভাবমুর্তি গড়ে তোলে। কিন্তু এ অনেক পরের কথা। হিন্দু শাসনের অবসান ও মুসলীম শাসন আরম্ভের প্রাক্কালে সারা ভারতকে একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক একাত্মতা দিতে চেষ্টা করেছিলেন যিনি, তিনি শংকরাচার্য। ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করে এবং দশটি সাধু সম্প্রদায় সৃষ্টি করে, এই দুইয়ের নিয়ন্ত্রণে তিনি হিন্দু সমাজকে বাঁধতে চেষ্টা করেন একটি অনড় নিয়ম শৃঙ্খলায়। শোষিত হিন্দু শ্রেণীকে বহুদেববাদ-বিমুক্ত করে বিশুদ্ধ অদ্বৈত তত্ত্ব উপঢৌকন দেন তিনি। বৌদ্ধ নাস্তিকতা ও শূন্যবাদ একদিকে, অন্যদিকে কুৎসিত তন্ত্রাচার যখন হিন্দু জাতির মনোলোকে নৈরাজ্যের আবহাওয়া ডেকে এনেছিল, শংকরই তখন তাকে উজ্জ্বল আশাদীপ্ত একটি নবজীবনের আলো দেখান। আরো হাজার বছর আগে জন্মালে ভারতবর্ষকে তিনি অবশ্যই অন্ধ ভক্তিবাদের ও অধিকতর অন্ধ নাস্তিকতাবাদের স্পর্শে কলুষিত হতে দিতেন না।

উপরের বক্তব্যটি [শংকরাচার্য সম্পর্কীয়] আমার নয়। এটি এস. সুব্রহ্মণ্যম রচিত শংকরাচারিয়া দ্য নেশন বিলডার নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত। অনুরূপ একটি মন্তব্য অধ্যাপক হিরিয়ানার হিন্দু লাইফ ফিলজফি বইয়ে লক্ষ্য করেছি। তাঁরা দুজনেই শংকরাচার্যকে বস্তুবাদ-প্রভাবিত বিবিধ নাস্তিক্য দর্শনের সংহারক ও একাত্মিক হিন্দু জীবনবোধের সংগঠক রূপে যত বড় সম্মান দিয়েছেন, ঠিক তত বড় সম্মানই দিয়েছেন অদ্বৈত বেদান্তের ব্যাখ্যাতা মহান পণ্ডিত রূপে। এই দুটি সিদ্ধান্তই খণ্ডনীয় বলে মনে করি। শংকরের পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্বন্ধে কারোরই মনে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কি তাঁর পাণ্ডিত্যের শেষ কথা? ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর এই জগৎ ও তার যাবতীয় দৃশ্যমান পদার্থ সবই অবিদ্যাজনিত মায়ার প্রক্ষেপ, এরা

অলীক মরীচিকা মাত্র—এই জ্ঞান কি একটি শূন্যাশ্রয়ী অপবুদ্ধির প্রকাশ ছাড়া আর কিছু বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য? কতকগুলি ধোঁয়াটে কথার আবর্ত রচনা করে কূট তর্কের সাহায্যে তাদের প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে এবং সাধারণ মানুষের মনে তা দিয়ে বুদ্ধি-বিভ্রান্তিও ঘটান সম্ভব।

কিন্তু মুক্তদৃষ্টি যুক্তিমান মানুষ পদে পদে যে জগৎ ও জীবনকে অনুভব করেন, তাকে মিথ্যা এবং যা বাক্যমনের অগোচর সেই কল্পনা-নির্ভর ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করতে যাবেন কোন গরজে? স্বীকার করি সীমিত ইন্দ্রিয়বোধের দরুণ, অথবা পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ, এই ত্রিস্তরে আবদ্ধ বিচারশক্তির অপূর্ণতা বা ভ্রান্তি হেতু দৃশ্যমান জগতের এবং জীবনের সার্বিক জ্ঞান হয়ত হয় না মানুষের। আর তা হয় না বলেই বস্তুর স্বরূপ নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদও হয়, তবু পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন বা মস্তিষ্ক ছাড়া আর ত কোন মাধ্যম নেই, কাজেই ঐ সীমাবদ্ধতাটুকু মেনেই নিতে হবে। কিন্তু তাই বলে জগৎ বস্তুটাই ভূয়ো বললে তা মানুষের প্রকৃতিস্থতা-বিরোধী উক্তি হয় না কি? তা ছাড়া জগৎ ও জীবনের মত প্রত্যক্ষ জিনিসকে যাঁরা মানেন তাঁরা নাস্তিক, আর ব্রহ্মের মত একটা বায়ুভূত ধারণাকে যাঁরা সত্য বলে চালান, তাঁরা আস্তিক, একি ভাষাবোধের তথা শব্দার্থ গ্রহণের ব্যর্থতার হাস্যকর নিদর্শন নয়? অর্থাৎ চলতি অভিধা দুটি পালটানর প্রয়োজন আছে।

বস্তুত অভিধাঘটিত দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই থাক। বস্তুবাদী দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্যগুলি বিজ্ঞানের আলোয় যাচিয়ে দেখলে, তার মধ্যে অগ্রহণীয় কিছু আছে বলে মনে হয় কিনা, একটু নেড়ে চেড়ে দেখা যাক। চার্বাকীরা মাটি জল বায়ু ও তেজ বা আগুন এই চার উপাদানকে সব কিছুর আদি বলে চিহ্নিত করেন। বৌদ্ধেরা এই সঙ্গে ব্যোম বা আকাশকে যুক্ত করেছেন এবং উভয় দলই বলেছেন যে জগৎ ও জীবন একদিন এইসব উপাদানের স্বয়ংসিদ্ধ সংযোজন বিয়োজনের ফলেই উদ্ভূত হয়েছে। এই জগৎ ব্যাপারের পিছনে জড় ও চেতনা দুইয়ের অচ্ছেদ্য ও পরস্পর নির্ভর একটি সক্রিয়তা নিঃশব্দে কাজ করছে। জন্ম মৃত্যু, দিবা রাত্রি, ঋতু বিবর্তন, সব তারই অভিব্যক্তি। প্রকৃতির রাজ্যে এসবকে ঘিরে যেমন কঠিন একটি নিয়মানুবর্তিতা আছে, তেমনি আছে ব্যতিক্রমও। ঝড় ঝঞ্ঝা প্লাবন ভূমিকম্প মহামারী ইত্যাদিকে তাঁরা এই ব্যতিক্রম বোলে বোঝেন। বৌদ্ধেরা অবশ্য আত্মা কর্মফল ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। কিন্তু বস্তুবাদী চার্বাকপন্থীরা মৃত্যুকেই শেষ সীমা মনে করেন এবং

তাঁদের মতে মৃত্যু হল মৌল উপাদানগুলির আদি উৎসে প্রত্যাবর্তন। প্রাণকে তাঁরা গণ্য করেন আগুন জল চুম্বক বিদ্যুৎ ইত্যাদির মত একটি ক্রিয়াশীল নৈসর্গিক উপকরণ রূপে, যার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও পরিসমাপ্তি আছে এবং যা সৃজনশক্তিসম্পন্ন। তাঁদের মতে এই সৃজনশক্তি আবার প্রজনন ও রূপায়ণ দুই ভাবে প্রকাশমান হয়।

অতএব এই জীব-জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি? বৌদ্ধেরা বিদ্যা বিনয় বৈরাগ্য শুচিতা ও সেবার আদর্শে বিশ্বাসী এবং তাঁদের মতে যেহেতু কর্মের বিপাকেই জন্ম-জন্মান্তরের পথে পরিভ্রমণ করে মানুষ, সেই হেতু কর্ম-বিরহিত হয়ে জন্ম-সম্ভাবনা রহিত করাই শ্রেয় কর্ম এবং তারই নাম নির্বাণ। বলা বাহুল্য, এ ধারণা হিন্দু জন্মান্তরবাদেরই রূপভেদ মাত্র এবং একই রকম অবৈজ্ঞানিক। চার্বাকীরা এখানে বেশী স্বচ্ছ। তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তির সঙ্গে নিজে বাঁচা এবং অন্যকে বাঁচতে দেওয়াই চরম ও পরম কাম্য মনে করেন। যে দুঃখ আমি অনভিপ্রেত মনে করি, তা অন্যকে পেতে দেব না। একবারের বেশী যখন জীবনলাভের সুযোগ নেই, তখন জীবনটাকেই সুন্দর করতে হবে। অর্থাৎ বৈদান্তিকের নেতিবাদ বা তন্ত্রাচারীর নোংরামি,জীবনে কোনটাই কাম্য নয়, কাম্য নয় বৌদ্ধের নৈষ্কর্ম্য ও নির্বাণের কামনাও। ইউরোপীয় নিরীশ্বর বস্তুবাদের যে ধারা হেরাক্লিটাস থেকে মিল বেনথাম হেগেল ও মার্কস-এঙ্গেলস পর্যন্ত চলে এসেছে, তার চেয়ে কম বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও জীবন-সচেতন নয় ভারতীয় বস্তুবাদী চিন্তা। মিল-ব্যাখাত হিতবাদ এবং কিয়েরকেগার্ড প্রচারিত অস্তিত্ববাদেরও আদি কাঠামোটা পাওয়া যায় না কি এর মধ্যে? চার্বাক ও কেশ-কম্বলীদের সমস্ত বই পুঁথি গোঁড়ারা ধ্বংস করেছেন, তবু টুকরো টুকরো ভাবে তাঁদের চিন্তার যে সব মণিরত্ন সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমাদের কাল পর্যন্ত এসেছে, তারই মর্মকথা উপরে বলা হল। এই সমস্ত সজীব ও সুস্থ চিন্তার বনিয়াদ ধ্বংস করে থাকলে, শংকর কি খুব মহৎ কাজ করেছেন?

২.

বৌদ্ধদের নাস্তিকতা ও তান্ত্রিকদের কদাচার থেকে মুক্ত করে বেদানুগ বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় এককভাবে শংকরের ভূমিকাকে নৈষ্ঠিকরা অকারণে কত বড় করে দেখেন, আগের অধ্যায়েই তা বলেছি। আমরা দেখেছি যে অদ্বৈত বেদান্তের কুয়াসায় শিক্ষিত মানুষদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করলেও, শংকর

সর্বসাধারণের সমাজে চলিত হিন্দু আচার-সংস্কারের ছাঁচ মোটেই পালটাতে পারেন নি। পৌরাণিক ও লৌকিক রকমারি দেবদেবীর পূজা তাঁদের মধ্যে অব্যাহতই থেকেছে এবং তার অনুষঙ্গরূপে প্রচলিত আহার বিহার ও রীতি নীতির কাঠামোও এতটুকু বদলায়নি। উঁচুতলার বুদ্ধিজীবী মহলেই শুধু তাঁর অদ্বৈত তত্ত্ব নিয়ে তর্কের কচকচি হয়েছে, তথাকথিত নীচু মহল তার ধারে কাছেও যাননি। যাবেন কেন ? নিরবয়ব নিরুপাধিক ও অনির্বচনীয় ব্রহ্ম ত ধারণাগম্য নয়, তা নিতান্ত একটা ধোঁয়াটে মত মাত্র। তাছাড়া শংকরের বিচারে জগৎ যেহেতু মায়াময়, সেইহেতু পার্থিব জীবনে মানুষের কিছুই যথার্থ করণীয় থাকতে পারে না, সেইজন্যেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা রামানুজ শংকরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। যদিও সবাই জানেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ৮ম-৯ম শতক নাগাদ শংকরের আবির্ভাব হয় বৌদ্ধ-নিসূদনরূপেই। কি করে সম্ভব হল এ ব্যাপার, তা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

অশোক থেকে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত একটানা প্রায় হাজার বছর বৌদ্ধধর্ম ছিল ভারতের রাজধর্ম [ যদিও মৌর্যদের পর গুপ্ত শাসনের সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টিতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেই হিন্দুধর্মের সহস্থিতি ঘটেছিল ], তাই রাজশক্তির প্রভাবে সমাজে একদিকে যেমন এসেছিল সাম্য ও সমানাধিকারের চেতনা, অন্যদিকে তেমনি প্রবল হয়েছিল বেদ ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞ-বিরোধী একটি মানসিকতাও। কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ পুরোহিত রাজা ভূম্যধিকারী ও শ্রেষ্ঠীরা অবশ্যই ভাল চোখে দেখেন নি এই পরিবর্তনকে। এই বিপ্লবের গতিকে প্রতিহত করার জন্যে প্রতিবিপ্লবের প্রস্তুতি তাঁরা চালাচ্ছিলেন অনেক দিন থেকেই। হর্ষ-বর্ধনের মৃত্যুতে সর্বশেষ শক্তিশালী বৌদ্ধ নরপতির আসন শূন্য হলে, চারিদিকে ছোট বড় অনেক হিন্দু সামন্ত রাজার উদ্ভব হল এবং তাঁরা একদিকে যেমন পরস্পর মারামারি কাটাকাটিতে মাতলেন, অন্যদিকে তেমনি বৌদ্ধধর্মকে ভারত ছাড়া করবার জন্যেও উঠে পড়ে লাগলেন। কুমারিল ভট্ট ও শংকর হলেন তাঁদেরই সৃষ্টি। এঁরা শুধু বেদান্তের হাতিয়ার নিয়েই যুদ্ধে নামেন নি, পিছনে সম্ভবত সশস্ত্র বাহিনীও থাকত, মেরে পিটে ঘর জ্বালিয়ে বৌদ্ধদের ঝাড়ে বংশে খতম করতে। এই কি সর্বভারতীয় সমন্বয়, যা শংকরের দান বলে নৈষ্ঠিকরা প্রচার করেন ?

আসলে উপরতলার কায়েমি স্বার্থ অব্যাহত রাখার লক্ষ্য নিয়েই কেরল

থেকে কেদার-বদরী পর্যন্ত গোটা ভারত সদলবলে পরিক্রমা করেছিলেন শংকর। স্থাপন করেছিলেন গুজরাট উড়িষ্যা কেরল ও বদরীতে চারটি মঠ এবং সনাতনীদের ধর্মীয় তথা সামাজিক একাধিকারের অছিরূপে সৃষ্টি করেছিলেন দশ শাখায় বিভক্ত সাধু সমাজ, গিরি পুরী বন পর্বত প্রভৃতি অভিধা-সম্প্রদায়েরা যার মধ্যে প্রধান। এই পর্যন্ত হল শংকরীয় ধর্ম-সংস্কারের ইতিমূলক অধ্যায়। কিন্তু এর পেছনে ছিল নেতিমূলক মস্ত আর একটা পর্বও এবং তা ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অখণ্ড সর্বনাশের অধ্যায় রূপেই গ্রহণীয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভেদবুদ্ধি যাঁদেরকে অস্পৃশ্য করে রেখেছিল, সেই শূদ্রেরা বৌদ্ধধর্মের ছত্রছায়ায় এসে প্রথম মানবিক সুবিচার লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম নির্মূলিত হলে তাঁরা ফের সেই অচ্ছ্যুৎই হলেন। কতক কতক গোষ্ঠী তখন পুরাতন শিবশক্তি আরাধনায় প্রত্যাবর্তন করে হঠযোগী তান্ত্রিক কাপালিক ইত্যাদি সাজলেন, কতক হলেন আউল বাউল শ্রেণীর সমাজ-ছুট সম্প্রদায়ভুক্ত। অর্থাৎ সমন্বয়ের বদলে ভাঙনই প্রবলতর হল সমাজে।

১২শ শতকে যখন ইসলাম এল ভারতবর্ষে, এই নীচু সোপানের নিগৃহীত হিন্দুরাই দলে দলে মুসলমান হলেন। অনেক রাজকীয় অনুগ্রহের আশায় হয়েছিলেন, অনেকে হয়েছিলেন প্রতিশোধের নেশায়। মোল্লা মৌলভীদের প্রচারে বা সরকারী মহলের পীড়নে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা অবশ্যই ঘটেছিল। এখান থেকেই ভারতের ইতিহাস গেরুয়া ও সবুজ দুই রঙে ভাগ হয়ে যায় এবং একাদিক্রমে আটশো বছর ধরে চলে একদিকে সংঘাত ও সংঘর্ষ, অন্যদিকে দুই সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের ব্যর্থ চেষ্টা, যার পরিণতিতে ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিমের বৃহৎ দুটি তল্লাট জন্মভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়ে পাকিস্তান নামক পৃথক একটি দেশ রূপে প্রকাশমান হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে যুদ্ধের পর পূর্বাংশ অবশেষে আজ হয়েছে আবার পৃথক আরো একটি দেশ। অর্থাৎ এক ভারতবর্ষ ভেঙে তিনটি দেশ হয়েছে এবং শংকরীয় হিন্দু পুনরুজ্জীবনের এই হল ঐতিহাসিক পরিণতি। সুতরাং তাত্ত্বিক বা ফলিত কোন দিক থেকেই শংকর প্রগতির সহায়ক হন নি। নৈষ্ঠিকরা আপন গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূল বলেই শংকরকে এতটা মহিমান্বিত করে দেখান, কারণ সেকাল একাল সব কালে জনসাধারণকে ইতিহাসের অগ্রযাত্রা থেকে তফাতে রেখেই বিচার করা হয়েছে।

সবশেষে জিজ্ঞাস্য শংকর কি নিজেও তাঁর অদ্বৈত সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী

ছিলেন? মনে ত হয় না। তাঁর নামে প্রচলিত গোবিন্দাষ্টক, গঙ্গাস্তোত্র ইত্যাদিতে তাঁকে ভক্তিবাদী গোঁড়া বলেই মনে হয় যেমন, তেমনি মোহমুদ্গর মোহকুঠার ইত্যাদিতে সাংসারিক কূটবুদ্ধি সম্পন্ন গৃহস্থ বলেও মনে হয়। এই জন্যেই কেউ কেউ এগুলিকে শংকরাচার্য নামধারী ভিন্ন এক ব্যক্তির রচনারূপে চিহ্নিত করেন। কেউ কেউ বলেন, এসব অপ্রাজ্ঞ জনগণের জন্যে লিখিত। তাছাড়া শংকরদিগ্বিজয় ও অন্যান্য বইয়ে তাঁর সম্পর্কে যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে, যথা: মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয় ভারতীর সঙ্গে তাঁর কামশাস্ত্র বিষয়ক বিতর্কে পরাস্ত হওয়া এবং কোন মৃত রাজার দেহে যোগ বলে প্রবেশ করে কামকলাবিদ হওয়া, জলন্ত চুল্লিতে তেলের কড়া চড়িয়ে বৌদ্ধদের সঙ্গে তর্কে বসা ও পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বীকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা এবং শেষ পর্যন্ত জনৈক লামার কাছে পরাস্ত হয়ে নেপালের শংকর কটাহ নামক স্থানে স্বয়ং তেলের কড়ায় উঠতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি আজগুবি গল্প হলেও, তার আড়াল থেকে শংকরের যে ভাবমূর্তিটি পরিস্ফুট হয়, তা কোন বিষয়-বিমুক্ত জ্ঞানতপস্বীর চিত্র যে নয়, এ বোঝা মোটেই কঠিন নয়। অর্থাৎ শংকরের ব্যক্তিরূপটি আড়া-গোড়াই তৈরি করা।

॥ মধ্যযুগের মন ও মানুষ ॥

ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ অন্ধকার যুগ নামে অভিহিত হয়। রোমক সাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হলে, উত্তর ইউরোপের বিবিধ বর্বর জাতি সারা মহাদেশে হানা দিতে থাকেন এবং গ্রীকো-রোমক সভ্যতার যা কিছু মহৎ সৃষ্টি, সব ভেঙে চুরে তছনছ করে ফেলেন তাঁরা। শার্লোমাঁ এই ধ্বংসস্তূপের ওপর কিছুকাল পরে নূতন করে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন রোমক সাম্রাজ্যের। তার নাম দেন তিনি পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য, যা গিবনের মতে পবিত্রও নয় রোমকও নয়। এর পরেই একে একে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্র মাথা তুলতে থাকে, যারা হল বর্তমান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির আদি কাঠামো। এই বিপর্যয়ে ইউরোপ হারিয়েছিল তার সমস্ত শুভ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার এবং নৈতিক সামাজিক ও বৌদ্ধিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছিল অন্ধভাবে খ্রীষ্টান গির্জার আজ্ঞাবহ। দীর্ঘস্থায়ী সেই অন্ধকার ভেদ করে তারপর একদিন জলে উঠল রেনেসাঁস বা নব জাগৃতির আলো। মানুষ নূতন করে তার হারান ঐতিহ্যটি আবিষ্কার করল আবার, গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতির ভিতর থেকেই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-প্রত্যয়ের ওপরই তৈরি হল তার নূতন জীবন-চেতনার একটি ভাবময়

পরিমণ্ডল। সাহিত্য শিল্প ও কলাকৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন এল অভাবনীয় সৃষ্টির জোয়ার, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সন্ধিৎসা তেমনি অনুপ্রেরণা দিল মানুষকে চিন্তার নব নব দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে।

আমাদের মধ্যযুগের ইতিহাসও অনেকটা একই রকম। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুতে তাঁর বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পরে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্মুখীন হয় তীব্র হিন্দু প্রতিকূলতার। এই প্রতিকূলতাই সংহত মূর্তিতে দেখা দেয় শেষ পর্যন্ত কুমারিল ভট্ট ও শংকরের সংঘাতশীল হিন্দু পুনরভ্যুদয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। উপরতলার স্বার্থ ও সংস্কৃতির স্বাধিকার তাতে সুরক্ষিত হল হয়ত, কিন্তু যে অন্ত্যজেরা সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা রসাতলে নিক্ষিপ্ত হলেন। অস্পৃশ্য সর্বাধিকার-বঞ্চিত এই নীচুতলার মানুষরাই কিন্তু দেশের বারো আনা এবং তাঁদের মানবিক অধিকার হরণই হল শংকর-জীবনের প্রধান কলঙ্ক, যা বেদান্ত ভাষ্যের গোঁজামিলে ঢাকা যায় নি। এরপর হল ভারতে মুসলীম অভিযান এবং দেশের ছোট বড় সমস্ত মানুষকে সংহত করে প্রতিরোধে অগ্রণী হলেন না উঁচুতলার হিন্দুরা। ধর্ম বাঁচানর নামে কূর্মের মত আপন খোলায় আত্মগোপন করলেন তাঁরা। নিগৃহীত নীচু সোপানের মানুষরা হয় ধর্মান্তর নিলেন, নয় সমাজচ্যুত মানুষরূপে পাদপ্রদীপের পিছনে সরে গেলেন।

এই অন্ধকার মথিত করে রেনেসাঁসের আলো জ্বলে উঠল কি এখানে? হল কি বিনষ্ট মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন পুনর্বসতি ইউরোপের মত? কিছুটা হল বৈকি! সুফীদের কথা আগেই বলেছি। বাইরে থেকে আগত এই ধার্মিকদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানবাদী, তাঁদের সঙ্গে হিন্দু বৈদান্তিকদের এবং যাঁরা ভক্তিবাদী, তাঁদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের ভাবাদর্শে গভীর মিল ছিল। জ্ঞান ও কর্মের পথে হিন্দু-মুসলীম মিলনের প্রয়াস করেছিলেন তাঁরা। তা করেছিলেন চিস্তী, দরবেশ এবং মারিফতীরাও। তাঁরা একদিকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছিলেন, অন্যদিকে হকিক ও তৌহিদের অর্থাৎ আত্মা ও মোক্ষের বাণী প্রচার করেছিলেন। এদের পাশাপাশি উঠেছিলেন সন্তসাধুরা, রামানন্দ নানক দাদু কবীর রজ্জবালি প্রমুখ মহাজনেরা। এঁদের মধ্যে কবীর ও রজ্জবালি ছিলেন মুসলমান, কিন্তু প্রচুর হিন্দু নিয়েছিলেন তাঁদের শিষ্যত্ব, যেমন নানক চৈতন্য ও দাদুর শিষ্য শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন অনেক মুসলমানও। হরি ও আল্লার একত্ব প্রতিপাদন করেছিলেন এঁরা এবং প্রেম মৈত্রী বিবেক

ও বৈরাগ্যের আলোয় সত্যানুসন্ধানের অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন মানুষকে। সমাজের নীচু সোপানেও এর ফলে হয়েছিল কিছু ঐক্যের প্রয়াস। পীর ও ফকির শ্রেণীর গৃহ-ছুট মানুষের এবং সত্যনারায়ণ বনবিবি ওলাবিবি শ্রেণীর লৌকিক দেবতার আবির্ভাবই সাক্ষ্য দেয় সেই ঐক্যের। রাজশক্তির পূর্ণ আনুকূল্য পেলে এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের যথার্থ সমর্থন থাকলে, এই প্রয়াস সামাজিক সমন্বয়ের মূর্তিতেই প্রকাশমান হতে পারত। তার অভাবে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে অর্থাৎ শুধু শুভবুদ্ধিপরায়ণ মানুষের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে আন্দোলনটি। তবে লক্ষণীয় উদ্যম যে হয়েছে, তা স্বীকার করতেই হবে। আল্লোপনিষদ ও শাজাহান-পুত্র দারার মজমেউল বাহেরিন বইয়ের কথা আগের অধ্যায়েই বলেছি। এছাড়া ফার্সিতে বাদাউনি রামায়ণের অনুবাদ করেন, ফৈজি করেন মহাভারতের নির্বাচিত অংশের। হাজি ইব্রাহিম সরহিন্দী অথর্ববেদের অনুবাদ করেন। উপনিষদ গীতা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ লীলাবতীর বীজগণিত প্রভৃতিও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অনূদিত হয়। এই সঙ্গেই হয় বাংলা হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি মাতৃভাষাগুলিরও প্রভূত সমুন্নতি। হিন্দুদের মধ্যে ফার্সি সাহিত্যের অনুশীলন ও মুসলীম সাজসজ্জার অনুকরণ ত আসেই। ভারতীয় চিত্রে ভাস্কর্যে স্থাপত্যে সংগীতেও এবং প্রাত্যহিক আচার-আচরণেও সারাসেনীয় বা ঐস্লামিক রীতির অনুগমন যথেষ্ট হতে দেখা যায়। ফার্সিতে হিন্দুরা যেমন কবিতা লিখেছেন, দরাফ খাঁ তেমনি লিখেছেন বিখ্যাত গঙ্গাস্তোত্র সংস্কৃতে।

কিন্তু ধর্ম সংস্কৃতি ও কলাকৃষ্টির মুল্লুকে নবজাগৃতির এই উদ্যম যদি রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হত, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য ভাবে গড়ে উঠত এবং ছয় শতাব্দীর মুসলীম শাসন ও দুই শতাব্দীর বৃটিশ শাসন অন্তে এক ভারতবর্ষ ভেঙে তিনটি দেশ হত না। তিনটি দেশেরই, বিশেষত ভারতের, সমাজ-কাঠামো শ্রেণী গোষ্ঠী ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে শত খণ্ডে ভাগ হয়ে থাকত না। অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে, নারীর অকাল বৈধব্য নিয়ে, জাতিভেদ নিয়ে, হিন্দু অহিন্দুতে পূজা উপাসনা ও পানভোজনের অধিকার নিয়ে আজও মানুষকে মাথা ঘামাতে হত না। পুরুষানুক্রমে অর্জিত কুসংস্কার দারিদ্র্য ও অশিক্ষার এই জগদ্দল পাথরকে গুরু গোঁসাই মোহান্তরা এবং মোল্লা মৌলভীরা ধর্মের নামে সমগ্র জাতির বুকে চাপিয়ে রেখেই স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন যুগের পর যুগ। তাই আজও একের উপাসনালয়ে হোটেলে,

পুষ্করিণীতে অন্যের প্রবেশ চলে না. একের খাদ্য বা পানীয় জল অন্যে ছুঁলে তা অস্পৃশ্য হয়। একের মৃতদেহ অন্যে সৎকার করতে কুণ্ঠিত হন ধর্মহানির ভয়ে। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা আজও দুর্লভ ঘটনা নয়। পর্ববিশেষে প্রাণীবিশেষকে উৎসর্গ করা নিয়ে, অথবা ধর্মস্থানের সামনে বাজনা বাজান নিয়ে আজও যত্রতত্র শান্তিভঙ্গ হয় এবং মজা এই যে, সব কিছুর জন্যেই দেওয়া হয় শাস্ত্র ও ধর্মের দোহাই। এই বিপথ প্রস্থিত শাস্ত্র ও ধর্মের দাস্য থেকে মুক্ত করে সমস্ত নরনারীকে যে উজ্জ্বল আশাদীপ্ত একটি নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বৌদ্ধেরা, তাঁদের পর সূফী, বৈষ্ণব ও সন্তেরা, তাঁদের চিন্তাভূয়িষ্ঠ বিশাল সাহিত্যেই আছে তার স্বাক্ষর। সেই সাহিত্যের বিষয়বস্তু তাই আর একটু বিশদভাবে প্রণিধান করা প্রয়োজন। কারণ কায়েমি স্বার্থের অছি আচার্য সংস্কারক ও বিদ্যাব্রতীরা কিভাবে সমস্ত অগ্রগতির ও সব শুভ উদ্যমের কণ্ঠরোধ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী দেশ এবং জাতিকে চোখ-বাঁধা বলীবর্দের মত একই নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে খালি ঘুরপাক খাওয়াচ্ছেন, তা না বুঝলে, এই কাঠামো আমূল ভেঙে নূতন করে শোষণহীন সাম্যাশ্রিত সমাজ গড়ার উদ্দীপনা পাবেন কি করে মানুষ? মধ্যযুগের মন ও মানুষ পর্যালোচনা উপলক্ষে এই সাহিত্যের দুনিয়াটা পরিক্রমা করব এর পর।

২.

আগের অধ্যায়ে মধ্যযুগীয় যে সন্তসাধকদের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁদের জীবন কর্ম ও চিন্তার সঙ্গে বাঙালী পাঠককে প্রথম পরিচিত করান ক্ষিতি-মোহন সেন, তাঁর মধ্যযুগের ভাবসাধনা বিষয়ক বইয়ে। প্রায় চল্লিশ বছর পরে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন বিভাগ নিয়ে বই লেখা এখনো এদেশে নিষ্কাম কর্মসাধনার পর্যায়ভুক্ত হয়েই রয়েছে। কিন্তু সে কথা যাক। বইটি যে মূল্যবান এবং সকলেরই পড়ে দেখা উচিত, তা অবশ্য বলে দিতে হবে না। সন্ত সাধুদের নিপুণ নেতৃত্বে সেই অনগ্রসর দিনেই সাহিত্যের পথে সারা ভারতে কি ভাবে একটা সর্বাত্মক মন-জানাজানির প্রয়াসকে সার্থক করার উদ্যম হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত কাঠামো মেলে ধরা হয়েছে এতে। মনে রাখা দরকার যে সন্ত সাধুদের মধ্যে দু-একজন সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী পুরুষ থাকলেও বেশীর ভাগই ছিলেন নিরক্ষর সাধারণ মানুষ। তাঁরা তাই কেউ জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথা বলেন নি, শাস্ত্র-

নির্দেশিত জটিল সাধন ভজনের পথও দেখান নি। বরং ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মায়তনের প্রাধান্য অস্বীকার করে মানবিক স্বাধিকারকেই বড় করে দেখাতে চেয়েছেন তাঁরা, তাঁদের ভক্তি অনুরাগ ও আর্তি-মিশ্রিত গানের মাধ্যমে। এ সমস্ত গানকেই শাস্ত্রবাক্যরূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছেন দেশের মানুষ। বাংলায় বৈষ্ণব মহাজনদের পদ, অসমিয়াতে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের পদ, হিন্দীতে দাদূ কবীর ও রজ্জবের, মারাঠীতে তুকারাম নামদেবের, গুজরাতীতে নরসী ভক্তের, রাজস্থানীতে মীরার ভজনাবলী, পাঞ্জাবীতে জপজী গীতিমালা অসীম মর্যাদায় গৃহীত ও গীত হয়েছে। হয়েছে দক্ষিণী আলোয়ার তিরুবল্লুবর অপ্পর পত্তিনত্তর প্রমুখের ভজন, যা কবীরের দোঁহা তুকার অভঙ্গের অগ্রজ স্বরূপ। দক্ষিণীদের প্রসঙ্গ ক্ষিতিমোহনের বইয়ে নেই, বোধ হয় তিনি পরিচিতই ছিলেন না এই বিভাগটির সঙ্গে। এঁদের কথা আমাদের শুনিয়েছেন আগে নলিনীমোহন শাস্ত্রী, তারপর আরো বিশদ আকারে যতীন্দ্রদাস রামানুজ। বলা নিষ্প্রয়োজন যে দক্ষিণী উৎসটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গৌড়ীয় প্রেমধর্মের উদ্ভব হয়েছে তা থেকে, এই রকম মনে করছেন এখন বিশেষজ্ঞেরা।

মধ্যযুগেই প্রথম ভারতবর্ষের প্রাদেশিক মাতৃভাষাগুলি লিখিত সাহিত্যের মাধ্যমরূপে গড়ে ওঠে। সন্ত সাধুদের দোঁহা কীর্তন ও ভজনই একাজে প্রধান ভূমিকা নেয়। অবশ্য এছাড়া বিভিন্ন লোকদেবতার মহিমাসূচক মঙ্গল গাথা এবং আঞ্চলিক উপকথা, গল্প ইত্যাদির কাব্যরূপও যথেষ্টই লিখিত হয়। এই সঙ্গে চিরাচরিত ধারায় সংস্কৃত রচনাও চলে, চলে রাজভাষা ফার্সিতে সাহিত্য রচনাও। বলা দরকার যে মোটামুটি ভাবে খ্রীষ্টীয় ১ম থেকে ৮ম শতক পর্যন্ত হল সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবের কাল। ভাস, অশ্বঘোষ কালিদাস, ভবভূতি,শূদ্রক, বিশাখদত্ত, মাঘ,ভারবি, বাণভট্ট, সবাই ওঠেন ঐ সময়সীমার মধ্যে। তারপর শুরু হয় অবক্ষয়ের অধ্যায় এবং পূর্বসূরীদের বাঁধা ছক ধরেই কাব্য নাটকাদি লিখিত হতে থাকে, অথবা চলতে থাক পুরাতন জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক বই পুঁথির ভাষ্য রচনা। এই অবক্ষয়ের অধ্যায়ে বাংলাদেশে উল্লেখ-যোগ্য সংস্কৃত গ্রন্থ যা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশেষত্বের দাবী রাখে। নন্দীর বইটি শ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্ব্যর্থকতাবোধক কাব্য, এক অর্থে তা অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের আখ্যান এবং অন্য অর্থে হল সেটি গৌড়াধিপতি রামপালের কাহিনী। এছাড়া ১০ম থেকে

১২শ শতকের মধ্যে রচিত হয় ধোয়ীর পবনদূত এবং শ্রীধরদাস সংকলন করেন সদুক্তিকর্ণামৃত। চৈতন্য-যুগেও প্রভূত সংস্কৃত গ্রন্থ লেখা হয়েছে। সনাতন রূপ জীব কর্ণপুর রামানন্দ প্রবোধানন্দ বলদেব নরহরি স্বরূপ দামোদর, নানা জ্ঞানীজনের আবির্ভাব হয় এই সময়। অজস্র কাব্যনাটক তত্ত্বনিবন্ধ ও চরিতকথা লেখেন তাঁরা, সর্বভারতে চৈতন্যবাদ তথা গৌড়ীয় দর্শন প্রচার করতে। বেকন যেমন সারা ইউরোপে প্রচারের উদ্দেশ্যে নোভাম অর্গানাম বই লেখেন লাতিনে বা নিউটন লেখেন প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিসিয়া, এঁদের উদ্দেশ্যও ছিল অনেকটা তাই। মধ্যযুগীয় সরকারী ভাষা ফার্সিতে সংস্কৃত সাহিত্যের যে সব ধ্রুপদী গ্রন্থ অনূদিত হয়, তার কথা তো আগেই বলেছি। এছাঁড়া ফার্সিতে লেখা হয় বহু ইতিহাসপুস্তক, যার মধ্যে বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, আইন-ই-আকবরী, তাবাকাতে-ই-নাসিরী, আলমগীরনামা, সায়ের-উল-মুতাক্ষরীণ প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের অনুবাদ-মাধ্যমে অবশ্যই পরিচয় হয়েছে। বিশুদ্ধ সাহিত্য রচয়িতা হিসাবে আমীর খসরু ফৈজী প্রমুখের কবিতার কথাও কম বেশী অনেকেই জানেন।

ডঃ হাদী হোসেন সম্প্রতি অনাবিষ্কৃত আর একটি মুল্লুকের দরজা খুলেছেন, তাঁর গোলডেন ট্রেজারি অব পারসিয়ান পোয়েট্রি বইয়ে। এই অনুবাদ সংকলনে ডঃ হোসেন ফেরদৌসী থেকে সময়ানুক্রমে সাজিয়ে পারস্য ভাষার প্রখ্যাত সমস্ত কবিকে হাজির করেছেন। সব শেষে আছেন মুঘল ভারতের কবিরা। এই কবিতার সবই অবশ্য বাদশা বেগম ও শাহাজাদীদের লেখা, একটিও সাধারণ মানুষের রচিত নয়। তাই প্রকৃত জনগণ যাঁরা, তাঁদের বার্তা কোথাও মেলে না, যা মিললে ভাল হত। কারণ সাধারণ হিন্দুর মত সাধারণ মুসলমানও ত আদৌ সুখে ছিলেন না সে সময়। জাত্যভিমানী বর্ণাশ্রমীদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে যে নীচু সোপানের হিন্দুরা মুসলমান হয়েছিলেন, বেশীর ভাগই তাঁরা নিঃস্ব ভূমিদাস ও পেশাদার সিপাহী হয়ে কায়ক্লেশে দিন কাটাতেন, পদে পদে আমীর ওমরাহ ও জঙ্গী সর্দারদের খবরদারি বরদাস্ত করে। তাঁদেরও ত মর্মবেদনা ছিল, যা গানে, কবিতায় অবশ্যই ব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু সংরক্ষার অভাবে অন্ধকারে হারিয়েছে তার সবই। যাই হোক মুঘল কবিতাবলীতে তা সত্ত্বেও বেশ কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। পর্যাপ্ত ক্ষমতা ঐশ্বর্য ও বিলাস ব্যসনের মধ্যেও কেমন একটা নিঃসঙ্গ একাকীত্বের, একটা অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণার দেখা মেলে যেন অধিকাংশ কবিতায়। দু-একটিতে দেশ

কাল ও ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে সার্বভৌম শুভবুদ্ধি এবং মানব-প্রেমের মহিমা গাইতে দেখা যায় রচয়িতাকে। এই সব জায়গায় এসে অজ্ঞাতসারেই মুঘল কবিরা বৈষ্ণব পদকর্তা ও সন্ত সাধুদের সহযাত্রী হয়ে উঠেছেন প্রাণধর্মের সমতায়। কোন কোন কবিতা আর্তি ও অনুরাগের অকপটতায় হয়ে উঠেছে আধুনিক লিরিকের সমগোত্রীয়। তা সত্ত্বেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে স্পৃশ্যে অস্পৃশ্যে দ্বিধাবিভক্ত, দুর্ভিক্ষ মহামারী ও রাষ্ট্র বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত, রাজশক্তি ও সমাজশক্তির অবিরাম শোষণে জর্জরিত, বিধবা বেকার ও নিরক্ষর-অধ্যুষিত, ব্যভিচার বহু বিবাহ ও ধর্মকলহ কলুষিত মধ্য-যুগীয় সমাজের মন এবং মানুষের যথাযথ ছবি, বাংলা মঙ্গলকবিতা ও মারাঠী এবং রাজপুত লোকগাথা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। তবে শেষোক্ত দুই সাহিত্যে যে জাগ্রত দেশাত্মবোধের উত্তাপ পাওয়া যায়,মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্যে কোথাও তা নেই। ১২শ শতকে যখন বখ্‌তিয়ার খিলিজির হাতে হিন্দুশাসনের অবসান হয়, তখনকার সাহিত্য হল গীতগোবিন্দ, আর ১৮শ শতকে ক্লাইভ যখন বাংলা দখল করেন, তখনকার সাহিত্য হল বিদ্যাসুন্দর। কি বুঝব এতে?

৩.

অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চলের তুলনায় বঙ্গভূমিতে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ধারা বেশ একটু ভিন্ন রকমের। সেই বিভিন্নতার স্বরূপ বাঙালী পাঠকের জন্যে আরো একটু বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য যেহেতু সমগ্র ভারতের পটভূমিতে নিবদ্ধ, আঞ্চলিক প্রবণতাগত বৈশিষ্ট্যের কথা তাতে তাই সংক্ষেপেই বলতে হয়েছে। তবু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং তার আলোচনা অনাবশ্যক নয় এই জন্যে যে, কোন একটা অঞ্চল ধরে অগ্রসর হলেও যুগধর্মের মোটামুটি ধরণটাই সমগ্র ভাবে ধরা পড়বে তার মধ্যে দিয়ে। ইতিহাসের পড়ুয়ারা জানেন, মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটদের আমল থেকে বাংলার ইতিহাস যাত্রা শুরু করলেও, খ্রীষ্টীয় ৯ম-১০ম শতাব্দীর অর্থাৎ পাল রাজাদের আগে তার চেহারাটা স্পষ্টতা লাভ করেনি। পালেরা এবং তাঁদের পরবর্তী সেন রাজারা সর্বসাকুল্যে প্রায় চারশো বছর বাংলা শাসন করেন। বৌদ্ধ অব-ক্ষয়ের পর শংকরাচার্যের অভ্যুদয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাতেও বৌদ্ধেরা পুরান শিবশক্তি আরাধনার পর্দা আড়াল দিয়েই হিন্দু ধর্মায়তনে ফিরে আসেন। তাঁরাই হলেন সহজিয়া। বর্ণাশ্রমবাদী হিন্দুদের পাশাপাশি

সিদ্ধাই যোগী আউল বাউল, নানা নামে তাঁরা বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রাধান্য বিস্তার করেন। পাল রাজারা ছিলেন তাঁদের সমর্থক। সম্ভবত তাঁরা নিজেরাও বৌদ্ধ ছিলেন। তারপর হল সেন রাজাদের অভ্যুদয়। তাঁরা ছিলেন নৈষ্ঠিক হিন্দু। কর্ণাটক থেকে দক্ষিণী ভক্তিবাদ ও রাধাকৃষ্ণ আরাধনা নিয়ে এলেন তাঁরা। সমাজে পত্তন করলেন বর্ণাশ্রমী কৌলীন্যের আঁটুনি এবং সিদ্ধাই নাথপন্থী আউল বাউল, সবাই পরিগণিত হলেন তার ফলে সমাজ-ছুট নীচু তলার মানুষ রূপে। ১২শ শতকে ইসলামের আবির্ভাব হলে, তাঁরাই সর্বাগ্রে ধর্মান্তর নেন, কতকটা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে, কতকটা বা প্রতিশোধ বশে। পরবর্তী ছশো বছর চলে একটানা মুসলীম শাসন। হিন্দু-মুসলমানে সংঘাত ও সমন্বয় দুইই চলতে থাকে এই দীর্ঘ সময় ধরে। তারপর তার রূপান্তর হয় ইংরেজ শাসনের আবির্ভাবে এবং তারও সূচনা বাংলা থেকেই।

এর মধ্যে পাল-সেন যুগের সাড়ে তিনশো চারশো বছর এবং [ প্রাক-বৃটিশ ] নবাবী আমলের থেকে শো-দেড়েক বছর বাদ দিলে, মাঝখানে যে সময়টুকু থাকে, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালীর জীবনে তা প্রকৃতই তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ দুই প্রান্তিক অধ্যায়ে অরাজকতা অশান্তি ও অনাচারের প্রাচুর্যে সমাজের কোন স্থিতিশীল চেহারাই গড়ে উঠতে পারেনি কোনদিন। কিন্তু সে কথা থাক। মাঝের ঐ সময়টুকুর কথাই বলি। ঐ সময় সুলতান হুসেনশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য কলাকৃষ্টি ও সাহিত্যে দেশে সত্যিই হয়েছিল একটা নব চেতনার উন্মেষ। নব্যন্যায় ও নব্যস্মৃতির ব্যাপ্তিতে বৈদগ্ধ্যের আবহাওয়া শক্তিশালী হয়েছিল। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রব্যাখ্যা ও চৈতন্যের প্রেম ভক্তিতত্ত্ব ধর্ম-জীবনেও এনেছিল বেশ খানিকটা নূতনত্বের প্রেরণা। তাছাড়া আগেই বলেছি, চৈতন্য-শিষ্যদের প্রজ্ঞা ও প্রয়াস সর্বভারতেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল বাঙালীকে। এই দিক থেকে চিন্তা করেই এই যুগকে রেনেসাঁসের পর্ব বলা যেতে পারে বাংলার ইতিহাসে। কিন্তু এই যেমন এদিকের চিত্র, তেমনি আছে আর একটা দিকও, যার চিত্রও উদ্ঘাটন করতে হবে সত্যনিষ্ঠ মানুষদের। বল্লালী কৌলীন্যের দাপটে নীচুতলার মানুষরা অচ্ছ্যুতের শ্রেণীভুক্ত হয়ে সর্বনিম্ন মানবিক অধিকারটুকুও হারিয়েছিলেন, যার জের চলেছে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে আজও। দলে দলে ধর্মান্তর গ্রহণের উদ্দীপনা তাঁদের মধ্যে এসেছিল বা সৃষ্টি হয়েছিল, এই অসন্তোষের মাটি থেকেই। চৈতন্য এই চলতি সমাজ-

কাঠামো ভেঙে সাম্যাশ্রিত নূতন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। একদিকে তিনি স্বগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে প্রচার করেছিলেন সর্বমানবিক ঐক্যের এক মহান আদর্শ, অন্যদিকে ধর্মান্তরণের পাইকারি প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়েছিলেন, সংহত সমাজবিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে সমাজশক্তি ও রাজশক্তি একই সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়েছিল তাঁর ওপর। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিরিখে বিচার করলে, তাঁর দেশত্যাগ এবং কাশী গয়া বৃন্দাবন ও ওড়িষ্যা পর্যটন শেষে নীলাচলে আমৃত্যু অবস্থানের ঘটনাকে এরই প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে না কি ?

হিন্দু সমাজের উঁচু মহল ও নীচু মহলেই শুধু সংহতি আনতে চাননি চৈতন্য, হিন্দু ও মুসলমানদের একটা সুস্থ সমঝোতায় আনার কথাও ভেবেছিলেন। কাজী কর্তৃক কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আন্দোলন যেমন করেছিলেন তিনি, তেমনি বিরোধের অবসানে করেছিলেন তাঁর সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপনও। শাস্ত্র ও লোকাচারের নামে স্মার্তদের রকমারি যুক্তিহীন অনুশাসনের ও বৈদগ্ধ্যের নামে নৈয়ায়িকদের অর্থহীন কচকচির যেমন অবসান চেয়েছিলেন তিনি, মানুষকে দেখতে চেয়েছিলেন সদবুদ্ধি-প্রণোদিত সহজ সত্যের পথে, তেমনি ধর্মের দোহাইয়ে তান্ত্রিকদের মদ্যপান পশুহত্যা বামাচার ইত্যাদির উচ্ছেদ করে একটি শুচিসুন্দর ধর্মের আদর্শেও উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন মানুষকে তিনি। কিন্তু কোনটাতেই সফল হননি। বরং তাঁর প্রেম-ভক্তিবাদের বিকৃত ব্যাখ্যাই প্রাধান্য নিয়েছে দেশে। যে সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ স্বীকৃত ছিল, ছিল মরণাপন্ন বৃদ্ধের কিশোরী বিবাহ, অথচ বালিকা বিধবার জন্যে ব্যবস্থিত ছিল বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য, অথবা মৃত স্বামীর অনুগমন, অথবা পাতিত্য গ্রহণ, ছিল নিম্ন সোপানের মানুষকে দূরে ঠেলে রাখা, অথচ সেই শ্রেণীস্থ পুরুষের শ্রম ও নারীর সম্ভ্রম নির্বিচারে দুহাতে ভাঙান, সে সমাজের ভিত নাড়ান কি সোজা ? কাজেই রেনেসাঁস কথাটাকে আমাদের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে নিতে হবে যথাসম্ভব সীমিত অর্থেই। মনে রাখতে হবে যে সমাজের উপর তলাতেই এসেছিল শুধুমাত্র একটা নূতন জীবনবোধের আলো, যা বেশী নীচে নামেনি। চৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বও ঐ উপর তলাতেই আবর্তিত হয়েছে। তাছাড়া তাতে নূতন কথা খুব একটা আছে কি ? রামানুজ নিম্বার্ক ও মধ্ব যে ভক্তিভিত্তিক দ্বৈততত্ত্বের অবতারণা করে যান, চৈতন্যবাদ তারই ঈষৎ রূপান্তরিত অনুবৃত্তি মাত্র নয় কি ? ঈশ্বর আত্মা

ও জীবন নিয়ে এই গতানুগতিক ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল চৈতন্যের সমাজ-দর্শন।

॥ ভারতে প্রতীচ্য সাম্রাজ্যবাদ ॥

গ্রীকরা সিন্ধুকে অভিহিত করতেন ইণ্ডাস নামে, আর সেই অনুসারেই সিন্ধু-তীরবর্তী দেশকে তাঁরা বলতেন ইণ্ডিয়া এবং ঐ দেশের অধিবাসীদের ইণ্ডুস। আরবরা এই ইণ্ডুকেই করেন হিন্দু এবং তাঁদের বাসভূমির নাম হয় হিন্দুস্তান। সবাই জানেন গ্রীকরা প্রথম ভারতে আসেন খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দ নাগাদ যখন মাসিদনরাজ ফিলিপের পুত্র আলেকজেণ্ডার মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে মিশর, পারস্য ও আফগানিস্তান জয় করে ভারতে হানা দেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের কিছু আগে এবং পাঞ্জাব পর্যন্ত সবেগে অগ্রসর হন তিনি। তারপর যে জন্যেই হোক, তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। কথিত আছে গঙ্গারীঢ় নামক এক জাতির সমরশক্তির কথা শুনেই তিনি আর আগুয়ান হতে ভরসা পান নি। কেউ কেউ বলেন, এই গঙ্গারীঢ়রা [ গঙ্গারাঢ়ী ? ] ছিলেন বাঙালী। মোটের উপর এই হল ভারতে প্রথম ইউরোপীয় জাতির পদক্ষেপ। শুধু তাই নয়, আলেকজেণ্ডার তাঁর অধিকৃত ভূমিতে যে গ্রীকদের প্রতিষ্ঠিত করে যান, তাঁরাই প্রথম করেন ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতি-সমন্বয়ের পটভূমি রচনা। গান্ধার মূর্তিশিল্পের নির্মাণশৈলীতে, উৎকীর্ণ ধাতুমুদ্রায়, নাট্যাভিনয়ের মঞ্চ রচনায় পর্যাপ্ত গ্রীক প্রভাব পড়েছে, অনেকে এই অনুমান করেন। তাঁদের মতে সংস্কৃত নাটকের যবনিকা কথাটি নাকি যবন অর্থাৎ গ্রীকদের আনীত বলেই সৃষ্টি হয়েছে। এই সঙ্গেই অবশ্য তাঁরা বলেন যে ভারতবর্ষের গণিত জ্যোতিষ এবং দর্শন প্রভাবিত করেছে গ্রীকদেরও, যা পরে রোমান ও আরবদের হাত দিয়ে সারা ইউরোপে ব্যাপ্ত হয়। গ্রীকদের পর রোমান আমলে ভারত ও রোমের মধ্যে ত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানই শুরু হয়ে যায় এবং এই আনা-গোনার পথ ধরেই নাকি একদিন স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট এবং তাঁর অন্যতম শিষ্য ও অনুগামী সেণ্ট টমাস ভারতে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। কিন্তু এইসব টুকরো ঘটনা বাদ দিলে, ভাস্কো-ডা-গামা ও আলবুকার্কের কালিকট অধিকারেই বোধ হয় প্রথম ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয় ভারতে। তারপর একে একে আসেন ফরাসী ওলন্দাজ [ হল্যাণ্ড-ডাচ ] ডেন, সবশেষে ইংরেজ। সুদূর অতীত থেকে প্রতীচ্যে হীরা জহরৎ সোনা রূপা গজদন্ত ও মশলাপাতির জন্যে প্রসিদ্ধি ছিল ভারতের। বণিক ইউরোপ

তারই আকর্ষণে প্রাচ্যে পাড়ি জমায় দলে দলে, রেনেসাঁসের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা পেয়ে।

১৭শ শতক থেকেই যদিও মৃদু আকারে ইউরোপীয়দের ভারতে আনাগোনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু ১৮শ শতকের আগে এখানে তাঁদের খুব সুবিধা করতে দেখা যায় না। এই সময়েই প্রথম গঙ্গাতীরবর্তী বাংলায় ইতস্তত তাঁরা কুঠি গেড়ে বসতে থাকেন। তখন সবে বাষ্প বিদ্যুৎ ইউরোপের আয়ত্তে এসেছে এবং গতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় তা যুক্ত করে মানুষ যুগান্তর ঘটিয়েছে।ভৌমিক প্রতিপত্তির দিন শেষ হয়ে তখন আসছে বাণিজ্যিক একাধিকারের দিন। কলকারখানার তাগিদেই কাঁচা মাল সস্তায় সংগ্রহের জন্যে ইউরোপীয় বণিকদের চোখ পড়েছিল কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ ভারতের দিকে। কলের জাহাজ এবং বন্দুক এই কাজে তাঁদের সহায়তা-করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশবাসীর রাজনীতিক অসাড়তা এবং পারস্পরিক ঐক্যের অভাবই প্রশস্ত করে তাঁদের সম্প্রসারের পথ। পলাশির যুদ্ধের মত একটা ছেলেখেলার মাধ্যমে তাই বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ওপর চেপে বসতে পারল। দেশদ্রোহী কিছু জমিদার ও জঙ্গীসর্দার তাঁদের পক্ষে গেলেন। বেতনভুক দক্ষিণী ফৌজ তাদের হয়ে অস্ত্র ধরল। ফলে পাকা কাঁকুড়ে ছুরি বসানর মত অনায়াসে বাংলার দেওয়ানী দখল করলেন কোম্পানি, নবাবকে তাদের তাঁবেদারবানিয়ে। তার পরবর্তী ষাট বছরে বাংলাকে ঘাঁটি করেই ধাপে ধাপে গোটা ভারত গ্রাস করলেন ইংরেজরা। এখানে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফরাসী পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা। তাঁদের মধ্যে অনিবার্য ভাবেই শক্তিদ্বন্দ্ব বেধে যায়। কিন্তু বুদ্ধি-কৌশলে এবং অ-দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর সহায়তায় শেষ পর্যন্ত টিঁকে যান ইংরেজরাই, আর ফরাসী ও পর্তুগীজরা সামান্য কয়েকটি ছিট-তালুকের অধিকারে সন্তুষ্ট হয়েই পিছু হঠে যান। ১২শ শতকে ভারতে মুসলীম অধিকার বিস্তারের সঙ্গে ১৮শ শতকে এই ইংরেজাধিকার বিস্তারের একটা মৌল পার্থক্য আছে মনে রাখতে হবে। মুসলীমেরাও বাইরে থেকে এসেছিলেন এবং এসেছিলেন ভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের স্বাতন্ত্র্য নিয়েই সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমানরা এই দেশেই বাস করেছেন এবং প্রশাসনের সঙ্গেই তাঁরা দেশের শিল্প বাণিজ্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় একাত্ম হয়ে গেছেন। এদেশের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে গিয়ে আপন দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেন নি। আহমদ শা আবদালী নাদির শা প্রমুখ দস্যুদের কথা ধরছি না, বলছি

মুসলমান শাসকদের কথা। এ জায়গায় ইংরেজদের মন ও দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। গ্রেট বৃটেনের স্বার্থরক্ষা এবং সম্পদ বৃদ্ধির কাজেই তাঁরা ভারতের মাটি ও মানুষকে নির্মম ভাবে শোষণ করেছেন ১৯০ বছর ধরে।

১৭৫৭ সালে হয় পলাশির যুদ্ধ, আর ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হয় স্বাধীন ভারতবর্ষের আবির্ভাব। মাঝের এই দুই শতাব্দীতে ইংরেজ শাসন এদেশে কিছুই করেনি বললে অসত্য কথা বলা হবে। ভারতকে একাত্মিক রাষ্ট্র রূপে এক কেন্দ্রীয় শাসনে আনা ইংরেজের বড় দান। অশোক সমুদ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন আকবর, অনেকেই এ চেষ্টা করেছিলেন। করেছিলেন আউরঙজেবও। কিন্তু আঞ্চলিক ও ধর্মীয় স্বাধিকারের মনস্তত্ত্ব সব ব্যর্থ করেছে। অবিরাম হয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহ। ইংরেজ শাসনেই প্রথম কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে এসে গোটা ভারতবর্ষের প্রশাসন আইন মুদ্রাব্যবস্থা ডাকব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থা ও সরকারী ভাষার অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোর্ট কাছারি অফিস কল-কারখানা যানবাহন বার্তা বিনিময়-ব্যবস্থা ইত্যাদির একালীনতাও ইংরেজেরই সৃষ্টি। অবশ্য এই সব জিনিস বা নগর বিন্যাস পৌর নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা বিকিরণ ইত্যাদি কালের হাওয়ায় এদেশে আপনিই বিবর্তিত হত। তবু ইংরেজের হাত দিয়ে এরা এসেছে, এ ত মানতেই হবে। কিন্তু এই যেমন একটা দিক, তেমনি আছে আর একটা দিকও। ইংরেজরা তাঁদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য চালানর প্রয়োজনে যতটুকু নগর বন্দর কল-কারখানা ও কাজ-কারবার দরকার, ঠিক ততটুকুই করেছেন। তার বাইরে গোটা দেশকে ফেলে রেখেছেন মধ্যযুগীয় অনগ্রসরতার অন্ধকারে। নিজেদের প্রশাসন পুলিশ ও সওদাগরী সংস্থা চালানর জন্যে যতটুকু শিক্ষাবিস্তার প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু করেছেন। ফলে কোটি কোটি নিরক্ষর কৃষক কারিগর ও দেহশ্রমী সাধারণ মানুষরা সম্পূর্ণ পৃথক একটা শ্রেণীরূপে উপেক্ষিত হয়েছেন। তাঁদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েই পুষ্ট হয়েছে ইংরেজ-শাসিত ভারতে শহুরে শিক্ষিত মানুষদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রযাত্রার ইতিহাস। সমস্ত আধুনিকতা ও প্রগতিমূলক কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেও বৃটিশ শাসনের কপালে এ যে কত বড় কলঙ্ক-তিলক, তা উনিশ শতকের মহান ব্যক্তিরা অনেকে বুঝতেও পারেন নি। তাছাড়া ইংরেজ শাসনের ঝলকে তাঁরা এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে সামনের পর্দায় আধুনিকতার লোভনীয় উপকরণগুলি মেলে ধরে, ইংরেজ শাসকেরা তলায় তলায় কি ভাবে দেশকে অর্থনীতিক দিক থেকে রিক্ত শোষিত এবং নিঃস্ব করেছেন এবং তার ফলে কৃষি ও কুটির-শিল্প-নির্ভর,

গ্রামীণ সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়ে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে সর্বহারা শ্রেণীর, তাও তাঁরা খতিয়ে দেখার অবসর পান নি।

২.

কৃষ্ণচন্দ্র রাণী ভবানী প্রমুখ ভূম্যধিকারী, জগৎশ্রেঠ উমিচাঁদ প্রমুখ বণিক এবং মীরজাফরালি শ্রেণীর সেনাধ্যক্ষের মিলিত সহযোগিতাতেই যে এদেশে কোম্পানি শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, একথা ইতিপূর্বে বলেছি। সেই সঙ্গেই দেখিয়েছি যে ইংরেজী-শিক্ষিত নূতন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বিদেশী শাসনের আওতায় গড়ে ওঠা নূতন কালের বাণিজ্য ও প্রশাসনে যেমন পৃষ্ঠরক্ষীর কাজ করেছেন, তেমনি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে নানা দিক ও দেশ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য আহরণ করে নূতন কর্মৈষণা ও জীবন-চিন্তারও অধিকারী হয়েছেন। এই মধ্যবিত্তেরা দেশের জীবন ও সংস্কৃতির আদি মৃত্তিকার সঙ্গে সংস্রব হারিয়ে কতকটা যেন টবে লাগান গাছের মত শূন্যাশ্রয়ী একটি শ্রেণী হয়ে উঠলেন স্বাভাবিক কারণেই। তাঁরা যে চিন্তা ও কর্মের উদ্দীপনা আনলেন দেশে, তা সীমিত হয়ে রইল তাই নগর বন্দর ও শিল্প-শহরগুলির মধ্যেই। গ্রামগুলি তার প্রভাবের বাইরেই রইল। জাতি ও অবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ তার সুফল পেলেন না। বিদেশী শাসনের কূট-কৌশলে বাষ্প বিদ্যুতের সহায়তায় গোটা দেশে যেমন সমভাবে কালোচিত ধারায় শিল্পায়ন হল না, নব যুগের শিক্ষাদীক্ষাও তেমনি সকলের মধ্যে সর্বজনীন ঔদার্যে বিকিরণ করা হল না। তারই অনিবার্য পরিণাম হল শহর ও গ্রামের মধ্যে এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে অদৃশ্য অথচ অনতিক্রম্য এক মহাপ্রাচীর গড়ে ওঠা। গোটা ১৯শ শতাব্দী থেকে ২০শ শতাব্দীর তিন দশক পর্যন্ত এটা ভাঙার কোন লক্ষণীয় প্রয়াসই হয়নি। অথচ এই সময়ের মধ্যে কাজও কম হয়নি দেশে। বড় বড় কাজ যা হয়েছে, তার মধ্যে নতুন বাংলা সাহিত্যের জন্মই বোধহয় সব চেয়ে গণনীয়। প্রাচীন বাংলায় পদ্যই ছিল সাহিত্যের একমাত্র মাধ্যম। জীবনী ভ্রমণ-কাহিনী ইতিবৃত্ত দার্শনিক বিচার চিকিৎসাবিধি গণিত, সব পদ্যে লেখা হত। গদ্য জন্মাল নূতন কালে। তারই পিছু পিছু এল ছাপাখানা, এল সংবাদপত্র, ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য নাটক উপন্যাস এবং একে একে উঠতে লাগলেন রামমোহন ডিরোজিও বিদ্যাসাগর মধুসূদন বঙ্কিম প্রমুখ দিকপালেরা, যাঁরা জাতিকে দ্রুত সেকাল থেকে একালে নিয়ে এলেন। সাহিত্যে এই জাগৃতির বহিঃপ্রকাশটি যেমন লক্ষ্য

করা যায়, তেমনি সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও তার অভিব্যক্তি দেখা যায় যথেষ্ট পরিমাণেই। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, জাতিভেদ অপসারণ, বিজ্ঞান ও ইতিহাস-ভিত্তিক এবং জীবিকামুখী শিক্ষাদীক্ষা বিকিরণ, নারী-পুরুষে সমানাধিকার বণ্টন, কালোচিত নানা নূতন সংস্কারের পক্ষেই আন্দোলন হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু ছোট-বড় নির্বিশেষে সারা দেশ দুহাত তুলে স্বাগত করতে পারেননি এদের। বেশীর ভাগই আঁকড়ে রেখেছেন তাঁদের সাবেকী দিনের প্রথা ও প্রত্যয়গুলিকে, কেননা যুগের আলো পৌছায়ই নি তাঁদের কাছে। এই জন্যে যাঁরা এই জাগৃতিকে রেনেসাঁস বলে চিহ্নিত করেন, তাঁদের সঙ্গে একমত হতে রাজি হন না অনেকেই। তাঁদের অন্যতম এই লেখকও।

১৪শ থেকে ১৬শ শতকের মধ্যে ইউরোপে যে রেনেসাঁস বা জাগৃতি এসেছিল, তা হল তাঁদের পুরুষানুক্রমিক গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতির আলোয় জেগে ওঠা সার্বিক এক জীবন চেতনা, যা ক্যাথলিক ইউরোপের সাহিত্যে কলা, কৃষ্টি জীবন-চর্যা ও বিশ্বানুসন্ধিৎসার মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। ইউরোপের সব দেশ ও জাতিই তার ফলে খ্রীষ্টান গির্জার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নূতন কালের মাটি স্পর্শ করেছিল। এরপর উঠেছিল ইংলণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও প্রোটেষ্টান্ট জার্মানীতে রিফর্মেশন বা সংস্কার আন্দোলন এবং তা রেনেসাঁসের জীবনা-বেগকে ধর্ম নীতির কড়াকড়ি দিয়ে বেশ কিছুটা প্রতিহত করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু আগের অধ্যায়ে অনেকটা সময় জুড়ে সৃষ্টির জোয়ার চলে গেছে বলেই, তা সর্বগ্রাসী প্রতিক্রিয়ার বন্ধ্যাত্ব ডেকে আনে নি। এর সঙ্গে তুলনায় আমরা কি দেখি আমাদের দেশে? সম্পূর্ণ ভিনদেশী একটা শিক্ষার অনুপ্রেরণায় মুষ্টিমেয় মানুষ যাঁরা সমগ্র জনজীবন থেকে ছেঁকেআনা ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ মাত্র, জেগে উঠলেন এবং জাগরণী মন্ত্র ছড়ালেন শুধু নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে। একে রেনেসাঁস বলব কেন? তাছাড়া ফলের দিক থেকে বিচার করলেও একে যথেষ্ট সার্থক বলা যায় না। কারণ ১৯শ শতকের উপরোক্ত সংস্কার-প্রচেষ্টা-গুলির প্রায় কোনটারই প্রয়োজন শেষ হয়নি আজও। সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে চক্রাবর্তে একটানা ঘুরছে প্রত্যেকটা সমস্যাই। বিধবার বিবাহ এখনো স্বচ্ছন্দে হয় না। জাতিভেদ আজও দূর হয়নি। নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষা ও জীবিকার অধিকার আজও সমভাবে বণ্টিত হয়নি। সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যাপ্তি এখনো হয় নি। শিক্ষা ও জীবিকার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে

হবে, তার ঠিক এখনো নেই। অর্থাৎ জীবনচিন্তার ক্ষেত্রে কমবেশী এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘুরপাক খাচ্ছেন যেন দেশের অধিকাংশ নর-নারী।

এই সঙ্গে আর একটা জিনিস ভাবতে হবে। ইউরোপে রেনেসাঁসের অনেকটা পরে উঠেছিল রিফর্মেশন এবং তা নব্য চেতনার ধার ষোল আনা ভোঁতা করে দিতে পারে নি। কিন্তু আমাদের পোড়া সমাজে বস্তুভিত্তিক জাগৃতি সামান্যই কার্যকর হয়েছে। প্রগতির হাত ধরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে ধর্ম পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন। তার মানে এসেছে হিন্দুধর্ম অভ্যুত্থানের রকমারি সক্রিয় প্রয়াস। একদিকে উঠেছেন ব্রাহ্ম সমাজ এবং খ্রীষ্টান গির্জার বিকল্পে তৈরি উপাসনা মন্দিরের খবরদারিতে তাঁদের মধ্যে নর-নারীর মিলিত প্রার্থনা, প্রণয়-বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতে শুরু করেছে, অন্যদিকে উঠেছেন রামকৃষ্ণ সমাজ এবং পরমহংস সাক্ষাৎ ভগবান বলে গৃহীত ও প্রচারিত হয়েছেন ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা। প্রসন্নকুমার ঠাকুর রাধাকান্ত দেব রাণী রাসমণি প্রমুখের পৃষ্ঠপোষিত প্রতিক্রিয়াপন্থী এই সব আন্দোলনের মুখে নিরীশ্বরবাদী বা আরো খাঁটি অর্থে সংশয়বাদী বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলন আর কতটা অগ্রসর হবে? তাঁরা যেটুকু গঠনের কাজ করেছেন, হিন্দু মহিমাবাদীরা তা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছেন অল্প চেষ্টাতেই, কারণ নিরক্ষর সমাজে জমি ত তৈরিই ছিল। অতএব একের পর এক অবতারকল্প মানুষরা উঠেছেন এবং এক ধাপ দুধাপ করে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন সমস্ত সংগঠনের কাজ।

তবু যে কিছু সমাজ প্রগতি হয়েছে, সেটাও কম নয়। দেশের দিকে তাকিয়ে আজ দেখি, রেলপথ ডাকপথ তার বেতার দূর দূরান্তকে যুক্ত করেছে। আধুনিক শৌচাগার নলকূপ পাকা সড়ক বৈদ্যুতিক আলো একালীন যানবাহন আজ গ্রামেও দেখা দিচ্ছে। গড়ে উঠেছে হাইস্কুল স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সতর্কভাবে নজর করলে দেখা যাবে হাইস্কুলে সহাধ্যয়ন এসেছে, তার ফলে স্বেচ্ছাবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ দুইই হচ্ছে। এরই ব্যাপ্তি থেকে ক্রমশ জাতিভেদ মুছে যাবে। যাবে বৈধব্যের আঁটুনি। তবে কথাই আছে, বিবর্তনের বিলম্ব শেষ পর্যন্ত ডেকে আনে বিপ্লব। অন্যথায় ঘটায় পচন। আমাদের বেলা এ দুইয়ের কোনটা হবে, তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে কোন লাভ নেই। তবে ২০শ শতাব্দীর সাতের ও আটের দশকে সংঘটিত এই যে ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলোর কথা এখানে বলা হল, এই অধ্যায় থেকে পিছু হঠে আবার

আমাদের গোড়ার দিকে যেতে হবে, যেহেতু নূতন কালের সবচেয়ে বড় দানই হল রাজনীতিক চেতনার ব্যাপ্তি, যার কথা এখনো বলা হয় নি। সে ইতিহাস-বলাই বাহুল্য, এখনো খুব চমকপ্রদ, যদিও তা লিখেছেন ও বলেছেন বহুজনই।

৩.

বৃটিশ শাসিত ভারতে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় যেমন বাণিজ্য ও প্রশাসনে বিদেশী শাসকদের প্রধান সহায়ক হয়েছেন, দেশের কৃষক ও দেহশ্রমী মানুষরা তেমনি তাঁদের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীকে পরিপুষ্ট করেছেন। দেশবাসীর বৃহৎ একটা অংশের এই ঐকান্তিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন বলেই, মুষ্টিমেয় ইংরেজের পক্ষে এতবড় দেশকে শৃংখলার সঙ্গে শাসন করা সম্ভবপর হয়েছিল। আগেই বলেছি অবশ্য যে তাঁদের শাসননীতি ছিল সুচতুর শোষণনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা যে সব নগর বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, তাতে কল-কারখানা অফিস,আদালত, স্কুল-কলেজ,কাজ-কারবার, সবই গড়েছিলেন তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখে। একালীন উৎপাদন যন্ত্র, যানবাহন ও বার্তা-বিনিময় ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, সেও প্রধানত নিজেদের প্রয়োজনেই।

তা সত্ত্বেও দেশের জীবন ও কর্মের রাজ্যে আধুনিকতা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এসবের সূত্র ধরেই এবং সরকারী চাকুরে উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার অধ্যাপক প্রভৃতি নানা বৃত্তি ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়ে শিক্ষিত সমাজ দেখা দিয়েছেন একটি নূতন শ্রেণীরূপে। তাঁরা একদিকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে দেশ বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধ্যান ধারণা আহরণ করেছেন যেমন, অন্য দিকে তেমনি দেশের নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতি ও আচার সংস্কার থেকে অনেকটা দূরেও সরে গিয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই। এই ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অংশ পুলিশের ওপরওয়ালা কিংবা জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি ও মুনসেফ, এক কথায় যারা সরকারী মহল রূপে পরিচিত, তাঁদেরই আত্মীয় পরিজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা আবার শিক্ষক সমাজ-সংস্কারক সাহিত্যিক সাংবাদিক এবং স্বদেশভক্তরূপে নূতন ভারতকেও গড়েছেন। বিদেশী শাসনের নাগপাশ ছেদনের ও জাতীয় সংহতি লাভের উদ্দীপনা এঁরাই সৃষ্টি করেছেন। কৌলীন্য ও হিন্দুয়ানির নামে প্রচলিত বহুবিবাহ সতীদাহ অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি রহিতের এবং বিধবা বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ নারীর শিক্ষা ও আর্থনীতিক স্বাধিকার

ইত্যাদি প্রবর্তনের পক্ষে আন্দোলনও এঁরাই করেছেন। তার মানে দাসত্বের শৃংখল কায়েম করা এবং তা ভেঙে নূতন প্রাণশক্তিতে বেরিয়ে আসার প্রয়াস, দুই-ই এঁদের দান।

এই নূতন যুগে বিরচিত সাহিত্যের কথা ত আগেই বলেছি। এ সাহিত্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি দেখি আমরা? প্রথমত দেখি দেশ ও মানুষকে অভিন্ন করে চেনা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে মানুষের দুঃখ কষ্ট ও আঘাত সংঘাতের কথা নেই তা নয়। কিন্তু সেই মানুষের জীবন ও জন্ম-মৃত্যুর লীলাস্থল যে দেশ, তার নামগন্ধ কোথাও বিশেষ মেলে না। ১২শ শতকে হিন্দু শাসন শেষের অধ্যায় থেকে ১৮শ শতকে বৃটিশ শাসন শুরুর অধ্যায় পর্যন্ত, দীর্ঘ ছশো বছরে কম ভাঙাগড়া ও ওলটপালটের ধাক্কা ত যায় নি দেশের ওপর দিয়ে। কিন্তু রাজপুত শিখ মারাঠী ও বাংলা লোকগাথায় তার অল্প-স্বল্প বার্তা থাকলেও, বাংলার শিষ্ট সাহিত্য এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। তাতে হয় মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে প্রতিহত করে বিভিন্ন লোক-দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, নয় অনবদ্য গীতি কবিতার পোশাকে ঢেকে অবলিত যৌনতার কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। আগেই বলেছি এই ছশো বছরের এক প্রান্তে গীতগোবিন্দ, অন্য প্রান্তে বিদ্যাসুন্দর জাতীয় কিস্‌সা কাহিনী এবং তা সারা ভারতেই। স্বাধীন ইংরেজের এবং ইংরেজীর মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাধীন জাতির সাহিত্য পড়েই প্রথম ভারতবাসী দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা অর্জন করেন। শুধু তাই নয়, এই সাহিত্য এবং তার পরিপোষক বিজ্ঞান ইতিহাস অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি যা বিদেশী শাসনের অনুষঙ্গরূপে বিদেশী শিক্ষার ভিতর দিয়ে আয়ত্ত করেন তাঁরা, তাই জাগায় তাঁদের মধ্যে কতকগুলি নূতন মূল্যবোধ এবং তা শিক্ষিত সমাজের জীবনচর্যায় নানা ভাবে প্রকাশমানও হতে থাকে। নারীকে জ্ঞান ও কর্মের পথে পুরুষের সমানাধিকার-সম্পন্ন সহযাত্রীরূপে দেখা, নিগৃহীত নীচু সোপানের মানুষের ব্যথাকে শুধু দরদের সঙ্গে দেখা নয়, সর্বতোভাবে তা দূরীকরণে অবহিত হওয়া, দেশ ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্ব অনুভব করা, ইত্যাদি নানা নূতন চিন্তার আবির্ভাব ঘটে এই সময়ে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ভাষা-গুলির সাহিত্য থেকে এই সব চিন্তা শিক্ষিত মানুষদের মানসিকতায় সঞ্চারিত হলেও, বাস্তবে পরিবর্তন কমই হয়েছে, কারণ সমাজের অর্থনীতি ছিল, পুঁজিবাদের কবলে আবদ্ধ এবং শিক্ষাদীক্ষা ব্যাপ্ত ছিল নির্দিষ্ট গণ্ডীতে সীমিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটা দরকারী কথা বলে রাখতে হবে। প্রথম ইংরেজী শিক্ষার আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় যখন নব্য সমাজের, তখন অনিবার্য কারণেই তাঁদের বেশীর ভাগই জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও আচার সংস্কারের বিরোধী হয়ে ওঠেন। কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান হন, কেউ ঝোঁকের মাথায় ইংরেজ বা ফরাসী মহিলার পাণিগ্রহণ করে বসেন। কেউ বা নিষিদ্ধ খাদ্য পানীয় বাহাদুরি হিসাবে উদরস্থ করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে বেন্থাম হিউম মিল লক হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ মনীষীর চিন্তাধারা যেমন ছায়াপাত করতে থাকে, তেমনি নিছক যুগের হাওয়াও তাঁদের পদে পদে বিদ্রোহী করে তোলে। কিন্তু এই বিদ্রোহ যে খুবই উপর স্তরের জিনিস ছিল, তা বোঝা যায় পরিণত বয়সে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই গুড় গুড় করে রক্ষণশীলতার শিবিরে এসে ঢোকা দেখে। কলকাতা তখন বৃটিশ ভারতের রাজধানী, তাই এখানেই হয়েছিল এই নব্য সম্প্রদায়ের সর্বাধিক্ প্রাদুর্ভাব।

এঁদের বলা হত ইয়ং বেঙ্গল। এই ইয়ং বেঙ্গলদের অন্যতম পাদ্রী কৃষ্ণমোহন পরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন হিন্দুদর্শন। খ্রীষ্টান মধুসূদন রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নিয়ে অনুপম কাব্য নাটক লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। রাজনারায়ণ বসু হয়েছেন সম্মানিত ব্রাহ্ম আচার্য। এই রূপান্তর কেন হল? হল তার কারণ ইউরোপ ঠিক ঐ সময়ই হঠাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করে। বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত গীতা ভাগবত ও পুরাণাদির এবং কালিদাস ভবভূতি বাণভট্ট প্রমুখের রচনার তাঁরা নূতন করে যে মূল্যায়ন করতে থাকেন, তাতেই দেশী সাহেবদের মোহাবরণ ভেঙে যায়। তাঁরা দেখেন খোদ সাহেবরাই যেখানে হিন্দুয়ানির গুণগ্রাহী হচ্ছেন, সেখানে আমরা তাকে বোকার মত উপেক্ষা করি কেন? অর্থাৎ ব্যাপারটা ঘটে কতকটা বিপথগামীর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন রূপে। এই নূতন আত্মোপলব্ধির উত্তাপে যে স্বাজাত্যবোধ এতদিন তলায় তলায় ধোঁয়াচ্ছিল, তা তীব্র হয়ে ওঠে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এবং সাহিত্য ও রাজনীতিকে তা গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। এদিকে ক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিক্রিয়ারূপে ধর্ম পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনও শক্তি সঞ্চয় করে এরই ফলে। উপনিষদ ও বেদান্তভিত্তিক যুক্তিবাদী ব্রাহ্মধর্ম মাথা তোলে, মাথা তোলে নূতন আকারে পুরাতন শাক্ত ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদ। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়

আন্দোলন তারপর চলতে শুরু করে পরস্পর হাত ধরাধরি করে।

৪.

ইংরেজ শাসিত ভারতে শিক্ষিত ভারতবাসীর একাংশ যেমন রাজভক্ত তাঁবেদার রূপে প্রভুজাতির আনুগত্য করেছেন, আর একাংশ তেমনি শিক্ষায় সংস্কৃতিতে শিল্পে বাণিজ্যে দেশকে সমুন্নত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখেছেন এবং একই সময়ে ও একই মধ্যবিত্ত ঘরে দুই শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, একথা আগেই বলেছি। এই শেষোক্ত শ্রেণীকে আমরা সাধারণভাবে দেশপ্রেমিক নামে চিহ্নিত করতে পারি। তাঁদের মধ্যে শিক্ষক লেখক সংস্কারক সাংবাদিক, নানা ভূমিকার মানুষই দেখা যায়। তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবাই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, তবু সব কাজের আদি লক্ষ্য তাঁদের যেহেতু ছিল দেশকল্যাণ বা দেশবাসীর হিত সাধন, তাই তাঁদের সকলকে মোটা একটা অভিধায় বাঁধা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। এই দেশপ্রেমিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কি চেয়েছিলেন? ইংরেজ বর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষ কি তাঁদের কাম্য ছিল? না। তাঁরা চেয়েছিলেন এদেশ জ্ঞানে কর্মে বিত্তে সামর্থ্যে অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হবে,আর দেশবাসী পাবেন বৃটিশ রাজমুকুটের অধীনে ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসন, তদানীন্তন ক্রাউন কলোনিগুলোর মত। তার মানে প্রশাসন আইন শৃংখলা শিক্ষা স্বাস্থ্য জীবিকা ব্যবসা বাণিজ্য খাদ্য ঔষধ যানবাহন মুদ্রা যোগাযোগ ও বার্তা বিনিময় ইত্যাদি সম্পর্কীয় যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ভারতবাসীর হাতে থাকবে, আর অভিভাবকরূপে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি থাকবেন মাথার ওপর। যুদ্ধ বিগ্রহ বৈদেশিক সম্পর্ক বহির্বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক মুদ্রামান-অনুসরণ ইত্যাদি নির্বাহিত হবে তাঁর খবরদারিতে। অর্থাৎ সর্বাত্মক স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার যেগুলি, তা ইংরেজের হাতে রেখেই ১৯শ শতকের শিক্ষিত ভারতবাসী নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। এ নিছক ইংরেজ ভক্তি, না আত্ম-ক্ষমতায় অপ্রত্যয়, জানি না। তবে এই ছিল তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের মানসিকতা। অবশ্য তাই বলে অ-দেশপ্রেমিক তাঁরা ছিলেন না, এ বোঝা যায় সমাজকে কলুষমুক্ত করার কাজে তাঁদের ঐকান্তিক প্রয়াস দেখে। রাম-মোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, রামগোপাল, হরিশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, নানা জনেরই নাম করা যায় এই প্রসঙ্গে।

হিন্দু মেলার সূচনা থেকে কংগ্রেসের গোড়ার পর্ব পর্যন্ত শিক্ষিত সমাজের রাজনীতি এই সীমিত গণ্ডীটুকুর মধ্যে একটানা আবর্তিত হলেও, জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ, দেশের নিরক্ষর চাষী ও দেহশ্রমী সাধারণ মানুষেরা এবং বিশেষ বিশেষ আদর্শে দৃঢ়প্রত্যয় কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মানুষও বিদেশী শাসনের সূচনা থেকেই কিন্তু তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ চালিয়েছেন। পিণ্ডারী ও ঠগী শ্রেণীর আধা-দস্যুদের কথা বাদ দিলেও, সাঁওতাল বিদ্রোহ চুয়াড় বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, বাংলাতেই একের পর এক করে কত যে বিদ্রোহ হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান তৈরি করা সহজ নয়। এমনি হয়েছে ভারতের আর সব রাজ্যগুলিতেও। ইংরেজাধিকারের একশো বছর পূর্ণ হয় যখন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, তখন হয় সিপাহী যুদ্ধ। গদীচ্যুত ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও ইংরেজের ফৌজে কর্মনিরত দেশী সিপাহীরা এই যুদ্ধে অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়েছিলেন, আর এর লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল মুঘল সম্রাটের অকর্মণ্য বংশধর বাহাদুর শাহকে ফের দিল্লীর মসনদে এনে বসান, তাই অনেকে একে ঠিক জনগণের মুক্তিযুদ্ধ বলেন না। কতকটা সামন্ততান্ত্রিক চেহারা ছিল ঐ অভ্যুত্থানের সন্দেহ নেই। কিন্তু আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ জুড়ে প্রস্তুতি হয়েছিল এজন্যে এবং পেশোয়া নানাসাহেবের দূত রূপে আজিমুল্লা খাঁ একদিকে যেমন গ্যারিবল্ডীর কাছে যান এই যুদ্ধে বৈদেশিক সাহায্য চাইতে, অন্যদিকে কুনোয়ার সিং তেমনি সাধারণ মানুষকেও দলে দলে নামাতে সমর্থ হন এই যুদ্ধে। তাই একে নিছক রাজন্যবর্গের যুদ্ধ বলাও ঠিক নয়। কার্ল মার্কস ত ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেই অভিহিত করেছেন একে। ইংরেজের অস্ত্রবল সব বিদ্রোহ-ই বিধ্বস্ত করে যদিও, কিন্তু দেশবাসী সাধারণ মানুষরা কি চেয়েছিলেন তা ভুললে চলবে না। লক্ষণীয় যে সিপাহী যুদ্ধের মত ব্যাপারে শিক্ষিত সম্প্রদায় কিন্তু নিস্পৃহ দর্শক মাত্র হয়ে ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত কবিতায় নানাসাহেব ও লছমীবাইকে জঘন্য ভাষায় গালাগালি করেছিলেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে ধৃষ্টতা দেখানর জন্যে। কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই কথা সগর্বে ঘোষণা করেন যে আমরা শিক্ষিত মানুষরা কিন্তু কেউ অণুমাত্র অবিশ্বস্ততা করিনি ইংরেজের সঙ্গে। নেটিভ ফাইডেলিটি নামক বই তারই দলিলস্বরূপ। নির্মম হস্তে মিউটিনি দমন করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এর পর ভারতের শাসনভার তুলে দেন সরাসরি বৃটিশ সরকারের

হাতে। আর ভারতবাসী অনুদানরূপে পান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান।

কংগ্রেস গঠন করে ইংরেজরা মনে করেছিলেন এবং তাঁদের মনে করায় ভুল ছিলনা, যে শিক্ষিত ভারতবাসীরা এর মাধ্যমে নিজেদের দাবী-দাওয়া নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের সুযোগ পেলে এবং মাঝে মাঝে সেই সব দাবির দু-চারটি সরকারের তরফ থেকে পূরণ করা হলেই তাঁরা তৃপ্ত হবেন। আর তাঁদের রাজনৈতিক আনুগত্য পাওয়া গেলে, তারই প্রভাব জনগণ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে। কিন্তু কার্যত তা হয় নি। কংগ্রেসের মধ্যেই একদিন লাল-বাল-পাল গোষ্ঠী উঠেছেন, যাঁরা আবেদন নিবেদনের রাস্তা ছেড়ে সক্রিয় উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলেছেন। আর কংগ্রেসের বাইরে ত বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির জন্যেই দিকে দিকে পা বাড়িয়েছেন সন্ত্রাসবাদীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ [ ১৯১৪-১৮ ] থেকে দেশের রাজনীতিক কর্মপ্রবাহ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এই ভাবে। সক্রিয় পন্থার সমর্থকরা কংগ্রেসে ঠাঁই পান নি, সেখানে গান্ধী প্রবর্তিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কর্মসূচীই নিষ্ঠার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। তবে শহুরে মানুষদের বক্তৃতামঞ্চ থেকে দেশের রাজনীতিকে গান্ধীই গ্রামের মাটিতে নামিয়ে এনেছেন এবং কংগ্রেসকে তিনিই করেছেন প্রকৃত জনপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাঁর কর্মনীতির আদর্শমুখিনতা সক্রিয় পন্থার সমর্থকরা কোন দিন গ্রহণীয় মনে করেন নি। সুভাষচন্দ্র অবশ্য কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই গান্ধীনীতির প্রতিকূলতা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে এ জন্যে বহিষ্কৃত হয়েছেন। আর বিপ্লবীরা [ ? ] পৃথক ভাবে গুপ্ত সংগঠনের পথেই তাঁদের কর্মশক্তি নিয়োজিত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের [ ১৯৩৯-৪৫ ] অবসানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে প্রতীচ্যের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীই একে একে তাদের পাততাড়ি গুটিয়েছে। শেষ হয়েছে ইংরেজের ১৯০ বছরব্যাপী ভারতশাসন। এ স্বাধীনতা কে এনেছেন? কে, তা এক কথায় বলা কঠিন। আগষ্ট বিদ্রোহ, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দের মণিপুর অভিযান, বোম্বাই নৌ বিদ্রোহ, জব্বলপুর বৈমানিক বিদ্রোহ, সারা ভারত রেল ও ডাক-তার ধর্মঘট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ঘটনা একদিকে, অন্য-দিকে দেশের অভ্যন্তরে বামপন্থী মতবাদের দ্রুত ব্যাপ্তি এবং দেশের সীমান্তের বাইরে লাল চীনের সুসংহত প্রস্তুতি এবং বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার বিজয়লাভ লক্ষ্য করেই ইংরেজরা বুঝেছিলেন, এখান থেকে পালান দরকার। অতএব শেষ কামড় হিসাবে দেশটাকে তাঁরা দ্বিধা-বিভক্ত করে এবং কায়েমি স্বার্থ ও

পুঁজিবাদের পোষক কংগ্রেসের হাতে স্বাধীন ভারতের ও মুসলীম লীগের হাতে পাকিস্তানের ভার ন্যস্ত করেই তাঁরা পালালেন। কাজেই স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি, না পেয়েছি, সে প্রশ্ন থাকছেই। তবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে, সে অহিংস সহিংস দুই বিভাগেই, পৌরুষ, ত্যাগ ও আন্তরিকতার নিদর্শন কম মিলবে না, এ কথা সসম্ভ্রমে স্বীকার করতেই হবে।

॥ প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়া ॥

১৯শ শতকে একদিকে যখন সমাজে প্রগতিমূলক নানা উদ্যোগ আয়োজন চলছে, সাহিত্য ও কলাকৃষ্টির মাধ্যমে রকমারি নূতন চিন্তা ও জীবনবোধ দিকে দিকে ব্যাপ্ত হচ্ছে, হিংস-অহিংস উভয় পথে স্বাধীনতা-সংগ্রাম শক্তি সঞ্চয় করছে, ঠিক তখনি অন্যদিকে এই সব শুভ প্রচেষ্টাব ধার ভোঁতা করে ফেলার জন্যে শুরু হয় ব্যাপক ধর্ম পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন, এ কথা আগেই বলেছি। সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য রাজনীতি, সব কিছুব মধ্যে ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তা চরম প্রতিক্রিয়ার মূর্তিতে প্রকাশমান হয়, যদিও বিচার-প্রমাদবশে অনেকেই তাকে জাতীয় ঐতিহ্যের উজ্জীবন বলে স্বাগত জানান এবং তার ফলে বিপ্লব প্রতিহত হয়ে ধরে প্রতিবিপ্লবের পথ। আমি বলছি ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, আর্য মিশন প্রভৃতির কথা, যার প্রত্যেকটার জন্ম হয়েছিল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে স্ব-কেন্দ্রে আকর্ষণের জন্যে। তবু ব্রাহ্মসমাজকে অনেকে প্রগতির পতাকাবাহী বলে প্রচার করেন কেন? তার দুটো কারণ। প্রথমত নারীর অবরোধ মোচন এবং শিক্ষা ও স্বেচ্ছাবিবাহের অধিকার অনুমোদন তাঁদের নীতির অন্তর্গত ছিল। দ্বিতীয়ত সাহিত্য সঙ্গীত ও নাটকের চর্চা বিষয়ে তাঁদের সজাগতা ছিল এবং রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র অরবিন্দ পর্যন্ত, এ যুগের প্রধান ব্যক্তিরা অনেকেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রগতিব সমর্থক কি ছিলেন ব্রাহ্মরা? জাতিভেদ অপসারণ কি তাঁরা চাইতেন এবং নিজেদের সঙ্গে নিগৃহীত নীচু সোপানের মানুষদের সমাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন? দেবেন্দ্রনাথের আদি সমাজ এবং কেশবচন্দ্রের নববিধান, কেউই তা চান নি। উপনিষদ ও বেদান্তের দোহাইয়ে তাঁরা নিজেদের মতো এক-একটি ইষ্ট-গোষ্ঠীই তৈরী করে নিয়েছিলেন। একমাত্র শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ সমাজেই ঠাঁই হয়েছিল নীচু—তলার গরীব মানুষদের।

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ উভয়েই প্রভূত বিত্ত ও সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আয়েস সম্বন্ধে মোটেই অনবহিত-চিত্ত ছিলেন না। ধর্মাচার্য-সুলভ বৈরাগ্য বা অনাসক্তি তাঁদের জীবন এবং কর্মে আদৌ প্রতিফলিত হয়নি। মহর্ষি অভিধা-সম্পন্ন হলেও দেবেন্দ্রনাথ পত্নী ও পুত্র-কন্যা-পরিবৃত সম্পন্ন জমিদার ছিলেন। যজ্ঞসূত্র, বামনাই ও নাবালিকার বিবাহ সমর্থন করার দরুণ, তাঁর অনুগামীরা অনেকে পিছু হঠে গিয়েছিলেন দল থেকে। তাছাড়া লক্ষণীয় যে বস্তুবাদী ছিলেন বলে, অক্ষয়কুমার দত্তকে তিনি তত্ত্ববোধনীর সম্পাদক পদে বহাল রাখেন নি। ব্রহ্মানন্দ নামে কেশবচন্দ্র আবার প্রেরিত-পুরুষ-সুলভ দৈববাণী প্রচার করতেন। জানি না ব্রহ্মকে ব্রহ্মময়ী সাজিয়েছিলেন তিনি কি জন্যে। রামকৃষ্ণ প্রভাবে কি? অথবা দুটি রাজ-পরিবারে দুই কন্যাকে বধূরূপে পাঠানর উদ্দেশ্যে কি? শিবনাথ শাস্ত্রী অনেকটা সোজা মানুষ ছিলেন, ছিলেন কিছুটা গণতান্ত্রিকও। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম সার্থক সমাজ-বিবর্তনের সহায়ক হয় নি। বরং কতকগুলি কৃত্রিমতা আর অলীক প্রত্যয়ের আবর্জনায় যথার্থ অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধই করেছে। রামকৃষ্ণ মিশনও রোগ-পরিচর্যা, সমাজসেবা এবং শিক্ষা বিকিরণের কাজে অগ্রণী হয়ে অনেকের প্রশংসার্হ হয়েছেন। কিন্তু তাঁরাও প্রগতির নামে প্রতিক্রিয়ার মুঠিকেই শক্ত করেছেন, পরমহংসকে ঈশ্বর-পুরুষ সাজিয়ে, দ্বিতীয়ত তাঁর ও তাঁর সহধর্মিণীর পুজো প্রবর্তন করে, তৃতীয়ত গৈরিক ও সন্ন্যাসের আবরণে পার্থিব সুখশান্তি ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাকে সযত্নে লালন করে। রামকৃষ্ণ পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও জাতির ধর্মাচার্যদের মতই সমাধিমগ্ন হতেন এবং দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে বিবিধ তত্ত্বকথা উচ্চারণ করতেন! বাস্তব বিচারবুদ্ধির নিরিখে এ জিনিসকে আমরা কি বলব? কি বলব রামমন্ত্র জপ করতে করতে তাঁর লাঙ্গুলোদ্গম বা গোপীভাবে আরাধনা করতে করতে তাঁর মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া সম্পর্কীয় গল্পকে? সারদানন্দ প্রণীত এবং সরকারী ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন অনুমোদিত লীলাপ্রসঙ্গে কে-না পড়েছে এসব? স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে নিশ্চয় প্রখর একটি ব্যক্তিত্ব ছিল, ছিল একটি সতেজ কল্যাণ দৃষ্টি, যা তিনি আহরণ করেছিলেন তদানীন্তন ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান থেকে। কিন্তু পরমহংস-প্রভাবিত অতীন্দ্রিয় সাধনার আবর্তে পড়ে তিনিও দোটানার শিকার হয়েছেন। একদিকে বলেছেন সমাজতন্ত্রের কথা, অন্যদিকে প্রচার করেছেন গুরুবাদ মোক্ষবাদ।

তথাপি বিবেকানন্দের চিন্তায় স্বদেশ কল্যাণের একটি আর্তি ছিল, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত আনন্দমঠের আদর্শে বেলুড় মঠ স্থাপন করে ঐ একই আদর্শ অনুযায়ী আনন্দ নামধারী গৈরিক সন্ন্যাসীদের দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানর স্বপ্ন হয়ত দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর গুরুভ্রাতারা সে পথ যে সম্পূর্ণ পরিহার করেছিলেন, তা বোঝা যায় বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মেলামেশা করায় তাঁকে মিশনের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করতে বাধ্য করান দেখে। আর্যমিশনের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ স্বামীর জীবন ও কর্মের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু জাতীয়বাদ থেকে পূর্বভারতে যে রাজনৈতিক চেতনার গোড়াপত্তন হয়, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে দয়ানন্দ এবং শালিগ্রাম স্বামী প্রমুখের উদ্যোগেও সেই একই জিনিস হয়েছিল। এই সংকীর্ণ ও একান্তভাবে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জাতীয়তার উদ্ভব ও ব্যাপ্তিই উনিশ শতকীয় ধর্ম-পুনরুজ্জীবনের প্রধানতম ক্ষতিকর ঘটনা। বিজ্ঞান ও ইতিহাসভিত্তিক যে জীবন-চিন্তা ও জগৎ-জিজ্ঞাসা জেগেছিল মানুষের মনে, নূতন একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্রবে এসে, তার মর্মমূল সম্পূর্ণ শিথিল করে দিয়েছে এই সব এবং দিকে দিকে উদ্ভূত ছোট বড় আরো নানা ধর্মীয় আন্দোলন। মানুষ নূতন করে গুরু মোহান্ত ও অবধূতদের মানতে এবং পূজা উপাসনা ও যোগযাগে সময়ক্ষেপ করতে অভ্যস্ত হন এ সবের ফলে। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ত এইভাবে বাধা পেয়েছেই, পরবর্তীকালের রাজনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টারও সর্বনাশ হয়েছে এ থেকেই। কিন্তু সে কথা পরের অধ্যায়ে বলব। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে দয়ানন্দ স্বামী বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন এবং সেই বৈদিক ধর্ম অন্য সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে শুধু বিরূপ নয়, সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধাশীল। তবে দয়ানন্দ একটা সংকার্য করেছেন। সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থে তিনি ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না এবং ষট্‌চক্র ভেদের নির্বোধ প্রত্যয়কে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তথাকথিত যোগ-শক্তির সাহায্যে অণিমা লঘিমা ঈশিত্ব প্রভৃতি লাভ হয় বলে যে ধারণা নৈষ্ঠিক মহলে বহুকাল থেকে চলিত আছে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের পড়ুয়া দয়ানন্দ বলেছেন, তার কোনই বাস্তব ভিত্তি নেই।

২.

আগের অধ্যায়ে ধর্ম পুনরুজ্জীবন ও তার প্রগতিবিমুখ ভূমিকা উনিশ শতকীয় সংস্কৃতির কি দারুণ অনিষ্ট করেছে, তার আভাস দিয়েছি। বিষয়টি এইবার

বিশদভাবে ব্যাখ্যা করব। কিন্তু তার আগে কি কি কারণে দেশে ধর্ম পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, তাএকটু বলা দরকার। আমরা দেখিয়েছি খ্রীষ্টান মিশনারিরা এদেশে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণের সহায়ক নানা স্মরণযোগ্য কাজ করেছিলেন যেমন, তেমনি এসবের আড়ালে দাঁড়িয়ে ধর্মান্তরণের কাজও করে যাচ্ছিলেন তাঁরা সুকৌশলে। সামাজিক অসাম্য ও দুর্ব্যবহারে ক্লিষ্ট নীচু সোপানের হিন্দু নরনারীর বেশ বড় একটা অংশ এই সময় খ্রীষ্টান হন তাঁদের প্ররোচনায়। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গুডইভ চক্রবর্তী এবং ডবলু সি ব্যানার্জীরা খ্রীষ্টান হন নিতান্তই ফ্যাশনের ঝোঁকে ও একটা নূতন কিছু করার মোহে। মিশনারিরা তাঁদের ফাঁদে ফেলে খ্রীষ্টান করেননি। মোটের ওপর কারণ যাই হোক, মিশনারিদের এই ধর্মান্তরণের উদ্যম দেখেই সম্পন্ন হিন্দুরা একটা গ্রহণযোগ্য বিকল্প ব্যবস্থা গড়ার কথা ভেবেছিলেন। সেই ব্যবস্থাই হল ব্রাহ্ম সমাজ। গির্জার প্রতিরূপ হিসাবে তাই তৈরি হল তাঁদের উপাসনার মন্দির। এল কনগ্রিগেশনাল প্রেয়ারের পরিবর্তে সমবেত প্রার্থনা, বাইবেল প্রচারিত ধর্ম সঙ্গীতের বদলে উপনিষদভিত্তিক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করলেন তাঁরা এবং নরনারী মিলিত কণ্ঠে তা গাওয়া শুরু করলেন। সহমিশ্রণ ও স্বেচ্ছাবিবাহও কতকটা পর্যন্ত অনুমোদন করলেন তাঁরা নীতি হিসাবে। অর্থাৎ খ্রীষ্টান ছাঁচে হিন্দুধর্মকে ঢালাই করলেন তাঁরা। উদ্দেশ্য শিক্ষিত তরুণদের আকৃষ্ট করা। কিন্তু ক্রমশ ব্রাহ্মধর্মও গণ্ডীবদ্ধ ও রক্ষণশীল হয়ে পড়ল। এদিকে আদর্শের বিরোধে তাতে ভাঙন দিল। কেশবচন্দ্র পিতারূপী ব্রহ্মকে মাতারূপে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। গড়ে তুললেন স্বতন্ত্র নববিধান সমাজ। এঁরা আমার মতে রামকৃষ্ণ প্রভাবিত শাক্ত-ব্রাহ্ম, যেমন ব্রাহ্ম-বৈষ্ণবরূপেও সংহত করলেন আর এক দলকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। শিশিরকুমার ঘোষ বিপিনচন্দ্র পাল ব্রজেন্দ্রনাথ শীল চিত্তরঞ্জন দাশ এই শেষোক্ত পর্যায়ের গণনীয় নাম। অর্থাৎ নিরুপাধিক ব্রহ্ম আরাধনার সঙ্গেই সমান্তরালভাবে ভক্তিবাদী কালী ও কৃষ্ণ আরাধনাও জাঁকিয়ে বসল বঙ্গদেশে। অন্যান্য অঞ্চলেও এই জিনিস হল কমবেশী। উনিশ শতকের এই ধর্ম পুনরুজ্জীবন আন্দোলন তখনকার সমাজ জীবনকে কিভাবে আলোড়িত করেছিল, গোড়ার দিকে তার নিদর্শন পাওয়া যায় মিশনারিদের সঙ্গে রামমোহনের দীর্ঘ মসীযুদ্ধ থেকে। এযুদ্ধ চলেছিল বঙ্কিম-হেস্টি বিতর্কের আমলেও, আবার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গেও বিতণ্ডা হয়েছিল বঙ্কিমের,

যাতে সত্য মিথ্যার সীমানা নিয়ে, ধর্মাধর্ম নিয়ে, সনাতনী ও ব্রাহ্ম প্রত্যয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচার নিয়ে তাত্ত্বিক লড়াই হয় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কলম ধরেছিলেন সে যুদ্ধে। কিন্তু রামকৃষ্ণ আন্দোলন সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কি বঙ্কিমচন্দ্র? মনে ত হয় না। আর রবীন্দ্রনাথেরা যে নিশ্চিতই তা ছিলেন না, ভারতী পত্রিকার মায়ের বাহন নামক প্রবন্ধই তার প্রমাণ। রবীন্দ্র বিবেকানন্দ সম্পর্কহীনতার মূল বোধহয় এখানেই। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী তাঁদের নিজেদের মধ্যে পর্যাপ্ত বাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হলেও, একযোগে সবাই মিলেই প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে যে পুষ্ট করেছিলেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। কারণ দেখা যাচ্ছে, তার ফলেই আত্মা জন্মান্তব অদৃষ্ট মোক্ষ অবতার গুরু মোহান্ত মন্ত্রতন্ত্র ও তুকতাক সম্পর্কীয় হাজারো বকেয়া বিশ্বাস নূতন যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণাকে প্রতিহত করেই সমাজের ওপর চেপে বসেছে। জাতীয় জীবনে তার প্রভাব বলাই বাহুল্য মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় পরবর্তীকালে। সতীদাহ রহিত, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, নারীর অবরোধ মোচন, কোন শুভংকর প্রয়াসই পুরোপুরি বাস্তবে মূর্ত হয় নি, ধর্মের নামাবলী মুড়ি দিয়ে সর্বক্ষেত্রেই স্থিতাবস্থা জীইয়ে রাখার প্রবল চেষ্টা চলতে থাকে বলে। বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার প্রমুখ মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের নায়কেরা এই প্রতিক্রিয়ার প্লাবনকে ঠেকাতে পারেন নি। পারা সম্ভবই ছিল না। অবশ্য উনিশ শতকে নূতন করে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ধর্মশাস্ত্র ইতিহাস ও সাহিত্য সমীক্ষার যে মানসিকতা তৈরি হয়েছিল, তাকেও এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এক করে দেখলে চলবে না। আগেই বলেছি যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সাংস্কৃতিক এশিয়া আবিষ্কার থেকে এই মানসিকতার জন্ম এবং এটা এদেশে হয়েছিল প্রধানত ধর্মীয় গোষ্ঠীর বাইরে, যদিও ধর্ম পুনরুজ্জীবনের নায়করাও কেউ কেউ এ পথে লক্ষণীয় কাজ করেছিলেন। আমরা স্মরণ করতে পারি রামমোহন রায় হেনরী ডিরোজিও রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শশিচন্দ্র দত্ত রামদাস সেন রমেশচন্দ্র দত্ত তিলক রানাড়ে ভাণ্ডারকার কানে প্রমুখের কথা জোনস বেনফী কসকঁ্যা উইলসন উইলিয়ামস বপ বর্নুফ ম্যাক্সমূলার বুলহার কানিংহাম প্রিন্সেপদের সঙ্গেই, ভারতীয় সংস্কৃতির নূতন প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রূপে।

এই ধর্ম পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন আমাদের জাতীয়তাকে যে ভাবে পঙ্গু করেছিল, তাই হল এর বৃহত্তম সর্বনাশা ফল এবং অন্ধ আত্মাদর বশে সেদিকটা তলিয়ে বোঝারও চেষ্টা করিনি আমরা কেউ। গোড়ার ধাপে পরের পর যে সব

সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে দেশের সর্বত্র, তা রাজনীতিক বিদ্রোহই সন্দেহ নেই এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চালিত হয় তা, তাও ঠিক। কিন্তু কোন বৃহৎ আদর্শবাদ বা রাজনৈতিক দর্শন তাতে অনুপ্রেরণা জোগায় নি। কোন-কোনটা এই জন্যে বিপথগামী হয়েছিল, যেমন ওয়াহাবী বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত হিন্দু বিরোধিতার রূপ ধরেছিল। কোন কোনটায় আবার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উদ্যোগও দানা বেঁধেছিল, যেমন সিপাহী যুদ্ধ ও নীলবিদ্রোহ। কিন্তু যখন থেকে আন্দোলনে রাজনৈতিক দর্শন এল, তখন থেকেই ঘটল বিপর্যয়। বঙ্কিম প্রচারিত হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই আমরা নিলাম আমাদের আদর্শরূপে এবং তার মূলমন্ত্র হল বন্দেমাতরম। পূর্বেই দেখান হয়েছে যে সিপাহী যুদ্ধের পর থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্যমে সাময়িক ভাবে ভাঁটা পড়ে এবং কংগ্রেসের মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা নিয়মতান্ত্রিক পথে রাজনীতি করতে থাকেন। গোড়ার ধাপে এই বন্দেমাতরম-প্রভাবিত রাজনীতি কিছু সংখ্যক মুসলমানের সমর্থন পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল, গঙ্গাস্নান রাখীবন্ধন বীরাষ্টমী ভবানী মন্দির, নানা হিন্দু প্রকরণের আতিশয্যে তা চূড়ান্ত গোঁড়ামির রূপ ধরল। অনিবার্য কারণেই সৈয়দ আহমদের উদ্যোগে তখন আলিগড়ে মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল এবং পৃথক একটি মুসলীম জাতীয়তাবাদ জন্মাল। ইংরেজরা এই সুযোগ ছাড়লেন না। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এরপরই ঢাকার নবাব সলিমউল্লা গড়লেন মুসলীম লীগ এবং তারই সর্বশেষ পরিণতি হল ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি। সবাই জানেন স্বদেশী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসের আন্দোলন পরিণত হয় অরবিন্দ প্রমুখের নেতৃত্বে। কিন্তু তাও প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রচারিত হিন্দু জাতীয়তার অভ্যুত্থান ছাড়া কিছু নয়। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব, কেউ তার ক্ষতির দিকটা নজর করেন নি। করেন নি অরবিন্দও। তিনি ছিলেন আধা-রাজনীতিক, আধা-মিষ্টিক, হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে সমাধানের পথে আনতে পারেন নি তিনি কোনদিনই। কিন্তু সে কথা যাক। সশস্ত্র অভ্যুত্থান থেকে শেষ পর্যন্ত সমষ্টিযোগে বিবর্তন হল অরবিন্দের এবং সেই চরম পশ্চাদমুখিনতাই হল ধর্ম পুনরুজ্জীবনের দুর্ভাগ্যজনক অনতিক্রম্য পরিণাম।

॥ আমাদের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা ॥

জাতীয়তাবোধের উন্মেষই যদিও আধুনিক ভারতের বৃহত্তম ঘটনা, তবু মনে

রাখতে হবে যে এই জাতীয়তাবোধের গণ্ডীবদ্ধতা দেশের পক্ষে অবিমিশ্র মঙ্গলের সূচনা করেনি। একদিকে যেমন তা বৃহত্তর পৃথিবীতে ভারতবর্ষকে অশেষ সম্মানের অধিকারী করেছে, অন্যদিকে তেমনি দেশের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে তা প্রভূত অনিষ্টের মূর্তিতেও প্রকাশমান হয়েছে। সেই শেষোক্ত দিকের কথা আগে একটু বলে নিই। আমাদের জাতীয়তাবোধ শুরু থেকেই হিন্দু মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার ফলে আদি থেকেই মুসলমানরা একটা নিরুত্তাপ মনোভাব পোষণ করেছেন সে সম্বন্ধে। ক্রমে সেটাই মুসলীম স্বাতন্ত্র্যের চেহারা ধরেছে, যার চরম পরিণতি ভারত বিভাগে। কিন্তু শুধু এই নয়, অনিষ্টের অন্যান্য দিকও সমান লক্ষণীয়। ধর্ম, গোষ্ঠী ও শ্রেণী নির্বিশেষে সর্বভারতীয় ঐক্যের বনিয়াদের ওপর আমাদের জাতীয়তার সৌধটিকে দাঁড় না করানর বিপাকে বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন অনিবার্য একটা একাত্মতা সৃষ্টি হয়নি, তেমনি প্রতিটি অঞ্চলেও উঁচু ও নীচু সোপানের মানুষের মধ্যে থেকে গেছে দুস্তর ব্যবধান। দেশ বিভাগের পরও এই সব বিরোধ ও ব্যবধান হিংস্র নখদন্ত নিয়ে বেঁচে আছে আমাদের মধ্যে। সার্থক সর্বভারতীয় সমন্বয় তাই এখনো দূর-অস্ত্! এই যেমন একটা দিক, তেমনি আর একটা দিক সবিস্ময়ে লক্ষণীয় যে, সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করে একেবারে গোড়া থেকেই আমাদের দৃষ্টি ও মননশীলতা আন্তর্জাতিকবোধ সঞ্জাত শুভবুদ্ধির আকাশ স্পর্শ করেছিল। দেশ জাতি ও ধর্মের উর্ধ্বে নির্বিশেষ মানবতার প্রতি অকৃত্রিম একটি অনুরাগ ব্যক্ত হতে দেখা যায় আমাদের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট জনের চিন্তা এবং কর্মেই। হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে বীজাকারে বোধটি নিহিত ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও ব্যাপ্তি যে হয় প্রতীচ্য শিক্ষা সংস্কৃতি সংস্পর্শে এসে, একথা স্বীকার করতেই হবে। ডিরোজিও রামমোহন থেকে পরের পর বিদ্যাসাগর অক্ষয় কুমার মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্র রমেশচন্দ্র বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র বিপিনচন্দ্র তিলক গোখলে রানাডে নৌরজী লালা লজপত গান্ধী রাধাকৃষ্ণাণ জহরলাল ভূপেন্দ্রনাথ মানবেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র···সবাই তাঁরা কোনা না কোন ভাবে সর্বমানবিক ঐক্যে বিশ্বাসী। পৃথিবীর জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু ভারতের সমস্যার সমাধান খোঁজেন নি তাঁরা। সুদীর্ঘ অধীনতার মধ্যেও একটি জাতির চিন্তায় এই বিশ্বমনস্কতা বিস্ময়েরই বস্তু!

আগে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলি। আমরা জানি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়ে রামমোহন রায় সংস্কৃত আরবী ফরাসী হিব্রু গ্রীক ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার চর্চা করেন। এরই জোরে একদিকে তিনি হিন্দু সনাতনীদের সঙ্গে উপনিষদ ও বেদান্ত-ভিত্তিক অদ্বৈত তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন বিতর্ক চালিয়েছেন, অন্যদিকে যীশুর অবতারত্ব ও খ্রীষ্টীয় মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে লড়াই করেছেন পাদ্রীদের সঙ্গে। এছাড়া তাঁর লেখায় দেখা যায় যে বৌদ্ধ দর্শন ও নীতিশাস্ত্র এবং কোরান হাদিস ও মুসলীম মুতাজেলদের জীবনতত্ত্ব নিয়েও তিনি পর্যাপ্ত চর্চা করেছেন। অর্থাৎ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়টি এদেশে তাঁরই সৃষ্টি। এছাড়া প্রত্যক্ষ জীবনেও তিনি সার্বভৌম মৈত্রীর সমর্থক ছিলেন। ইউরোপের ছোট্ট একটি দেশ স্বাধীনতা হারালে তিনি শোকদিবস পালন করেছিলেন। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের জাতীয় পতাকাকে ইংলণ্ড যাত্রার পথে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। দেশে দেশে মানুষের অবাধ আনাগোনা সম্ভব করার জন্যে আইনের কড়াকড়ি শিথিল করার অনুকূলে বিদেশে আন্দোলন করেছিলেন। অন্যদিকে বিশ্বের ইতিহাস এবং বস্তুবাদী দর্শন ও প্রতীচ্যের সাহিত্যরসকে ব্যাপ্ত করে ছিলেন প্রথম এদেশে ডিরোজিও। এদেশে গ্রীকও শেকসপীয়রীয় নাটকেরও প্রথম পাঠ দেন তিনিই।

শিক্ষা-সংস্কারক বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারও কম কাজ করেনি এক্ষেত্রে। এ দেশী পড়ুয়াদের গ্যালিলিও কোপার্নিকাস নিউটন হার্শেল প্রমুখের কথা প্রথম শোনান তাঁরাই। তাছাড়া তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার আরো অনেক ঐশ্বর্যই প্রথম নিয়ে আসনে তাঁরা এদেশের পাঠ্য তালিকায়। আর মধুসূদনই প্রথম ভারতীয় সাহিত্যে হোমার ভার্জিল দান্তে তাসো মিল্টন প্রমুখের ভাবধারা কাব্যাকারে পরিবেশন করেন এবং বঙ্কিম এক দিকে রুশো ভলতেয়ার ও দিদেরো প্রমুখ বিশ্বকোষবাদীদের সাম্য চিন্তা, অন্য দিকে কোঁৎ প্রবর্তিত পজিটিভিজ্‌মের আলোকে অনুশীলন-তত্ত্ব ভারতবাসীর জন্যে সহজবোধ্য ভাষায় লেখেন। তাছাড়া বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোয় বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনও তাঁরই একক দান। এই পথে উজ্জ্বলতর আলোক-বর্তিকা নিয়ে অগ্রসর হন তারপর এবং ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ততর করেন বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র থেকে রাধাকৃষ্ণাণ পর্যন্ত বহুজনই। তিলক, গোখলে, গান্ধী, জহরলালের ভূমিকাও নগণ্য নয় অবশ্যই। তারপর সাম্যবাদের মূলগত

আদর্শে প্রথম দীক্ষিত করেন যাঁরা এদেশবাসীকে, তাঁদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ তাত্ত্বিক দিক থেকে যেমন অগ্রগণ্য, তেমনি হাতে কলমে তত্ত্বকে রূপ দান করার গৌরব প্রাপ্য মুজফ্ফর আহমেদের। বলতে ভুল হয়েছে যে রামমোহন প্রদর্শিত ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শটিকে কেশবচন্দ্র আরো শক্তিশালী করেছিলেন, নিজে খ্রীষ্টতত্ত্ব-বিষয়ক একখানি বই লিখে, আর অঘোরনাথ গুপ্তকে দিয়ে বুদ্ধ সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়ে। এছাড়া তাঁর অনুগামী মৌলভী গিরিশচন্দ্র সেন করেন বাংলায় সমগ্র কোরানের অনুবাদ, আর মুসলীম সাধু সন্তদের প্রসঙ্গ নিয়ে লেখেন তাপসমালা নামে ছাত্রপাঠ্য একখানি বই। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানব-মৈত্রীর এই প্রয়াস সদ্বুদ্ধি-সম্ভূত হলেও এর সবই ঠিক প্রগতির অনুকূল প্রয়াস হয়ত নয়। তবু আমাদের মানসিকতার ভূগোল যে বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল উনিশ শতকের শুরু থেকেই, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রসঙ্গগুলি উপেক্ষণীয় নয় আদৌ। এই সূত্রেই স্মরণীয় যে শিক্ষা সংস্কৃতি ও মানব-সম্পর্কের উন্নয়নই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ছিল না আমাদের আন্তর্জাতিকতায়। চিত্রকলা, সঙ্গীত, নাটক ও কলাকৃষ্টির ক্ষেত্রেও দেশ বিদেশের বিচিত্র প্রভাব এবং প্রকরণ আমাদের সৃষ্টির মধ্যে মূর্ত হতে থাকে, কতকটা হয়ত জ্ঞাতসারেই, কতকটা বা অজ্ঞাতসারেও।

কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির কাছে আমাদের এই ঋণগ্রহণ কি নিতান্তই এক তরফা? আমরা শুধু হাত পেতে নিয়েইছি, দিইনি কিছুই? বলা বাহুল্য তা নয়। ইউরোপের মনীষীরা উনিশ শতকেই প্রথম ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের রত্নভাণ্ডার আবিষ্কার করেন এবং তার ফলে ইণ্ডোলজি বা ভারতবিদ্যা নামে নূতন একটি বিদ্যা জন্ম গ্রহণ করে, একথা ত আগেই বলেছি। তার সংগঠনে অগণ্য প্রতীচ্য পণ্ডিতদের সঙ্গেই হাত মেলান কিছু সংখ্যক ভারতীয় পণ্ডিতও। কিন্তু শুধু প্রাচীন ভারতের দর্শন ধর্মশাস্ত্র সাহিত্য ও কলাকৃষ্টির সঙ্গেই প্রতীচ্যের পরিচয় হয় না, এই সময় তাঁরা আধুনিক ভারতকেও চিনতে আরম্ভ করেন। একদিকে রামমোহন কেশবচন্দ্র মধুসূদন রমেশচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক দৌত্য, অন্য দিকে সুরেন্দ্রনাথ গোখেল বিপিনচন্দ্র গান্ধী জওহরলাল মানবেন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রপ্রতাপ ও সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিক দৌত্য প্রতীচ্যের চোখে সাম্প্রতিক ভারতের চিত্রটিও সার্থক ভাবে তুলে ধরে। ভারতবর্ষ যে শুধু সাপ বাঘ সোনা রূপো মশলা ও গজদন্তের মুলুক নয়, সুপ্রাচীন কাল থেকে তার যে

নিজস্ব সমুজ্জ্বল একটি সংস্কৃতি আছে, আছে বৃহৎ একটি সভ্যতা, এ যেমন তাঁরা বুঝতে পারলেন,তেমনি বিদেশী শাসনে শোষিত-সর্বস্ব বর্তমান ভারতের জীবনে প্রভূত দুঃখ বেদনা জমা হয়েছে, এও তাঁরা উপলব্ধি করতে পারলেন এঁদের মাধ্যমে। অশিক্ষা অনৈক্য দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যপীড়িত সেই ভারতের সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রজ্ঞার উচ্চমান তাঁদের অবাক করে দেয়। বৃটিশ সরকারী মহলের বাইরে সংস্কৃতিমান্ মানুষের সমর্থন লাভ করে এই জন্যেই ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং তা করে ইউ-রোপ আমেরিকার নানা স্থানেই। কিন্তু দুর্ভোগ্যের বিষয় আমরা বেদান্ত উপনিষদ ও গেরুয়াকে যতখানি উৎসাহে বাইরে ভারতে প্রধান পরিচয় রূপে দাঁড় করাতে চেয়েছি, বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ভারতবর্ষকে সমুচিত সম্ভ্রমের আলোয় তুলে ধরার জন্যে তার অর্ধেকও করিনি। ফলে ভারতের সম্বন্ধে নানা একপেশে ধারণা তৈরি হয়েছে এবং এখনো এই সব ধারণা আছে অনেক মহলে, যা আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভের কারণ হয়নি। তা সত্ত্বেও ভারত যে সমসাময়িক পৃথিবীকে জ্ঞানে কর্মে অল্প প্রভাবিত করেনি, এ স্বীকার করতেই হবে।

২.

শিকাগো মহাসম্মেলনে বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যান,বৃটিশ রয়েল সোসাইটিতে উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন বিশ্লেষণ করে জগদীশচন্দ্রের ভাষণ, রবীন্দ্রনাথের সুইডিশ একাডেমী থেকে নোবেল পুরস্কার লাভ,দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর স্বার্থ সং-রক্ষার দাবীতে গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ,সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নায়করূপে ভারতে অরবিন্দের আবির্ভাব এবং ইউরোপ আমেরিকা ও জাপান থেকে তাঁর উদ্দী-পনায় অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে অবনী মুখুজ্যে, নলিন গুপ্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য,বাবা গুরুদিৎ সিং প্রমুখের প্রয়াস, লেনিন কর্তৃক দূরপ্রাচ্য দপ্তরে মানবেন্দ্র রায়ের নিয়োগ, উপনিবেশ-বিমোচন তত্ত্ব নিয়ে পরে স্তালিনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অন্তে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী-নেতৃত্বের উদ্ভব, দেশের বাইরে প্রথম ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে প্রকাশ্য পার্টি রূপে তার আত্মপ্রকাশ, সুভাষচন্দ্র কর্তৃক দেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা লাভের জন্যে জাপান গমন এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর গঠন, বিশ শতকের শুরু থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে পরের পর সংঘটিত এই বিচিত্র ঘটনায় বিশ্ববাসীর বিস্মিত দৃষ্টি ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল অনিবার্য

ভাবেই। ভারতবর্ষ যে শুধু বেদ, উপনিষদ ও রামায়ণ-মহাভারতের দেশ নয়, মনু কৌটিল্য, বাৎস্যায়ন ও ভরতের দেশ নয়, শুধু অজন্তা ইলোরা শিল্পের, মার্গ-সঙ্গীত ও ভরতনাট্যমের বা কালিদাস ভবভূতি বাণভট্টের দেশ নয়, সেখানে শুধু বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি হয়নি, শুধু মুঘলরা বিলাস ব্যসনের সমুদ্রে হাবুডুবু খান নি, তার যে একটা বর্তমান আছে এবং সে বর্তমানও যে কম গৌরবের নয়, ইউরোপ আমেরিকা একথা এই প্রথম উপলব্ধি করল। মিশর, গ্রীস ও রোমের মত নিছক অতীত আশ্রয় করে অন্ধকার বর্তমানের মধ্যে যে বেঁচে নেই দেশটা, তার সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে একটা পূর্বাপর প্রবহমানতা আছে, এ তাঁরা জানতেনই না।

রাজনীতিক পরাধীনতা এবং বৈজ্ঞানিক ও আর্থনীতিক অনগ্রসতার মধ্যেও আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় এতখানি সসম্মান পরিচিতি লাভ কম কথা নয়। স্বাভাবিক ভাবেই পূর্বোলিখিত মহাজনদের প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে বেলুড় মঠে, শান্তিনিকেতনে, বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে, সবরমতী ও পণ্ডিচেরীতে দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণী মানুষরা এসেছেন। এইসব প্রতিষ্ঠানে কিছু দিন বা অনেকদিন থেকেছেন তাঁরা এবং এখান থেকে ভারতের বার্তা নিয়ে গেছেন নিজ নিজ দেশে। এইভাবেই উঠেছেন একদল কীর্তিমান্ মানুষ, যাঁরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাব বিনিময়ে সক্রিয় মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এঁদের কাজ নিঃসংশয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এঁদের রচনা ও প্রচারণার ভেতর দিয়েই বিশ্ববাসী আজকের ভারতবর্ষকে ভালভাবে চিনেছেন।

পূর্বে যে সব মহান ভারতবাসীর উল্লেখ করেছি, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একালেও বহুজনই ভারতবর্ষের জীবন ও চিন্তার ঐশ্বর্য বৃহত্তর পৃথিবীতে বয়ে নিয়ে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের চিত্রকলা, উদয়শংকরের নৃত্য এবং দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গীত যেমন ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ দানরূপে দেশবিদেশে সমাদৃত হয়েছে, তেমনি চন্দ্রশেখর রামন, রামানুজম, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা ও হোমি ভাবার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বও যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করেছে। সম্মানিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণানের বাগ্মিতাও। আজও সত্যজিৎ রায় আলি আকবর এবং রবি-শংকর প্রমুখ শিল্পী একদিকে, অন্যদিকে খোরানা নারলিকার প্রমুখ বিজ্ঞানী ভারতের পতাকা উড্ডীন রেখেছেন বাইরের পৃথিবীতে। অবশ্য তা সত্ত্বেও ক্ষোভ থেকে যায় যে সাধারণ ভারতবাসীর প্রতিদিনের জীবন, তাঁদের

সুখদুঃখ ও সংকট সমস্যার সঠিক পরিচিত যথাযথ ভাবে সামান্যই তুলে ধরা হয়েছে বাইরের মানুষের চোখে।

এটা হতে পারত ভারতের বিভিন্ন মাতৃভাষায় যে বিরাট সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদ করিয়ে আমাদের দূতাবাসগুলির মাধ্যমে সর্বত্র প্রচার করা হলে। তার পরিবর্তে ইংরেজীতে চলনসই রকম উপন্যাস লিখেছেন এমন একদল ভারতবাসীই ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধি রূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন সর্বত্র। মুলুকরাজ আনন্দ রাজা রাও আর. কে. নারায়ণ নয়নতারা সেহগল প্রমুখের উত্তমকে নস্যাৎ করছি না আমি। আমি বলছি বাংলা হিন্দী মারাঠী ওড়িয়া উর্দু ও তামিল প্রভৃতি ভাষায় ওঁদের চেয়ে অনেক বড় সাহিত্যিকরা আছেন, যাঁদের পরিচয় দুনিয়ার মানুষ আজও জানেন না। তা জানলে, তাঁদের লেখার ভেতর দিয়েই জাগ্রত ও জীবন্ত ভারতবর্ষ আরো ভাল করে ব্যাপ্ত হত পৃথিবীতে, যেমন ভাবে হয়েছে ফ্রান্স জার্মানী ও রাশিয়া সারা জগতে, প্রধানত সাহিত্যের ভিতর দিয়েই। এ ত হয়ই নি, এর বদলে আজও একদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে গেরুয়াধারী স্বামী মহারাজ ও যোগীরা হানা দিচ্ছেন বাইরের দেশগুলিতে এবং বাউণ্ডুলে বদখেয়ালী ও মতলবীদের কৃষ্ণ-সচেতন বানিয়ে পাইকারী হারে ভারতে আমদানি করছেন, অন্যদিকে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ভারতীয় তরুণদের দীর্ঘ মিছিল চলেছে ইউরোপ-আমেরিকা-মুখো, দুহাতে টাকা কুড়ানর স্বপ্ন বুকে নিয়ে। ফলে, ভারতবর্ষ সেই বেদান্তওয়ালাদের ও করতাল-পেটা বাবাজীদের দেশ রূপেই ফের নজর আকর্ষণ করেছে বিশ্ববাসীর, নয় করেছে দীন দরিদ্র বেকারের দেশরূপেই, যার যুবশক্তি সদ্য স্বাধীন আপন দেশকে নূতন ছাঁচে গড়ে তোলার চেয়ে ভিন্ন দেশের দাস্যে মোটা টাকা কামানকেই মহত্তর ব্রত মনে করে। এ দুইয়ের গতিকে কে রুখবেন ?

৩.

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইতিহাসবিদ্ আর্নল্ড টয়েনবি কয়েকটি চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবীতে ইংরেজী ভাষা, ইউরোপীয় পঞ্জিকা [ গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডার ], ইউরোপীয় পরিচ্ছদ, খ্রীষ্টধর্ম—অন্তত পক্ষে খ্রীষ্টীয় মানবতাবাদ এবং ইউরোপীয় জীবনচর্যা সর্বজনীনভাবে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে। পৃথিবী বলতে তিনি অবশ্য এশিয়া আফ্রিকার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তার কারণও

আছে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার ছাঁচ ইউরোপের সঙ্গে হুবহু এক না হলেও, আত্মিক গঠনে ওরা অনেকটাই এক, যেহেতু ওদের নৃতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার অভিন্ন, যা নয় এশিয়া আফ্রিকায়। সেই নির্ধারিত সময়সীমা পার হয়ে যাবার পর আজ আমরা কি দেখছি? দেখছি না কি যে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, বর্মা, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি পূর্ব এশিয়ার এবং ইরাণ, ইরাক, সৌদি, আরব, জর্ডন, সিরিয়া প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়ার মুল্লুকগুলিতে টয়েনবির বক্তব্য বেশীর ভাগই বাস্তবে রূপ নিয়েছে? ইংরেজী ভাষা, ইউরোপীয় সাল-তারিখ এবং পুরুষের ইউরোপীয় পোশাক এই সব দেশে আজ প্রায় সর্বজনীনভাবেই গৃহীত হয়েছে। আর খ্রীষ্টধর্ম না হলেও, খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ, বিশেষ বিশেষ ইউরোপীয় আদব-কায়দা এবং খাদ্য পানীয় ওষুধ যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অভ্যাসও সর্বত্রই ব্যাপকভাবে দেখা যায় না কি? দেখা যায় না কি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আইনসভা ও প্রশাসনের কাঠামো যথা সম্ভব ইউরোপীয় ছাঁচে ঢেলে সাজানরই ঐকান্তিক প্রয়াস? যা এশিয়া সম্বন্ধে, তাই বক্তব্য আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলি সম্বন্ধেও। আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো, ঘানা, কঙ্গো, কেনিয়া, উগাণ্ডা, এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, সর্বত্রই সমাজ রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইউরোপীয়করণের সার্বিক আয়োজন শুরু হয়েছে। সুতরাং টয়েনবির দৃষ্টি বোধহয় খুব ভুল দেখেনি ভাবী দিনের আলেখ্যকে।

এই জন্যেই অধ্যাপক উইলিয়াম উডরো দ্য ইম্প্যাক্ট অব দ্য ওয়েষ্ট নামক বইয়ে বলতে পেরেছেন গত দুই শতাব্দী ধরে ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনাদর্শই সারা পৃথিবীর সমাজ এবং সংস্কৃতিকে নূতন করে গড়েছে। বাষ্প ও বিদ্যুৎ-চালিত যানবাহন, কলকারখানা ও বার্তা-বিনিময় ব্যবস্থা থেকে আলো-হাওয়া ও জল সরবরাহ পর্যন্ত, সব ব্যাপারে পশ্চিমী দুনিয়ার আবিষ্কারগুলি পৃথিবীবাসী সানন্দে নিয়েছেন। নিয়েছেন শিক্ষা বিকিরণে, নগর বিন্যাসে, রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় এবং বাণিজ্য বিস্তারেও ইউরোপীয়দের অনুসৃত ধারা। আর পশ্চিমী ধাঁচে জগৎ-চিন্তা ও জীবন-বোধের প্রভাবে তাঁরা মানুষ হয়েছেন বলে, ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক-স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও এশিয়া আফ্রিকার মানুষ ক্রমেই বেশী করে ইউরোপীয় মানসিকতা ও ধরণ-ধারণে অভ্যস্ত হচ্ছেন। আজ তাই সাবেকী যৌথ পরিবারের জায়গায় আসছে স্বামী-স্ত্রীর একান্তিক সংসার। ধর্মীয় বিবাহ-বন্ধনের অচ্ছেদ্যতা শিথিল হয়ে,

আসছে স্বেচ্ছাবিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের স্বীকৃতি। জীবসৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায় মনে না করে মানুষ নিজেই সামাজিক ও পারিবারিক মঙ্গলের জন্যে জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করতে অগ্রণী হচ্ছেন। ব্যক্তিগত দান বা বদান্যতার পথে মানব কল্যাণ অপেক্ষা হিতব্রতী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে, তার হাতে সেই ভার দেওয়াকেই বেশী অভিপ্রেত মনে করেছেন। লোকোত্তর জীবনের শুভাশুভ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পার্থিব জীবনকেই আজ সুন্দর ও শান্তিপ্রদ করে তোলার আগ্রহ জেগেছে মানুষের মনে। আর এসবেরই বর্গফল হিসাবে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে আস্থাহীন মানুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। একেই অধ্যাপক উডরো বলেছেন প্রতীচ্য জগতের সাংস্কৃতিক বিজয়। তাঁর মতে আজকের দুনিয়ায় শুধু ওপর থেকে দেখেই কলকাতা বোম্বাই হংকং টোকিও লণ্ডন প্যারিস বার্লিন ও মস্কোকে একরকম মনে হয় না, ভেতরে নজর করলেও পরস্পরের মধ্যে একটি আত্মিক একত্ব চোখে পড়ে। লেখক মনে করেন এই একত্বের পরিসর ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে এবং আগামী দুই দশকেই এশিয়া আফ্রিকার বৃহৎ দেশগুলি তাদের সমস্ত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য খুইয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় ইউরোপের সামিল হয়ে যাবে।

অর্থাৎ একবিংশ শতকে সমগ্র এশিয়া আফ্রিকা স্বাধীন মানুষের বাসভূমি হিসাবে গড়ে উঠবে এবং জ্ঞানে কর্মেও উন্নত হবে বটে, কিন্তু তার নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্য যাবে লুপ্ত হয়ে। তার দেশগুলি হবে সবই পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতিফলিত দ্যুতির মত, যেমন আজ হয়েছে জাপান ও ফিলিপিন, হবার পথে এগিয়ে চলেছে মিশর ও লেবানন। অধ্যাপক উডরোর মতে এই ভাবেই একদিন এক-বিশ্বের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। টয়েনবির ভবিষ্যদ্বাণী যে অনেকটাই ফলেছে তা এই আলোচনার গোড়ায় দেখিয়েছি। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা হিসাবে অধ্যাপক উডরোর উক্তি কোনদিন সত্য হবে কিনা, তা বলার সময় এখনো আসেনি। আর তা হলেও মনুষ্য জাতি ও মানবসভ্যতার তাতে মঙ্গল হবে কিনা, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। ইউরোপ আমেরিকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় এবং শিল্পে বাণিজ্যে ও রাজনীতিতে আজ দুনিয়ার শীর্ষস্থান অধিকার করেছে ঠিকই, কিন্তু মানুষকে তৃপ্তি ও শান্তি দিতে পেরেছে কি? তাদের ঘর ভেঙেছে। দাম্পত্য বন্ধন হয়েছে ক্ষণভঙ্গুর। ব্যক্তিজীবন থেকে সমস্ত স্থিতমূল্য অন্তর্হিত হয়েছে, তার ফলে গতি, তৃষ্ণা ও অস্থিরতা মানুষকে

গ্রাস করেছে। এ থেকে মুক্তির জন্যে জুয়া, ক্যাবারে, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদির সর্বত্র হয়েছে পাইকারি প্রতিপত্তি। তরুণ সমাজ প্রাচুর্যের মধ্যেও পথভ্রষ্ট হয়ে বাউণ্ডুলে বিট্‌ল হিপি বা কৃষ্ণসচেতন হচ্ছে। মেশিন-সর্বস্ব এই অমানবিকতাই স্পেংলার কথিত সেই প্রতীচ্যের অবক্ষয় রূপে প্রকাশমান হয়নি কি? এই পথে এশিয়া আফ্রিকার রূপান্তর হলে তা কোন্ শুভ পরিণতি ডেকে আনবে? তার চেয়ে আমাদের আন্তর্জাতিক সদ্দিৎসা যদি পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন দুনিয়ার পথ ছেড়ে চীন রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক মুলুকের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এক যাত্রায় অগ্রণী হয়, তাহলে নিজ নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রেখেই এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলি নূতন এক-বিশ্বের আদর্শ গড়ে তুলতে পারবে। বলে রাখা দরকার যে জন্মগত অধিকারলব্ধ ভূমি ভাষা ও ঐতিহ্যের মাটি থেকে স্খলিত হয়ে মানুষের কোন ভাব বা ভাবনা নিছক শূন্যে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা। মানুষের ইতিহাসেই তার নজীর মিলবে না।

॥ মূল্যবোধ : প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ॥

পুরান সমাজ ছিল কৃষি ও কুটীরশিল্প নির্ভর। পৈত্রিক বাসগৃহ, কৃষিক্ষেত্র ও পারিবারিক বৃত্তি-ব্যবসা আশ্রয় করে, একান্নবর্তী পরিবারে বেঁচে থাকাই তখন ছিল সর্বস্বীকৃত রীতি। তখনকার সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক জীবনে গ্রাম এবং নগর ছিল পরস্পরের পরিপূরক। অষ্টাদশ শতকের মধ্যপর্ব পর্যন্ত এই পটভূমি বর্তমান ছিল পৃথিবীর সর্বত্রই। তারপর প্রতীচ্য বাষ্প ও বিদ্যুৎ আবিষ্কার করল এবং তাকে গতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় যুক্ত করে যে শিল্প বিপ্লব ঘটাল, তার ধাক্কায় ঘটল কতকগুলি চমকপ্রদ পরিবর্তন। গ্রামের ভূম্যধিকারীরা শহরে এসে নানা শক্তিশালী উৎপাদনযন্ত্রের পিছনে মোটা টাকা লগ্নি করে আস্তে আস্তে সে সবের একচেটে মালিকানা আয়ত্ত করলেন এবং রকমারি কলকারখানা স্থাপন করে হলেন বড় বড় শিল্পপতিতে রূপান্তরিত। আর উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্তের বৃহৎ একটা অংশও শিক্ষা এবং জীবিকার আকর্ষণে একদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে যেমন শহরে এসে বাসা বাঁধলেন, অন্যদিকে তেমনি ভূমিহীন কৃষক ও অভাবী কারিগররাও অন্নের ধান্দায় দলে দলে শহরে এসে বাসা বাঁধলেন।

আজকের শহরে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীরা সবাই এঁদের সন্তান। এর ফল হল সুদূরপ্রসারী। গ্রামীণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ল,

ধনশক্তির ও জনশক্তির বৃহত্তম অংশটি শহরে সরে যাওয়ায় গ্রাম ও নগরের মধ্যেকার ভারসাম্য হল বিপর্যস্ত এবং ধীরে ধীরে গ্রাম ও নগরের মধ্যে নেমে আসতে শুরু করল গভীর একটি অপরিচয়ের পর্দা। যৌথ পরিবার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নূতন প্রজন্মের মধ্যবিত্ত জীবিকার্থীরা শহরে এসে হতে লাগলেন তীব্র আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পন্ন এবং পুরাতন আদর্শ ও মূল্যমানগুলির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েই তাঁরা স্বামী স্ত্রীর একান্তিক সংসার গড়ে তুলতে শুরু করলেন, চাকরি, বাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য-লব্ধ উপার্জন আশ্রয় করে। আর শ্রমকারী নীচুতলার মানুষরাও মজুর, মিস্ত্রি ও দেহশ্রমী বস্তীবাসী হয়ে গ্রাম থেকে আসা তাঁদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর এবং পুরাতন পারিবারিক আচার-সংস্কারের ব্যাপারে ঐতিহ্যভ্রষ্ট হতে লাগলেন। অর্থাৎ একই সঙ্গে গ্রামে ও নগরে শিক্ষিতে ও নিরক্ষরে অস্তিবানে ও নাস্তিবানে ফারাকের গণ্ডী হয়ে দাঁড়াল অনতিক্রম্য।

বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ সংগঠনের মূলগত দুর্বলতাই এখানে এবং এই অন্তর্লগ্ন স্ববিরোধই একদিন ধ্বংস ডেকে আনবে, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এশিয়া আফ্রিকায় সেদিন আসতে এখনো দেরি আছে। তার কারণ এই দুই মহাদেশের বেশীর ভাগ মুল্লুকই প্রায় দুই শতাব্দী ধরে প্রতীচ্যের সম্প্রসারণ-কামীদের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ হয়ে থেকেছে। এখান থেকে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করে তাঁরা তা নিয়ে গেছেন আপন দেশের কারখানায় এবং বিবিধ পণ্য তৈরি করে এনে তা বেচেছেন অধিকৃত দেশের বাজারে। এই বিকিকিনির জন্যে যতটুকু শিল্পায়ন দরকার, সেই পরিমাণ নগর, বন্দর, কলকারখানা, রেলপথ, ডাক, তার ও বেতার বসিয়েছেন তাঁরা। আর বাণিজ্য ও প্রশাসন চালানর জন্যে যতটুকু এককালীন শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপ্তি প্রয়োজন, মাত্র সেইটুকুই করেছেন এইসব দেশে। এরই অনিবার্য পরিণতি হল সমাজের অসমান বিকাশ। অল্পসংখ্যক মানুষ উঠেছেন একালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ সোপানে, তাঁরা হয়েছেন প্রতীচ্যভাবপন্ন আধুনিক। আর বেশীর ভাগ হয় সাবেকী শিক্ষাদীক্ষায় অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে আছেন, নয় শিক্ষার আলো আদৌ পান নি। দুই শ্রেণীর মধ্যে তাই জাঁকিয়ে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। লোকজীবনে যেমন এই পরস্পর-বিরোধী চিত্র দেখা যায়, তেমনি যায় সমাজ-জীবনেও। একদিকে তেলের বাতি ঢেঁকি উদূখল গোরুর গাড়ি দেশি নৌকা কুঁড়ে ঘর, অন্যদিকে নিওনের বাতি বিদ্যুৎ-চালিত কলকারখানা যানবাহন জেটবিমান আকাশচুম্বী বিরাট বিরাট সৌধ, একদিকে জ্যোতিষী কবিরাজ

গুরু গোঁসাই ও অবধূত, অন্যদিকে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার অধ্যাপক উকিল ব্যারিষ্টার, একই সমাজের মধ্যে পরস্পরের ভিতর ছেদ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে,আমরা বার আনা সেকালের সঙ্গে চার আনা একাল মিশিয়েই দুই চরম প্রান্তকে একত্র মেলাতে চাইছি। এতে সেকালে একালে যেমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে, তেমনি প্রাচ্যে প্রতীচ্যেও সমন্বয়ের বদলে সংঘাতই বড় হয়ে উঠেছে। এশিয়া আফ্রিকার এই বাস্তব পটভূমিটা স্পষ্ট করে বোঝার প্রয়োজন আছে, কেন না তা ভিন্ন প্রকৃত সত্যের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে না, দেশি বিদেশি কোন সন্ধিৎসুর চোখেই।

সাধারণভাবেই নগর বন্দর কলকারখানা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট-কাছারি ও কাজ-কারবারের একালীন ছাঁচটি লক্ষ্য করে এবং প্রতীচ্য ধারায় শিক্ষিত শহুরে নরনারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিদেশীরা তাই আপাত একটা ঐক্যই দেখতে পান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবন এবং মননের মধ্যে। তাঁরা ধরে নেন যে এশিয়া আফ্রিকা বুঝি দুই শতাব্দীতে প্রায় একই পর্যায়ে এসে গেছে তাঁদের সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে তা যে হয়নি, সেটা বোঝা যায় গ্রাম্য জীবনের ও গ্রামীণ মানুষের গতি-প্রকৃতি যাচাই করে দেখলেই। বলা বাহুল্য শিক্ষা বিস্তার ও শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত হলে এবং যন্ত্রনির্ভর যৌথ কৃষিক্ষেত্র ও কলকারখানার পাইকারি পরিব্যাপ্তি হলে, অসমান সমাজ গঠনের অবসান হবে এবং হয়ত একদিন অধিকাংশ মানুষকে অনেকটা এক চেহারায় দেখতে পাব আমরা। কিন্তু ধনবণ্টনের কাঠামোটা সাম্যাশ্রিত না হলে, প্রকৃত সামাজিক ঐক্য কোনদিনই আসবে না, অস্তিবানে নাস্তিবানে যথার্থ ব্যবধানও ঘুচবে না। ধনতান্ত্রিক ইউরোপ আমেরিকাতেও তা হয়নি। কাজেই আগে মূল কাঠামোটা বদলান দরকার। কিন্তু তারপর প্রশ্ন ওঠে, এশিয়া আফ্রিকা কি তাহলেই তাদের নিজস্ব মূল্যবোধগুলি বিসর্জন দিয়ে ষোল-আনা প্রতীচ্য জীবন দর্শনের অনুগামী হবে? মানুষের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয়গুলি সবই ভোল বদলে ফেলবে আগাগোড়া? হ্যাঁ, না, কোনটাই জোর করে বলা অবশ্য মুস্কিল। তবে জীবন ও মননের মূল সূত্রগুলি এত গভীর ভাবেই প্রোথিত থাকে মানুষের প্রাত্যহিক রীতি-নীতি অভ্যাস ও আসক্তির মধ্যে যে তাদের সামূহিক উন্মূলন সচরাচর হয় না বিশেষ। আর তা হয় না বলে, প্রবৃত্তি রুচি প্রবণতা, কোন ব্যাপারেই দুজন মানুষ বা দুটি মানবগোষ্ঠী কখনো এক হয় না। এই স্বাতন্ত্র্যই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির

উদ্দীপনা জুগিয়েছে যুগে যুগে। সেই স্বাতন্ত্র্যের উৎসটি না শুকিয়ে যাওয়াই বোধহয় তাই বেশি লাভজনক হবে এশিয়া আফ্রিকার পক্ষে। কিন্তু জীবন ও মননে অর্থাৎ মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এশিয়া আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপ আমেরিকার যথার্থ মিল ও অমিল কোন্‌খানে? পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে তার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাবে।

২.

পূর্ব কথার অনুবৃত্তি করে বলছি, যানবাহন যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা থেকে নগর বিন্যাস শিক্ষা চিকিৎসা প্রশাসন ও আইন আদালত পর্যন্ত ব্যবহারিক জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই আজ ইউরোপ আমেরিকার ছাঁচ প্রত্যক্ষ করা যায় এশিয়া আফ্রিকার প্রধান প্রধান দেশগুলিতে। কিছু কিছু আচার-আচরণ আদব-কায়দা এবং খাদ্য-পানীয়ের অভ্যাসেও প্রতীচ্যের অনুকৃতি দেখা যায়। দেখা যায় রাজনীতিক কার্য-কলাপে, দর্শন ও সাহিত্যের মননভঙ্গীতে, নাট্য-ব্যবস্থাপনায়, চিত্রাংকন পদ্ধতিতে। স্বভাবতই উপর থেকে দেখে মনে হতে পারে যে এশিয়া আফ্রিকা বুঝি দ্রুত ইউরোপীয়তায় বিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে প্রাচ্যভূমির নিজস্ব মূলবোধগুলিও ভারতবর্ষ চীন জাপান বর্মা ইন্দোনেশিয়া ভিয়েৎনাম ইরাণ সৌদি আরব সিরিয়া লেবানন প্রভৃতি এশীয় মুল্লুকগুলিতেই হোক, আর ঘানা কঙ্গো কেনিয়া সোমালিয়া এঙ্গোলা প্রভৃতি আফ্রিকান মুল্লুকগুলিতেই হোক, অদ্যাবধি মোটামুটি স্বমহিমায় আত্মরক্ষা করছে। কিছু কিছু তথাকথিত অগ্রসর পরিবারে হয়ত জন্মতিথি, বিবাহ অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কৃত্যগুলিতে এসেছে খানিকটা ইউরোপীয় ধরণ-ধারণ। চাকরিজীবী শিক্ষিত শহুরেদের মধ্যে হয়ত স্বামীস্ত্রীর একাত্মিক সংসার গঠনের এবং বৃদ্ধ রুগ্ন বা নিরুপার্জন প্রতিপাল্যদের পরিহারের একটি মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়েছে। হয়েছে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত পূজা-আর্চা ও আচার-সংস্কারগুলি বর্জনের আগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এখনো নিজস্ব মূল্যবোধগুলি আঁকড়ে আছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তার ফলে দাম্পত্য সম্পর্কের অচ্ছেদ্যতার এবং নিকট-দূর পাঁচজনকে নিয়ে তৈরি একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শকে এখনও সম্মানার্হ মনে করেন অনেকেই। ব্যক্তিগত বদান্যতা হিসাবে স্কুল কলেজ হাসপাতাল অনাথাশ্রম অতিথিশালা স্থাপন এবং দেশ জাতি ও মানুষের মঙ্গলে ত্যাগ ও দুঃখ-বরণকে অনেকেই পুণ্যকর্ম বলে মনে করেন। দুঃখী দরিদ্র ও নিঃস্বকে

আশ্রয়দান, অন্নদান, পিতামাতা ও শিক্ষককে মর্যাদা প্রদর্শন, অতিথিসেবা এবং শিশু সম্বন্ধে মমতা, কিংবা নারী ও বৃদ্ধ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধকে সামাজিক সদাচার বলে মনে করেন। এইগুলোকেই বলা যাবে মূল্যবোধ, যেখানে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে রয়েছে সত্যিকার মানসিক ব্যবধান। আর ঈশ্বর আত্মা পাপপুণ্য অদৃষ্ট জন্মান্তর ও মোক্ষ-সম্পর্কীয় ধারণাগুলিতে, জীব-জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও জীবনোত্তর পরিণতি অর্থাৎ স্বর্গ-নরক সম্পর্কীয় এবং জীবন ও বিশ্ব-প্রকৃতির মৌল অভিন্নতা সম্পর্কীয় ধারণাগুলিতে প্রাচ্য প্রতীচ্যে যে দুস্তর প্রত্যয়ের ফারাক দেখা যায়, এ অবশ্য না বললেও চলে। এই পার্থক্য প্রাত্যহিক দিনচর্যা থেকে শুরু করে খাদ্য পানীয় এবং বৈবাহিক ইতি-নেতি বিষয়ক আচরণ বিধি পর্যন্ত, সব বিষয়ই প্রাচ্যকে যেমন প্রতীচ্য থেকে অনুপেক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত করেছে, তেমনি প্রাচ্যেও একদেশের সঙ্গে অন্যদেশের সুস্পষ্ট বিভিন্নতা রচনা করেছে এরাই। ইতিপূর্বেই ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক অধ্যায়গুলিতে প্রাচ্যের সর্বাধিক সংখ্যক লোকের দ্বারা অনুসৃত ধর্মগুলির স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সেই সূত্রে ঈশ্বর প্রসঙ্গে, অথবা পূজা-পদ্ধতির এবং নৈতিক ও সামাজিক কৃত্যাকৃত্যগুলির ক্ষেত্রে পারস্পরিক মিল গরমিলের রকমারি দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে তার আর পুনরুক্তি করব না। শুধু এইটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে প্রাচ্যের প্রধান প্রধান সমস্ত ধর্মে ব্যষ্টি জীবনে সত্য ও শুচিতা এবং সমষ্টি জীবনে প্রেম ও কল্যাণব্রতকে শ্রেয় বস্তু বলা হয়েছে। ছোটবড় নির্বিশেষে সব মানুষের জন্যে এইরকম একটি সাধারণ ও সর্বনিম্ন আচরণ-বিধি বেঁধে দেওয়ার মন এশিয়ায় তৈরি হয়েছিল, তার কারণ মানুষের প্রাচীনতম সভ্যতার জন্ম হয়েছিল এশিয়ায়। আর পৃথিবীর গণনীয় এবং অদ্যাবধি জীবিত ধর্ম যেগুলি, হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ইসলাম জরথুস্ত্রীয় ইহুদী খ্রীষ্টান কংফুজীয় তাওপন্থী শিন্তোপন্থী, সব কটিই প্রকাশমান হয়েছে এই মহাদেশে এবং তারা একে অন্যকে অনিবার্য ভাবেই প্রভাবিত করেছে। নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক জাগৃতির আদিভূমি হিসাবে আফ্রিকাও হয়ত সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার সভ্যতা সংস্কৃতি ও জীবন-চর্যার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অদ্যাবধি সংকলিত ও প্রচারিত হয় নি। বরং বিদেশী উপনিবেশের প্রতিভূ ভাড়াটে লেখকরা তাকে বহির্জগতে এতদিন অন্ধকার মহাদেশরূপে চিত্রিত করেই রেখেছিলেন। সেখান থেকে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ অন্তে আজ সে বেরিয়ে এসে হাত মিলিয়েছে চলমান দুনিয়ার মিছিলে।

মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবন যাত্রায় মূলগত একটা পার্থক্য দেখা যায়। প্রাচ্যে মানুষ শান্তি ও স্থিতিকেই সর্বাধিক কামনার বস্তু বলে মনে করেছে। উদ্দামতা উত্তেজনা দাপাদাপি তার মানসিক প্রবণতার অনুকূল নয়। তাই দর্শন মনন কাব্য ও কারুকলায় হয়েছে তার পরম প্রকাশ। জড় প্রকৃতিকে সে চেনে নি বোঝে নি বা তার ওপর জয়ী হতে চায় নি, তা নয়। কিন্তু অন্তর্লোকের গভীরে অবগাহন করে জ্ঞান ও ধ্যানের ঐশ্বর্য আহরণকেই সে দিয়েছে প্রাধান্য। বস্তুময় এই পৃথিবীটা যে প্রাণময় একটি দিব্য পৃথিবীরই বাহিরঙ্গিক রূপ, আর ভিতরের সেই গুহাহিত রূপের কিছুটা আভাস যে পাওয়া যায় সীমিত ইন্দ্রিয়বোধ বা জৈব-চেতনার মাধ্যমেই, প্রাচ্য দুনিয়ার প্রাচীন দর্শনই প্রথম শুনিয়েছে মানুষকে সে কথা। জড় ও চেতনা যে একই শক্তি বা সত্তার অচ্ছেদ্য দুটি রূপ, একথা বিজ্ঞান অবশ্য হাতে কলমে আজ প্রমাণ করেছে। কিন্তু ও কথা থাক। জগৎ-চিন্তা ও জীবন-বোধের ভিত্তি এই নিগূঢ় প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে, প্রাচ্যে মানুষ এত বেশী অন্তর্মুখী, সেই কারণেই এমন রক্ষণশীল। পক্ষান্তরে প্রতীচ্যের মানুষ প্রধানত বহির্মুখী, সেই কারণেই এত বেশি অস্থির উদ্দাম ও কর্মচঞ্চল। এই জন্যে প্রতীচ্য মূলত অস্তিবাদী, আর প্রাচ্য পরিণামবাদী। ভাল মন্দের প্রশ্ন তুলছি না। দুই মানবগোষ্ঠীর মধ্যে দর্শন ও মননের এই মৌল পার্থক্য সমস্ত বাইরের সাজ সরঞ্জাম ও উদ্যোগ আড়ম্বরকে অতিক্রম করেই অদ্যাবধি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দুই শতাব্দীর আনাগোনা ও আদান-প্রদানে গড়ে-ওঠা এত নৈকট্যের মধ্যেও এই ব্যবধান ঘোচেনি। কোনদিনই ঘুচবে কিনা জানি না। ঘুচলে অধ্যাপক উডরো এবং তাঁর মন্ত্রগুরু টয়েনবির সিদ্ধান্তই জয়যুক্ত হবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু বিশ্ব-মৈত্রীর মহান আদর্শ কাম্য বলে মেনে নিয়েও, এশিয়া আফ্রিকার ঐতিহ্যগত স্বাধিকার রক্ষা যাঁরা অভিপ্রেত মনে করেন, তাঁরা নিশ্চয় এতে সুখী হবেন না।

॥ ভারতের ঐক্য ॥ সেকালে ও একালে ॥

ভারতবর্ষের ইতিহাস সযত্নে অনুশীলন করলে দেখা যাবে, যে অর্থে ইতালী ফ্রান্স জাপান পারস্য মিশর বা জার্মানী এক-একটা দেশ এবং সেখানকার মানুষরা এক একটা জাতি, ভারতবর্ষ সে অর্থে একটা দেশও নয়, আমরা ভারতবাসীরা একটা জাতিও নই। ভাষা-ভূষা ধর্ম আহার ও আচার-সংস্কারে আমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে, সহসা ঠিক কোনখানে

ভারতীয় ঐক্য তা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। শেষ পর্যন্ত তাই সংস্কৃতি ও জীবন-দর্শনে ঐক্যের দোহাই দিয়ে বাহিরঙ্গিক অনৈক্যগুলি চাপা দিতে চেষ্টা করি আমরা। কিন্তু চাপা দিয়ে ত সমাধানে পৌঁছান যাবে না, তাই সমস্যার মূলটা একটু যাচিয়ে দেখা যাক। অতীতে কাশী কোশল বিদর্ভ রাঢ় পৌণ্ড্র কেরল, অসংখ্য ছোট-বড় জনপদে বিভক্ত ছিল ভারতভূমি। সাধারণভাবে অধিবাসীরা সবাই হয়ত নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচিত করতেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন সর্বভারতীয় ঐক্য বা একজাতিত্ববোধ গড়ে ওঠেনি। চিরদিন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহই চলেছে এবং তা চলেছে আঞ্চলিক সীমানা নিয়ে, নদীর জল নিয়ে, ধর্ম নিয়ে। চলার কারণও ছিল। কত দিক দেশের ও জাতির মানুষরা ইতিহাসের সূচনা কাল থেকে এখানে এসে বসতি করেছেন, তা সবাই জানেন। কালক্রমে সবাই তাঁরা এখানকার বাসিন্দা হয়ে গেলেও, এই বিশাল উপমহাদেশের মাটিতে সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়নি তাঁদের। আপন আপন নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যগুলি বজায় রেখেই টিঁকে থেকেছেন তাঁরা এবং বিবাদ বিরোধ যা হয়েছে, তা হয়েছে এই অনস্বীকার্য পার্থক্যগুলি নিয়েই। যুগে যুগে শক্তিশালী সম্রাট ও শাসকরা চেয়েছেন অবশ্য ভারতকে এক সার্বভৌম শাসনের অধীনে এনে ঐক্যবদ্ধ করতে। অশোক সমুদ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন থেকে আকবর ঔরংজেব পর্যন্ত চলেছে সেই একীকরণের প্রয়াস। ফল কি হয়েছে, তা ত সর্বজনবিদিত। যা রাজনীতিক দিক থেকে সম্ভব হয়নি, ধর্ম ও সংস্কৃতিক দিক থেকে তাকে কার্যকর করার চেষ্টা হয়েছে। তাও সমভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ জৈন ইসলাম খ্রীষ্টান, একের পর এক ধর্ম উঠেছে ভারতবর্ষে এবং পরস্পরের মধ্যে তাতে দূরত্বের গণ্ডী উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে।

বৈদিক আর্যেরা ভারতবর্ষে প্রভুত্ব বিস্তার করেছেন, কিন্তু প্রাগার্য কোলীয় এবং দ্রাবিড়দের তাঁরা স্বগোষ্ঠীভুক্ত করে নিতে পারেন নি, তাঁদের রেখেছেন শূদ্র তথা দাস করে। বৌদ্ধরা উঠেছেন, চেয়েছেন চাতুর্বর্ণে বিভক্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সাম্রাজ্যবাদী বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত করতে। পারেন নি। তাঁরা নিজেরাই শেষ পর্যন্ত পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে হিন্দুধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছেন। মুসলমানরা এসেছেন, তাঁদের প্রভাবে বহুসংখ্যক মানুষ ইসলামধর্ম গ্রহণও করেছেন। কিন্তু তাঁরা হিন্দুগরিষ্ঠতাময় ভারতে থেকেছেন সংখ্যাল্প শ্রেণী

হয়েই, আজও আছেন তাই। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী ইংরেজরা এসেছেন, ধর্মান্তরণের পথে জনসাধারণের নগণ্য একটি অংশকেই মাত্র খ্রীষ্টান করতে পেরেছেন তাঁরা। রাষ্ট্রকর্তৃত্ব হাতে থাকায় খ্রীষ্টানরা ইউরোপে এবং মুসলমানরা মধ্য-প্রাচ্যে অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ায় তাঁদের ধর্ম সর্বজনকে গ্রহণ ও স্বীকার করাতে পেরেছেন। কিন্তু বৌদ্ধ মুসলমান ও খ্রীষ্টান শাসকরা তা করতে পারেন নি ভারতবর্ষে। এর ভৌমিক বিশালতা এবং নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ভাষাভিত্তিক বিভিন্নতাই বাধা হয়েছে। বাধা হয়েছে সামাজিক রীতি-নীতি আচার-অভ্যাসও। অর্থাৎ সত্যকার ঐক্য বা সংহতি ভারতবর্ষে অতীতে কোনদিন গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষ চিরদিন একটা রাজ্যসমবায় বা ফেডা-রেশনের মত হয়ে থেকেছে, যার অন্তর্ভুক্ত জনপদগুলি আপন স্বাধিকার বর্জন করে একে অন্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায় নি। এত ভাঙাগড়ার মধ্যে আজও এইসব স্বাধিকার-চিহ্ন আমাদের মন ও মাটিতে কতটা বেঁচে আছে, তা বোঝা যায় ভারতের আঞ্চলিক বলয়গুলির জীবনযাত্রা লক্ষ্য করলেই। সাধারণভাবে হয়ত উত্তরের সঙ্গে পশ্চিমে এবং দক্ষিণের সঙ্গে পূর্বের কিছু মিল দেখা যায়, কিন্তু সেও সামান্যই। বিশদ বিচারে বোঝা যাবে ভারতবর্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ চারটি বলয়ে বিভক্ত এবং তারা প্রত্যেই অনায়াসে এক-একটা দেশরূপে অভিহিত হতে পারে। অতীত ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক একত্ব নিয়ে সংস্কৃতি-ব্যাখ্যাতারা যে সুলভ সিদ্ধান্তগুলি প্রচার করেন, তার বেশীর ভাগই ইতিহাস হিসাবে অনির্ভরযোগ্য। কুরুক্ষেত্র গয়া প্রভাস পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থের এবং গঙ্গা যমুনা গোদাবরী নর্মদা প্রভৃতি নদীর নামকে যদিও একত্র গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়েছে শ্লোকের আকারে, কিন্তু জীবনচর্যায় একত্বের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না কোথাও। কেশ ও বেশবিন্যাস এবং খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে বিবাহ শ্রাদ্ধ উত্তরাধিকার ও পূজা পার্বণ পর্যন্ত, সব ব্যাপারেই ভারতের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের পার্থক্য সুস্পষ্ট। এত স্পষ্ট যে তা অস্বীকার করলে অসত্যকেই কবুল করা হবে।

হাউসোফার ডিলথাই প্রমুখ জিও-পলিটিক্স বা ভূ-রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ বলেন, প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর অন্তর মানুষের রীতি-নীতি ভাষা ও আচার-সংস্কার একটু একটু করে বদলায়। এই বদলাটা যথেষ্ট লক্ষণীয় হয় পঞ্চাশ মাইলের ফারাক ঘটলে। পাঁচশো মাইলের তফাতে গেলে প্যাটার্ণ অব লাইফ বা জীবনযাপনের ধরণটাই দেখা দেয় ভিন্ন মূর্তিতে। এটা যেখানে

হয় একই ভৌমিক ও নৃতাত্ত্বিক তথা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে, সেখানে গোষ্ঠীর বিভিন্নতা ঘটলে, ব্যবধান আরও যে কত বড় হয়, তা নিশ্চয় বুঝিয়ে বলতে হবে না। আর্য দ্রাবিড় মোঙ্গল গ্রীক সারাসেনীয় শক হূন, কত দূর দূরান্তের নৃ-প্রবাহই ভারত মাটিতে এসে মিশেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে। এ ক্ষেত্রে একটি সর্বভারতীয় প্রশাসন বলবৎ থাকলে, এই মিশ্রণের গড়ন হত মার্কিন দুনিয়ার মত। কিন্তু গোড়া থেকেই ভারতের অধিবাসীরা একটি কল্পিত সর্ব-ভারতীয়তার আড়ালে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য জীইয়ে রেখেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। গোটা দেশে কোন দিনই একাত্মিক কেন্দ্রীয় শাসন তৈরি হয়নি এবং তা সকলকে নির্দিষ্ট একটি ছাঁচের আনুগত্যও স্বীকার করাতে পারেনি। এর ভালমন্দ নিয়ে তর্কে সময়ক্ষেপ অর্থহীন। কার্যত ব্যাপার যা হয়েছে তাই বললাম। এইজন্যেই ভারতবর্ষে আজও অস্পৃশ্যতা দূর হয় নি। এমন কি একই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও পান ভোজন এবং বিবাহ চলে না। আঞ্চলিক সীমানা নিয়ে, ভাষা নিয়ে, চাকরির অধিকার নিয়ে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রেষারেষির অন্ত নেই। এক অঞ্চল শিল্পে বাণিজ্যে অগ্রসর হয়ে বা রাজ-নীতিক কর্তৃত্বে প্রাধান্য লাভ করে, অন্যান্য অঞ্চলকে শোষণ করতে বা দাবিয়ে রাখতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এই সঙ্গে আছে ধর্মীয় বিভিন্নতাজনিত বিরোধ, যার হিংস্র কুৎসিত রূপটি একদা প্রত্যক্ষ করা গেছে দেশবিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিতে। কিন্তু তার পরেও কি এই দুর্ভোগের শেষ হয়েছে? একেবারেই তা যে হয় নি, তা ভুক্তভোগীরা ত বটেই, নিরপেক্ষ দ্রষ্টারাও জানেন! এইজন্যেই ভারতবর্ষ একদেশ কিনা এবং ভারতবাসীরা একজাতি কিনা, সে প্রশ্ন তুললে জিজ্ঞাসু বিদেশীকে সদুত্তর জোগাতে ফাঁপরে পড়তে হয়। সেই কারণেই আমার মনে হয় সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন সাধারণতন্ত্রের মত ভারতবর্ষকেও বহু জাতিক রাজ্য সমবায় বা মাল্টি-ন্যাশনাল ফেডারেশন অব স্টেটস সংজ্ঞায় অভিহিত করা উচিত। একজাতি একপ্রাণ ও একতার জয়গান করা আদর্শগত প্রেয়োত্বের অবশ্যই সহায়ক, কিন্তু ইতিহাস সে কথার সমর্থন করে না গত পাঁচ হাজার বছরের কোন অধ্যায়েই।

২.

পৃথিবীতে ভারতবর্ষে অনুরূপ বহু ভাষাভাষী ও বিচিত্র আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী দেশ কম নেই এবং এইসব বৈষম্য-সঞ্জাত সংকট-সমস্যার মোকাবিলা করতে কম বেগ পেতে হয় না তাদেরও। ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড ও

ওয়েলস নিয়ে গ্রেট বৃটেন। এর মধ্যে আয়ারল্যাণ্ড দীর্ঘদিন বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা বৃহৎ ভূখণ্ডকে পরশাসনের বাইতে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। সেইটুকুই হল আজকের আইরিশ ফ্রী ষ্টেট। স্কটল্যাণ্ডও যে বৃটিশ প্রাধান্য খুশিমনে মেনে নেয়নি, তার প্রমাণ এখনো স্কটদের মধ্যে আত্মস্বাতন্ত্র্য লাভের আন্দোলন ধোঁয়াচ্ছে। মাত্র কিছুদিন আগেই পার্লামেণ্ট ভবন থেকে করোনেশন ষ্টোন বা অভিষেক শিলা অপহৃত হয়, যা তাঁদেরই কাজ। স্কচ ভাষা, আয়ারভূমির গ্যালিক ভাষা এবং ওয়েলসীয় ভাষা নিঃসন্দেহে দমিত হয়েছে ইংরেজী ভাষার দাপটে। কিন্তু জনমত তাতে প্রসন্ন নয় মোটেই। সুইজারল্যাণ্ডে চলে একই সঙ্গে সমমর্যাদা সম্পন্ন তিনটি ভাষা। জুরিক অঞ্চলে চলে জার্মান, জেনেভায় ফরাসী ও লুগানোতে ইতালীয়ান। পার্লামেণ্টের অধিবেশনও হয় প্রতি বৎসর পর্যায়ক্রমে এক এক অঞ্চলে চার মাস করে। বেলজিয়ামে ফ্লেমিশ ও বেলজিয়ান এবং স্পেনে বাস্ক ও স্প্যানিশ ভাষার ঝগড়া আজকের নয়। আলসাস ও লোরেনের এক প্রান্তে ফ্রান্স অন্য প্রান্তে জার্মানী থাকায়, এই ছোট্ট মুল্লুক দুটির প্রশাসন যে কতবার হাত বদল করেছে এবং তার ফলে তাদের যে কতবার ভাষা বদলের ঝকমারি ভোগ করতে হয়েছে, আলফঁস দোদের বিখ্যাত গল্পে আছে তার আংশিক আভাস। কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী দুটিই-সরকারী ভাষা, যদিও রাষ্ট্রে ইংরেজদের প্রাধান্য হেতু ফরাসীরা সেখানে দু-নম্বরের নাগরিকে পরিণত। দ্য গল যখন ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, কানাডায় গিয়ে তাই তিনি ফরাসী স্বাধিকার পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে রীতিমত মদৎ জুগিয়েছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ায় এবং যুগোশ্লাভিয়ার সার্বিয়া ও ক্রোশিয়ায় বোল আনা সম্প্রীতি আজও গড়ে ওঠেনি। অতীতে ত যুদ্ধ বিগ্রহই হয়েছে ঢের। এখন কম্যুনিস্টদের কর্তৃত্বে এসে জনগণ ক্রমশ আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বর্জন করে একাত্মিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দিকে মন দিয়েছেন। হয়ত পুরাতন অষ্ট্রো-হাঙ্গারীয় সাম্রাজ্যের বা জারীয় সাম্রাজ্যের বকেয়া ঐতিহ্যরূপে যে স্বাজাত্য-চেতনা এখনো পূর্ব ইউরোপের মন ও মাটি আঁকড়ে আছে, তা ধীরে ধীরে পাল্টে যাবে কম্যুনিস্ট সমভাবনের আওতায় এসে। অন্তত বহুজন সেই শুভ সম্ভাবনার আশা পোষণ করেন।

সফল একীকরণের নিদর্শন হিসাবে পৃথিবীর বৃহত্তম তিনটি দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন সাধারণতন্ত্রের নাম এই প্রসঙ্গে বোধ হয়

উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা কি ভাবে বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্ম ও আচার-সংস্কারে অভ্যস্ত জাতিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা জানলে হয়ত আমরা উপকৃত হব। রাশিয়ায় লেনিন যখন শাসন-কর্তৃত্ব অধিকার করলেন, তখন মধ্য এশিয়ায় ব্যাপ্ত রুশ সাম্রাজ্যের বহু অংশে ছিল কিরঘিজ তাজিক উজবেক প্রভৃতি ভাষার প্রচলন। এই সব ভাষার অনেকগুলিরই কোন বর্ণমালা পর্যন্ত ছিল না। সেই সব লোক-ভাষাকে বর্ণমালা ও ব্যাকরণের শৃংখলায় বেঁধে আগে প্রত্যেকটাকে জাতীয় ভাষা রূপে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তারপর সকলকে আবশ্যিক ভাবে রুশ ভাষা গ্রহণ করান হয় সরকারী ভাষারূপে। খ্রীষ্টান ইহুদী [ইদ্দিশ] মুসলীম বৌদ্ধ, নানা ধর্মাবলম্বী ছিলেন এশীয় রাশিয়ার অধিবাসীরা। তাঁদের রুশ একজাতীয়তা-বোধে অভিষিক্ত করা সহজ হয় সুদৃঢ় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ-শৃংখলার এক্তিয়ারে আনার ফলে। চীনের কমুনিষ্ট কাঠামোতে বিবর্তন ত আমাদের স্বাধীনতা লাভের দুই বৎসর পরের ঘটনা। উত্তর চীনের ইযেনান থেকে লাল ফৌজ ইয়াংসি পার হয়ে যখন দক্ষিণে হাজির হয়, তখন পর্যন্ত দক্ষিণের মানুষ বেশির ভাগই ছিলেন চিয়াংপন্থী। অনেকেই ছিলেন দীর্ঘকালব্যাপী গৃহযুদ্ধের সিপাহী। সেই সহস্র আঘাতে বিধ্বস্ত বিরাট দেশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল বহু ভাষা, বহু নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক বিভিন্নতা। চীন অবশ্য নামে স্বাধীন দেশ ছিল, কিন্তু নানা বিদেশী শক্তি তার কাঁধে চেপে ছিল নানা অজুহাতে। তার শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষ, সর্বক্ষেত্রে কলকাঠি নাড়ত তারাই। মাত্র তিনটি দশকেই তাকে একাত্মিক এক অসীম শক্তিশালী দেশে রূপান্তরিত করেন মাও-সে-তুংঙের নেতৃত্বে কমুনিষ্ট পার্টি।

এই একীকরণের সব চেয়ে বড় পরিচয় হল বর্তমান চীনা ভাষা, যা ছোট বড় গোটা ত্রিশ আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ও ব্যাকরণবিধি সমীকরণের ফল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাঁচ আলাদা। কিন্তু একীকরণের পথে লক্ষণীয় সফলতা তাঁরাও অর্জন করেছেন। ইংরেজ ফরাসী জার্মান স্প্যানিশ পর্তুগীজ ডাচ নরওয়েজীয়, নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষরা আমেরিকায় যান আদি-ঔপনিবেশিক রূপে। ইংরেজী ভাষার ঐক্যসূত্র আশ্রয় করে তাঁরা একজাতি হিসাবে সংহত হন এবং ইংল্যাণ্ডের তাঁবেদারি ঝেড়ে ফেলেই একদিন স্বাধীন সার্বভৌম শক্তির স্বাক্ষর অঙ্কিত করেন পৃথিবীতে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যে আজ প্রাগ্রসর দেশ রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৌরব অবশ্যই অনস্বীকার্য। যে

ভাবে গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করে একদা তাঁরা দেশের ঐক্য রক্ষা করেছিলেন, তাও কম গৌরবের নয়। অবশ্য বিশ্বরাজনীতিতে তার ভূমিকা সাম্প্রতিককালে সমালোচনার যোগ্য হয়েছে। নিগ্রো সমস্যার কথা না হয় আর নাই তুললাম, যদিও জাতীয় ঐক্যের দিক থেকে তা খুব অগণনীয় সমস্যা নয়।

অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের সংকট শুধু ভারতেই নেই, তা আছে আরো অনেক দেশে। তবু মোটামুটি একটা ভারতীয় ঐক্যের কাঠামো তৈরি করেছিলেন ইংরেজরাই। এক কেন্দ্রীয় প্রশাসন, এক আইন, এক মুদ্রাব্যবস্থা, এক সরকারী ভাষা এবং এক ডাকপথ ও রেলপথে ভারতবর্ষকে প্রথম ঐক্যবদ্ধ করেন তাঁরাই। চলতি প্রশাসন ও বিচার বিভাগের ছাঁচে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও মানবিকী বিদ্যার তথা আইন, চিকিৎসা ও উচ্চ কারিগরী শিক্ষার রাজ্যে সর্বাঙ্গীণ সমতাও তাঁদেরই দান। এই তৈরি কাঠামোটা হাতে পেয়েছিলেন বলেই, শিক্ষিত ভারতবাসী যখন রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন, তখন অত অনায়াসে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী ও উড়িষ্যা থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত, গোটা ভারতবর্ষকে আলোড়িত করতে পেরেছিলেন। দুঃখের বিষয় এই তথাকথিত সর্বভারতীয় ঐক্য ছিল যতটা পর্যন্ত ভাবের ঐক্য, ততটা বাস্তবের নয়। প্রথমত যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ইংরেজী, যা পাঁচ হাজারে একজনও জানতেন না। এখনো জানেন না। কাজেই দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টি, চাষী কারিগর ও দেহশ্রমী সাধারণ মানুষরা কেউ কারো অন্তরের কাছাকাছি পৌছান নি। দ্বিতীয়, বিদেশী শাসনের লৌহ-নিগড় ভাঙার দুষ্কর কাজে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই অচিরস্থায়ী সংগ্রামের আড়ালে জীবনের সর্বকালীন সমস্যা যেগুলি, বিভিন্ন এলাকার ভৌমিক সীমানা, ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতিক ও সামাজিক অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি, তার একটা সম্বন্ধেও কোন সুচিন্তিত বা প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত গড়ে তোলা হয়নি। তা গড়ার উপায়ও ছিল না দেশব্যাপী নিরক্ষরতার দাপটে। জাতির সবটুকু শক্তি ব্যয়িত হয়েছিল হিংস-অহিংস দু-রকম-সংগ্রামে। সাধীনতা যখন এল, তা আমরা অর্জনই করে থাকি, আর পেয়েই থাকি, ঐ অমীমাংসিত বিরোধগুলো একে একে এগিয়ে এল তখন তাদের হিংস্র নখ-দাঁত নিয়ে। প্রথম বিপর্যয় হল দেশভাগ ও পৃথক দেশ রূপে পাকিস্তানের আবির্ভাব। কিন্তু সেখানেই ত শেষ নয় বিপত্তির। ধর্ম ও শ্রেণী-বৈষম্য-বিড়ম্বিত সাবেকী সমাজের ছক অব্যাহত রেখেই কংগ্রেসকে

দেশ শাসনের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন ইংরেজরা। তার ফল উত্তর প্রদেশের রাজনীতি, রাজস্থানের মূলধন এবং বিহার ও মধ্যপ্রদেশের শ্রমশক্তি একযোগে হিন্দী ভাষার মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে জোটবদ্ধ হল সারা ভারতে আত্মপ্রাধান্য বিস্তারের আশায়, আর তাকেই বোঝান হল সর্বভারতীয় সমন্বয় বলে। এর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া অহিন্দী-বলয়গুলির ওপর কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। তার মানে সার্থক ভারতীয় ঐক্য আসতে পারে, একমাত্র প্রকৃত সাম্যবাদের পথেই, যা বিনা বিপ্লবে আসার জিনিস নয়।

॥ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ও সংবিধান ॥

আমাদের সংবিধানে ভারতের রাষ্ট্রীয় ছাঁচকে ফেডারেল বা রাজ্য সমাহারমূলক বলে অভিহিত করা হয়েছে। ফেডারেল কাঠামোর স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ব্রাইস বলেন, ফেডারেল গভর্নমেণ্টে কেন্দ্রীয় সরকার পররাষ্ট্র নীতি ও আন্তর্জাতিক বাট্টা হার নির্ধারণ, যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি স্থাপন, বহির্বাণিজ্য ও আমদানি শুল্ক নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা ব্যবস্থা, আন্তঃরাজ্য আদান-প্রদান, ডাকপথ, রেলপথ ও বিমান পথ পরিচালন ইত্যাদির কর্তৃত্ব নিয়ে থাকবেন। আর অঙ্গরাজ্যগুলি শিক্ষা চিকিৎসা খাদ্য ও জীবিকা বণ্টন এবং শান্তি শৃংখলা, বিচার ও প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করবেন। এজন্যে স্বাধিকার সম্পন্ন কোর্টকাছারি, অফিস ষ্টেশন পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী রাখতে পারবেন। ডাকপথ, রেলপথ, বিমানপথ এবং বহির্বাণিজ্য কেন্দ্রাধীন হলেও একান্ত ভাবেই যেহেতু হবে রাজ্যগুলির উপর নির্ভরশীল, তাই তৎসংক্রান্ত আয়ের বৃহৎ একটা অংশ রাজ্যসমূহের প্রাপ্য হবে। পক্ষান্তরে কেন্দ্রকে যেহেতু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা, যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনা এবং সার্বদেশিক যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে, সেই হেতু তাকেও কোর্টকাছারি অফিস ষ্টেশন সৈন্যবাহিনী, অনেক কিছুই রাখতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন হবে সৈন্যবাহিনী, কেননা, সমগ্র দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করছে তার ওপরই। সাধারণ অবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রযাত্রা হবে সমান্তরাল এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ। শুধু দুর্ভিক্ষ মহামারী বহিরাক্রমণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্যকে সর্বাত্মক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই রাজ্য কেন্দ্রের তাঁবেদার হবে না। তার আঞ্চলিক ভাষা, আচার সংস্কার, শিক্ষা, ধর্মীয় রীতি নীতি, সামাজিক অনুশাসন, বিবাহ উত্তরাধিকার অন্ত্যেষ্টি ইত্যাদির স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকবে। এমন

কি, আবশ্যক বুঝলে, নীতিগত ভাবে রাজ্য কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্য লাভেরও প্রয়াস করতে পারবে। ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের স্বরূপ কি হওয়া উচিত, তা বোঝানোর জন্যে আমি উপরে যে দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দিলাম, আশা করি তারপর আর কিছু বলার প্রয়োজন হবে না। এর বিপরীত হল ইউনিটারি বা একাত্মিক ছাঁচ। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বময় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্পদ, খনি খাদ জঙ্গল জলাশয় থেকে বিদ্যুৎ কৃষিক্ষেত্র খামার কলখানা ডাক-তার ও যানবাহন পর্যন্ত, আবার অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, বিচার ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে বহির্বাণিজ্য, পররাষ্ট্র নীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত, সব কিছুই কেন্দ্রাধীন। রাজ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত অঞ্চল এবং তত্রত্য সরকারগুলি আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের শাখা মাত্র। তাদের কোন কোন স্বাধিকার স্বীকার্য হতে পারে, একমাত্র কেন্দ্র অনুমোদন করলে। তা না হলে ভাষা ভূষা খাদ্য পানীয় শিক্ষা জীবিকা, সব ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে থাকতে হয় বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে।

কোন রাষ্ট্রের ছাঁদ ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক যাই হোক না কেন, ফেডারেল ও ইউনিটারি ছাঁচের রূপ এ দুই ছাড়া সংবিধানবিশেষজ্ঞদের মতে অন্য কোন রকম হয় না। এখন প্রশ্ন হতে পারে, বিশুদ্ধ ফেডারেল বা বিশুদ্ধ ইউনিটারি গভর্ণমেণ্ট কি আজকের দুনিয়ায় কোথাও আছে? বলা প্রয়োজন যে ফেডারেল ছাঁচের সর্বোত্তম নিদর্শন হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একমাত্র বিচ্ছিন্নতার সুযোগ বা অধিকার ছাড়া সেখানে অঙ্গরাজ্যগুলি, যার সংখ্যা পঞ্চাশাধিক, মোটামুটি পূর্ণ স্বাধিকারই ভোগ করে। রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট নামে সর্বাধিনেতা হলেও, রাজ্যপ্রশাসনের কর্তৃত্বে তিনি বাধা সৃষ্টি করেন না কোন সময়ই। অবশ্য যুদ্ধ বিগ্রহ ও জরুরী অবস্থাকালের কথা আলাদা। সোভিয়েত রাশিয়ার ছাঁচও ফেডারেল এবং এশিয়া ইউরোপের বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে অবস্থিত এই বিরাট দেশে নানা ধর্ম, ভাষা ও আচার সংস্কারে অভ্যস্ত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করেই লেনিন গড়ে তোলেন বর্তমান সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের কাঠামো। মার্কিন দুনিয়ার সর্বত্র ইংরিজিই একমাত্র ভাষা হিসাবে গোড়া থেকে চলিত থাকায়, ওঁদের সাংগঠনিক কাজে যে সুবিধা হয়েছিল, তা হয়নি রাশিয়ায়। তাই রুশ ভাষাকে সর্বজনীন যোগাযোগের ভাষা রূপে সারা দেশে বাধ্যতামূলক করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষায়

ও প্রশাসনে রাজ্য ভাষার অধিকার সর্বতোভাবে রক্ষা করা হয়েছে। রক্ষা করা হয়েছে খাদ্য পানীয় ও আচার সংস্কারের স্বাতন্ত্র্যও। তবু কি মার্কিন দুনিয়ায় আর কি সোভিয়েত মুল্লুকে কেন্দ্ররাজ্যে পূর্ণ সমঝোতা একদিনে আসেনি। বহির্গমনের আন্দোলন হয়েছে মার্কিন মুল্লুকেও, হয়েছে রাশিয়াতেও এবং উভয় ক্ষেত্রেই সে প্রয়াস দমিত করতে হয়েছে কেন্দ্রকে বলপ্রয়োগ করে। অর্থাৎ বহির্গমনের অধিকারটা যতটা পুঁথিগত, ততটা বাস্তব নয়। এই কেতাবী অধিকারকে রূপ দিতে হলে হাতিয়ার ধরতে হয়, যার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সার্বভৌম বাংলা-দেশের আবির্ভাবে। কেন্দ্রীয় সরকার যথাসম্ভব নিরপেক্ষ হলে এবং সম-দর্শিতার সঙ্গে রাজ্যগুলির দাবি দাওয়া পূরণে অবহিত হলে, অবশ্য একরকম চরম পন্থা নেবার প্রয়োজন হয় না। তবে অল্পবিস্তর অসন্তোষ ও বিরোধ সব সময়ই থাকতে পারে, থাকেও। যাই হোক এই একটি ক্ষেত্রে রাশিয়ায় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল বা রাজ্য-সমাহারমূলক ছাঁদ অনেকটাই এক রকম হতে দেখা যায়, যদিও দুইয়ের রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার অন্যান্য ক্ষেত্রে রয়েছে দুস্তর ফারাক। রাশিয়ার তুলনায় চীনের রাষ্ট্র কাঠামো গোড়ার ধাপে প্রধানত একাত্মিকই ছিল, বোধহয় মাও-সে-তুং-এর একক ব্যক্তিত্ব উত্তর ও দক্ষিণ চীনকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল বলে এবং গঠনের অধ্যায়ে গোটা দেশের শক্তি এবং সম্পদ একত্র করে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদাগুলির মোকাবিলা করতে হয়েছিল বলে। এছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। তবে ক্রমশ তাঁরাও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের হাত আলগা করে আনছেন।

অবশ্য লক্ষ্য করার বিষয় যে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সর্বত্র মার্কিনী ফেডারেল কাঠামোর গুণগান শোনা গেলেও, রাশিয়া ও চীনের সংগঠনকে তাঁরা বরাবর একাত্মিক ও সমষ্টিবাদী প্রবণতাসম্পন্ন বলেই চিহ্নিত করেন। সন্দেহ নেই যে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুবিদিত প্রশাসনিক পদ্ধতির সঙ্গে তাঁদের মিলের চেয়ে গরমিল বেশী এবং স্বাতন্ত্র্যের নামে কোন বেপরোয়ামিকেই তাঁরা প্রশ্রয় দেন না। তাই এই রকম ছাঁচকে পশ্চিমী সমালোচকরা তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে পদে পদে ধিক্কৃত করেন। বস্তুত এ দুই ছাঁচের ভালমন্দ নিয়ে তুলনায় বিচারের অবকাশ থাকলেও, তা হল সম্পূর্ণ অন্য জিনিস এবং আমাদের প্রয়োজন-বহির্ভূত সে আলোচনা। এখানে কথা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি নিয়ে। তা সর্বগ্রাসী এবং সকলের সব বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা মুছে

দিয়ে একক প্রাধান্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, না সকলকে অবাধ আত্মবিকাশের অধিকার দিয়ে সকলের সমবায়ে নিজেও বিচিত্র হয়ে উঠেছে, তাই হল প্রধান বিচার্য। এই উপলক্ষে বিশ্বের প্রধান তিনটি রাষ্ট্রের প্রসঙ্গ আমরা বলেছি। এদের সহযাত্রীরূপেই উল্লেখ্য ভারতের নাম, যার কথায় আমরা পরের অধ্যায়ে আসব। এখানে বলে রাখি যে সত্যিকার একাত্মিক রাষ্ট্র বলতে উত্তর ইউরোপের স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশগুলির অর্থাৎ নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক ফিনল্যাণ্ড ইত্যাদির এবং পূর্ব ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত ভূতপূর্ব বল্কান দেশগুলির, যথা হাঙ্গারী পোলাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়া যুগোশ্লোভিয়া ইত্যাদির নাম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। লোক সংখ্যার অল্পতা, সীমিত ভৌমিক আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, ভাষার একত্ব, নানা কারণেই স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশগুলির ছাঁচ সুসাধ্য হয়েছে। বল্কান মুল্লুকে তা হয়েছে কমিউনিষ্ট শাসনের দৃঢ়তায়, নইলে কে না জানেন যে চেকভূমিতে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার এবং যুগোশ্লাভভূমিতে সার্বিয়া ও ক্রোশিয়ার মধ্যে বিরোধ সেই অষ্ট্রো-হাঙ্গারীয় সাম্রাজ্যের আমল থেকেই একটানা ধূমায়িত হয়েছে? অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ভাষার বিরোধও ইন্ধন জুগিয়েছে সেই দ্বন্দ্বে। জার আমলে রাশিয়া জোর করে অধিকৃত পোল্যাণ্ডে রুশ ভাষা চালাতে গেলে, একদা তা প্রতিরোধের জন্যে ভীষণ যুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছিল। তথাকথিত সহনশীলতা ও সমন্বয়ের দৃষ্টান্তস্থল না হলেও, ইংল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক সংগঠন একাত্মিক। আইরিশ ফ্রী স্টেট লড়াই করে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস তা পারেন নি। নিজস্বতা বিসর্জন দিয়েই তারা বৃটেনের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। নিয়েছে অবশিষ্ট আয়ারভূমিও। জার্মানী কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যথার্থই একাত্মিক রাষ্ট্র ছিল, যা আজ পূর্ব-পশ্চিমে খণ্ডিত হয়েছে। অঞ্চলগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত করার জন্যে নয়, দুই বিজয়ী বিশ্বশক্তির দ্বারা অধিকৃত দুই অঞ্চলের রাজনীতিক ছক আলাদা হওয়ায়। কোনদিন ওরা এক হলে হয়ত আবার সেই পুরান রাষ্ট্রীয় মর্যাদাসম্পন্ন ডয়েটস্ল্যাণ্ডই দেখা দেবে, কেন না গ্রেট বৃটেনের মত তার মৃত্তিকায় আঞ্চলিক বিরোধের বীজ লুকিয়ে নেই।

২.

আগের অধ্যায়ে পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রীয় ছাঁচ কি রকম অর্থাৎ তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক কেমন, তার সংক্ষিপ্ত

একটা খসড়া তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। সেই আলোতে এবার আমাদের কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কটা কেমন, এ সম্বন্ধে সংবিধানের নির্দেশ কি তা আলোচনা করা যাক। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সংবিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষ একটি ফেডারেল বা রাজ্য-সমাহারমূলক রাষ্ট্র। অর্থাৎ এখানে অভ্যন্তরীণ শাসন শৃঙ্খলা, শিক্ষা সংস্কৃতি, শিল্প বাণিজ্য জীবিকা ও সমাজকল্যাণ সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে রাজ্যগুলি ভোগ করবে পূর্ণ স্বাধিকার। এই অধিকারে কেন্দ্র কোন অবস্থাতেই হস্তক্ষেপ করবে না, একমাত্র শান্তি শৃঙ্খলার অপহ্নব বা যুদ্ধের মত কোন জাতীয় বিপর্যয় ছাড়া। এছাড়া বহিরাক্রমণ বা রাজ্যে রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বা আঞ্চলিক সীমা নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে, অথবা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে, তার মোকাবিলাতেও কেন্দ্রকে আগুয়ান হতে হবে। তবু কোন কারণেই রাজ্য কেন্দ্রের তাঁবেদার হবে না। যে যে বিষয় কেন্দ্র-সংরক্ষিত, যেমন রেলপথ, বিমানপথ, ডাক-তার, বেতার, আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, সেখানে কেন্দ্র অপক্ষপাতী সমদর্শিতায় সমস্ত রাজ্যকেই এ সবের সুযোগ দেবেন। প্রতি রাজ্যের সামাজিক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক উন্নতিতে যথাসম্ভব সহযোগিতা করবেন। ফেডারেল কাঠামোর মৌলিক সর্ত বলে বিবেচিত এই বিস্তৃত বিষয়সূচীর উল্লেখ করা হল শুধু এইজন্যে যে এর নিরিখে পাঠক-পাঠিকা অনায়াসেই যাচাই করে দেখতে পারবেন, আমাদের প্রাশাসনিক কাঠামো যথার্থই ফেডারেল কি না? বলা নিষ্প্রয়োজন যে অনেকের মত বর্তমান লেখকও মনে করেন যে রাজ্য-সমাহারের ছদ্মবেশে আমরা উত্তরোত্তর বেশী করে ইউনিটারি বা একাত্মিক ছাঁচের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি। সবাই জানেন, প্রতি রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিভূরূপে একজন করে রাজ্যপাল মোতায়েন থাকেন, যিনি শাসন সংকট বা শান্তি শৃঙ্খলাহানির অজুহাতে যে কোন সময় চলতি গভর্নমেণ্ট ভেঙে দিয়ে স্বহস্তে শাসন ভার নিতে এবং পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে যেখানে বহুদিন স্বাভাবিক অধিকারে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করেন, সেখানে কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দল ক্ষমতাসীন না হলে এ হামেশাই হতে পারে। তা ছাড়া দল ভাঙিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস ও সেই সুযোগে গভর্নমেণ্টের পতন ঘটান একটি সুবিদিত কৌশল। এরপরই আছে বিক্ষোভ ও অশান্তি দমনের নামে রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার বহির্ভূত কেন্দ্রীয় পুলিশের রিজার্ভ বাহিনী পাঠিয়ে, জনসাধারণকে সায়েস্তা করার রেওয়াজ।

আছে বিশেষ বিশেষ পণ্য উৎপাদনের এবং গঠন ও উন্নয়নমূলক বিবিধ পরি-পরিকল্পনা রূপায়ণের অধিকার রাজ্যকে দেওয়া না দেওয়ার এবং সেইভাবে কোন কোন রাজ্যকে পশ্চাদ্বর্তী করে রাখার রেওয়াজ। আছে জবরদস্তি কর চাপানর রেওয়াজ। সর্বোপরি আছে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সমস্ত রাজ্যের রক্ত নিঙড়ে নেবার রেওয়াজ ও স্বাধীনতা পরবর্তী তিরিশ বছরের খতিয়ান ঘাঁটলে এই অভিযোগগুলির প্রত্যেকটারই পর্যাপ্ত নজীর পাওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সর্বাত্মক ক্ষমতার নিরিখে বিচার করে আমাদের প্রাশাসনিক কাঠামোকে কি কোন যুক্তিতেই ষোল আনা ফেডারেল বলা যায়? দৃষ্টান্ত হিসাবে হিন্দীকে সর্বভারতীয় সরকারী ভাষারূপে মুদ্রায় মনি-অর্ডার ফর্মে ডাক টিকিটে স্টেশনের নামে বেতার ঘোষণায় জোর করে চালানর উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দীকে সারা ভারতের ইন্টিগ্রেশন লিঙ্ক বা সমন্বয় সূত্র বলা হচ্ছে। কিন্তু কার্যত গোটাদেশকে কি এইভাবে উত্তর ভারতীয় একাত্মতার দিকেই টেনে নেওয়া হচ্ছে না? তা যে হচ্ছে তার আরো প্রমাণ যে ভারতের জাতীয় পোশাক ও জাতীয় খাদ্য বলে চিহ্নিত হয়েছে যথাক্রমে হিন্দীভাষী ভারতের পোশাক এবং খাদ্যই। অথচ কে না জানেন যে উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান পাঞ্জাব হরিয়ানা বিহার ও মধ্যপ্রদেশে, শুধু এই কটি রাজ্যের মানুষরাই হিন্দী বলতে অথবা বুঝতে সমর্থ। বুঝতে বলছি এই জন্যে যে উত্তর ভারতীয় বলয়টির মধ্যেই উর্দু পাঞ্জাবী রাজস্থানী মৈথিলী ভোজপুরী বাঘেলী প্রভৃতি ভাষা চলিত আছে এবং তার অনেকগুলিরই নিজস্ব সাহিত্য ও তৈরি ব্যাকরণ আছে। প্রকৃত পক্ষে উত্তর প্রদেশের রাজনীতি, রাজস্থান পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মূলধন এবং বিহার ও মধ্যপ্রদেশের শ্রম, স্বাধীনতার পর একযোগে গড়েছিল কংগ্রেসী ভারতের ভাববিম্ব। তাই গোড়া থেকে ঐটুকুই ভারতবর্ষ বলে ভাবা হয়েছে এবং সেই ভাবনার পথেই প্রবাহিত করার প্রয়াস হয়েছে সর্বভারতীয় জ্ঞান ও কর্মের ধারাকে। এরই অনিবার্য পরিণতি হল ক্রমবর্ধনশীল একাত্মিক গঠন, যা ফেডারেল ছাঁচকে অতিক্রম করেই দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করেছে। বাংলা আসাম ওড়িশা ত্রিপুরা মণিপুর প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য এবং দক্ষিণের চারটি রাজ্য এই সমষ্টিবাদী একীকরণের বিরোধিতা করে পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর পশ্চিমের গুজরাট ও মহারাষ্ট্র উত্তরের আনুগত্য করেই যথাসম্ভব সুযোগ

সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের জীবন থেকে দু-একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেই ক্ষতির স্বরূপটা বোঝাতে চেষ্টা করেছি। পূর্ববাংলা ভারতের বাইরে চলে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল পাটের উৎপাদন কমে যয়। কেন্দ্রীয় সরকার তখন পশ্চিমবঙ্গের ধানী জমির অনেকটাই পাট চাষে রূপান্তরিত করতে বলেন, আর কলকাতাসহ সুবৃহৎ শিল্পাঞ্চলের মানুষকে খাওয়ানর দায়িত্ব নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সেই প্রতিশ্রুতির পরিণতি হল দুবেলার জায়গায় একবেলা ভাত একবেলা রুটি এবং সেই ভাতের জন্যে বরাদ্দ হল বেশীর ভাগ সময় পচা আতপ চাল, যা পয়সা দিয়ে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন সবাই।

বাংলাদেশের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ফরাক্কা চুক্তির বয়ান আমার জানা নেই। তবে অভিজ্ঞ মানুষরা বলেছেন, এই চুক্তি নাকি হল কলকাতা বন্দরের মৃত্যু-পরোয়ানা। কলকাতা ভূগর্ভ রেল নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকারের মস্ত একটা আশ্বাস, যদিও এই শতকের সময়-সীমার মধ্যে তার সমাপ্তি প্রত্যাশিত কিনা, তা কেউ জানেন না। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ টেলিফোন ও যানবাহনের অনটনে কলকাতার জীবন প্রায় ভেঙে পড়ার মত। দ্রব্যমূল্যের আকাশস্পর্শী ঊর্ধ্ব-গতিতে সাধারণ মানুষ মরণাপন্ন। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু নিছক নিস্পৃহ দর্শক হয়ে শুধু স্থিতাবস্থা জীইয়ে রাখতেই ব্যস্ত। কায়েমি স্বার্থের শিকড় উপড়ানর কোন গরজ দেখা যাচ্ছে না তাঁদের।

আসলে সত্যিকার ফেডারেল বা সত্যিকার ইউনিটারী, যে কোন একটা কাঠামো যদি নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করত ভারতবর্ষ, তাহলে আজকের অনেক সমস্যাই হয়ত দেখা না দিতে পারত। দুটোর কোনটা কিভাবে রূপায়িত হলে তা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হত, তা বোঝানোর জন্যে দুজন চিন্তাশীল লেখকের রচনা থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

প্রথমটি সাংবাদিক নটরাজনের লেখা ইজ ইণ্ডিয়া ওয়ান বা ভারতবর্ষ কি এক দেশ নামক বই থেকে। তিনি বলেন, এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে নানা ধর্ম ভাষা ও আচার আচরণে অভ্যস্ত মানুষরা মিলে-মিশে এক হয়ে গেছেন। আবার এমন দেশ আছে, যেখানে আপন আপন নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অব্যাহত রেখেই বিভিন্ন গোষ্ঠী একটি বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। ভারতবর্ষ এই শেষোক্ত রকমের দেশ। এর পাঞ্জাবের সঙ্গে কেরলের, রাজস্থানের সঙ্গে বাংলার, আসামের সঙ্গে অন্ধ্রের,

ওড়িশার সঙ্গে কুর্গের বা কর্ণাটকের সুদূরতম মিলও খুঁজে পাওয়া কঠিন। কাজেই ভারতের প্রত্যেকটি অঞ্চলকে পূর্ণ স্বাধিকার-সম্পন্ন রাজ্য রূপে স্ব-স্ব ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতায় বেড়ে উঠতে দিতে হবে। যেখানে অন্যূন ষোলটি প্রধান ভাষা, পাঁচটি প্রধান ধর্ম ও অন্তত চারটি আত্ম-স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক ধারা একত্রে বিদ্যমান, তাকে হিন্দীর দড়িতে বেঁধে এক করতে গেলে, দিন আসবে, যখন হিন্দী অহিন্দী দুই সুস্পষ্ট বলয়ে সারা দেশ ভাগ হয়ে যেতে এবং তাদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত বেধে যেতে পারে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে এখানে শুধু ফেডারেল নয়, লিবারেল অর্থাৎ উদারও হতে হবে। প্রত্যেককে আপন অভিপ্রেত পথে গঠন ও উন্নয়নে অগ্রসর হতে সহযোগিতা করতে হবে। চাপ দিয়ে আনুগত্যে আনা বা বঞ্চিত করে পিছু হঠিয়ে দেওয়া সর্বনাশকর হবে।

দ্বিতীয়টি নিউ এশিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত ডবলু ক্রাউকের প্রবন্ধ থেকে। তিনি বলেন, নানা ভাষা ভূষা ধর্ম ও আচার সংস্কারে বিভক্ত বিচিত্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত ভারতবর্ষকে সুদৃঢ় এক কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে একাত্মিক রাষ্ট্রে পরিণত করা ভিন্ন মঙ্গল নেই। ছোট বড় সমস্ত রাজ্যের প্রশাসন, কোর্ট কাছারি, শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্য ও জীবিকা নির্ধারক সংস্থা, যানবাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সব কিছুকেই নিতে হবে পূর্ণ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে। এক ভাষা এক পোশাক এক খাদ্য এক শিক্ষা করতে হবে বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন। দেশের সমস্ত সম্পদ সমস্ত উৎপাদন ও উন্নয়ন সত্র, সমস্ত জঙ্গল জলাশয় ও খনি নিতে হবে কেন্দ্রের অধীনে এবং কোথায় কোন জিনিসটার ঘাটতি, কোথায় কোনটা উদ্বৃত্ত, তা লক্ষ্য করে তদনুসারে বণ্টনের বিধি বিধান প্রণয়ন করতে হবে। এজন্যে বারমাস রাজধানী দিল্লীতে অচল প্রতিষ্ঠ না থেকে, ভারতের চার প্রান্তে বিকেন্দ্রায়িত আকারে বছরে তিন মাস হিসাবে কলকাতা, আমেদাবাদে, হরিয়ানায় ও ত্রিবান্দ্রমে যদি কেন্দ্রীয় সরকার চক্রাবর্তে প্রশাসন চালান, তাহলে রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক প্রশাসন ও আইনসভা পরিচালনের প্রয়োজনই থাকবে না। রাজ্যে রাজ্যে ভাষা নিয়ে, সীমানা নিয়ে, ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা থাকবে না। যথার্থ একাত্মিক ভারত তৈরির অন্যপথ নেই এছাড়া। বলা বাহুল্য উপরোক্ত দুটি সিদ্ধান্তের প্রথমটিকে সংসদীয় গণতন্ত্র-সম্মত পথেই রূপ দেওয়া যায়, আর দ্বিতীয়টির জন্যে প্রয়োজন কায়েমি স্বার্থ-বিমুক্ত সাম্যাশ্রিত নূতন সমাজ ও প্রশাসন কাঠামো। অর্থাৎ

বিপ্লব। তার মানে একটির জন্যে চাই উদার দূরদৃষ্টি, অন্যটির জন্যে চাই পৌরুষ। দুটোর কোনটাই আছে কি আমাদের যথোচিত পরিমাণে?

।। গণতন্ত্রের পরীক্ষা ।।

প্রতীচ্য দুনিয়ার সর্বত্র যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রকে মহিমান্বিত করে দেখা ও দেখান হয়, পশ্চিমী রাজনৈতিক পাঠশালার পড়ুয়া আমরাও তাই তার মহিমাই পঞ্চমুখে কীর্তন করি। আসলে বিশ শতকের শেষার্ধে সারা পৃথিবীতেই যেমন আজ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদের সমাধি রচিত হয়েছে, তেমনি তৈরি হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইমারত। মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষের মত কোথাও কোথাও অবশ্য এখনো দু-একজন নখদন্তহীন রাজারাণী টিঁকে আছেন, কিন্তু তাঁরা সবাই হলেন হাস্যকর কালাতিক্রমণের নিদর্শন এবং আগামী দু-এক দশকের মধ্যে হয়ত ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যাবেন তাঁরাও। মিশর থেকে নগীব যখন রাজা ফারুককে বিতাড়িত করে শাসনতক্ত অধিকার করেন, তখন গদীচ্যুত ফারুক বলেছিলেন, দিন আসছে যখন তাসের চার রাজা এবং ইংল্যাণ্ডাধিপতি ছাড়া দুনিয়ার আর কোন রাজা-রাজড়ার নামগন্ধই থাকবে না। কৌতুকের কথা হলেও এর মধ্যে একটি মর্মান্তিক সত্যের ইঙ্গিত ছিল। শুধু তাই নয়, রাজতন্ত্র ইংলণ্ডে কত দিন থাকবে, তা নিয়েও এখন বুক ঠুকে কিছু বলা মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক, সংসদীয় গণতন্ত্রই যে প্রাশাসনিক ঠাট হিসাবে সার্থক ও সর্বোত্তম, আজকের চিন্তাশীলরা কিন্তু তাও স্বীকার করেন না অনেকে। গণতান্ত্রিক শাসনের ছাঁচটি যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত এবং জনসমষ্টির হিতে উৎসর্গিত, এই ত্রিমুখী মৌল সিদ্ধান্তটি পরীক্ষায় ভুয়ো বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। কোথায় প্রকৃত অসম্পূর্ণতা, তা বিশ্লেষণ করে দেখানর চেষ্টা করছি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একটি রচনা থেকে, তাঁর মূল্যবান বক্তব্যের সার সংকলন করে। তিনি বলেন রাজতন্ত্র বা ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা সংসদীয় গণতন্ত্র অবশ্যই উন্নততর প্রণালী। কিন্তু তাতেও সর্বজনের অভিমত সামান্যই প্রতিফলিত হয়। সেই জন্যে তা জনগণের হুকুমৎ বলে অভিহিত হতে পারে না কোন যুক্তিতেই। প্রথমত ধরা যাক নির্বাচনের কথা। এই ব্যাপারটা পুরাকালীন অশ্বমেধ যজ্ঞের মত এমনই ব্যয়বহুল ও বহুজনসাধ্য যে কোন গরীব নির্বাচনে প্রার্থী হবার কথা ভাবতেও পারেন না, যদি তাঁর পিছনে কেউ সাহায্যকারী রূপে এসে না দাঁড়ান, কিংবা কোন শক্তিশালী

পার্টির সমর্থন না থাকে। তাই সাহায্যকারীরূপে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আবির্ভূত হন সাধারণত দেশের বণিক ধনিক ও কায়েমি স্বার্থের অছিরা, কিংবা বৈদেশিক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক মহল। এ অবস্থায় যোগ্যতম মানুষ অপেক্ষা সুযোগপ্রাপ্ত মানুষেরই নির্বাচিত হবার পক্ষে থাকে সর্বাধিক সুবিধা। পার্টির পৃষ্ঠপোষকতাও বন্টিত হয় ততটা যোগ্যতার দিকে না চেয়ে, যতটা পার্টির সুবিধার মুখ চেয়ে। ফলে সত্যকার জনস্বার্থের প্রতিভূরা কমই ঢুকতে পারেন কেন্দ্রীয় সংসদে বা রাজ্য বিধান সভায়। অর্থাৎ টাকা ছড়িয়ে ভোট কুড়ানই হল চলতি রেওয়াজ।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান ও প্রথম ত্রুটি এখানে। তা'ছাড়া ক্ষমতাসীন দলকে হঠিয়ে জয়ী হওয়া কাজ হিসাবে মোটেই সহজও নয়। তাঁদের স্বার্থে সরকারী অর্থ, প্রচারযন্ত্র, যানবাহন ও লোকবল, সবই পরোক্ষভাবে সুকৌশলে নিয়োগ করা হয় নির্বাচনী প্রচারে। পুলিশ ও সরকারী মহল কোথাও প্রলোভনের ফাঁদ পেতে, কোথাও বা ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করে ক্ষমতাসীন দলকেই পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হন। যে দেশে শতকরা ৭৫ জন মানুষই নিরক্ষর এবং রাজনীতির গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আজও অজ্ঞ ও অনাগ্রহী, সে দেশে ফাঁকি দিয়ে বা বোকা বুঝিয়ে ভোট আদায়ও খুব কঠিন কাজ নয়। এই জন্যে কোন প্রার্থী যোগ্য, কে কি করেছেন দেশ ও জাতির জন্যে, তা হাতে কলমে যাচিয়ে দেখে ভোট দেওয়া অপেক্ষা ভাড়াটে ভক্তদের প্রচার-চাতুর্যে বিভ্রান্ত হয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজে যাঁরা বিত্ত ও বংশকৌলীন্যের দরুন সম্মানভাজন বলে বিবেচিত, এমন সব মৎলবী ব্যক্তিদেরই ক্ষমতায় বসিয়ে দেন তাঁরা। এই ভাবেই সংসদীয় গণতন্ত্র সর্বত্র ভৌমিক ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ হয়েছে, হয়েছে লোককল্যাণের আদর্শভ্রষ্ট এবং এই ছাঁচে একবার ক্ষমতাসীন হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন দলকে ব্যালট বাক্সের যুদ্ধে পরাস্ত করা সুকঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথার প্রতিবাদে অনেকে হয়ত বলবেন, তাই যদি হবে, তাহলে কংগ্রেসকে ১৯৭৭-এর মার্চের নির্বাচনে কি করে ক্ষমতাচ্যুত করা গেল? বলা বাহুল্য এ কথা মোটেই যুক্তিসম্মত নয়। কারণ শেষের ধাপে কংগ্রেস আর গণতান্ত্রিক পার্টি ছিল না, তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্রের অনুগামী এবং পার্টির সভাপতি স্বয়ং বলেছিলেন যে তাঁদের যিনি প্রধানমন্ত্রী, তিনিই ভারতবর্ষ। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে, বিরোধী বলে বিবেচিতদের জেলে পুরে, তাঁদের রুজি-রোজগার

মেরে এবং সারা দেশে পুলিশী সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কংগ্রেস সরকার প্রায় হিট-লারী জার্মানীর আবহাওয়া জাগিয়ে তুলেছিল সারা দেশে। এমন কি জোর-পূর্বক দরিদ্রদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের প্রজননশক্তি হরণ করা হচ্ছিল জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে এবং সন্দেহক্রমে ধৃত ভদ্র নারীদের হাজতে পুরে সম্ভ্রম হরণের চালাও উদ্যোগ চলছিল। এ হেন বর্বর ও বন্য একটা প্রশাসনকে নিছক উত্যক্ত হয়েই সাধারণ মানুষ পদাঘাতে বিতাড়িত করেছিলেন। অন্যান্য দেশে এরকম ক্ষেত্রে ক্ষিপ্ত জনগণ অন্য রাস্তাই ধরতেন। এখানে স্বভাবত শান্তিকামী ভারতবাসী শুধু আসন থেকে অপসারিত করেছেন এবং আইন-সম্মত পথে অন্যায়কারীদের দণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। কিন্তু এরকম চরম স্বৈরাচার গণতান্ত্রিক কোন দেশে সচরাচর হতে পারে না। হলে তার পরিমাণ ভয়াবহ হবে, সেই ভয় অতি বড় পাষণ্ডকেও সংযত রাখে। কাজেই ও নজীর অচল। সাধারণভাবে নির্বাচনের পথে শোষণবাদী সংসদীয় গণ-তন্ত্রের শক্ত মুঠি শিথিল করা প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে সেই সব দেশে, যেখানে দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসনে জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ধ্বসে গেছে।

সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থহীন হয়েছে আরো একটা কারণে। ভোট দিয়ে জনগণ যাঁকে বিধানসভায় বা সংসদে পাঠান, তিনি যদি তাঁর নির্বাচক মণ্ডলীর আশা আকাঙ্ক্ষার সহায়ক না হন, যদি তাঁদের অভিপ্রেত পথের উল্টো দিকে পা বাড়ান বা উৎকোচে প্রলুব্ধ হয়ে একদল থেকে পিছু হঠে অন্য দলে গিয়ে ঢোকেন, তাহলে নির্বাচকরা তাঁকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন না। প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকারকে যাঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ দান বলেন তাঁরা অযোগ্য প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে নেবার ঔচিত্য সম্বন্ধে কেউ কেউ দাবী তোলেন বটে, কিন্তু কথাটা অধিকাংশ দেশেই এখনো পর্যন্ত কেতাবী বিতর্কের মধ্যে সীমিত রয়েছে। এই অধিকারটুকু ভোটারদের হাতে থাকলে, হয়ত নির্বাচিত প্রার্থী কতকটা পর্যন্ত হুঁশিয়ার থাকতেন, কোন মুহূর্তে কোন ভুল চাল বা অনুচিত পদক্ষেপের জন্যে তাঁকে নির্বাচকমণ্ডলীর বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, সেই ভয়ে। তার অভাবে সাধারণত সবাই বেপরোয়া হয়ে ওঠেন এবং নির্বিঘ্নে ভোট বৈতরণী পার হবার পর অনেকে নির্বাচন কেন্দ্রে আর পদার্পণের প্রয়োজন মনে করেন না, যতদিন না আবার একটা নির্বাচনের মরশুম আসে। তখন আবার দেখা যায় তাঁদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে এবং তাঁদের জয়যুক্ত করে পাঠান হলে তাঁরা কি-কি শুভ পরিকল্পনা কার্যকর

করতে মনপ্রাণ নিয়োগ করবেন, তার রাশি-রাশি নির্ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি দিতে। প্রতিশ্রুতি কার্যকর করার সুযোগও আসে অবশ্য, হাতে মন্ত্রীত্বের দপ্তর এলে। কিন্তু সেখানেও গোটা দেশের জন্যে যা বরাদ্দ, তা একটা দুটো এলাকাতেই উজাড় করে ঢালা হয়, ভাবী নির্বাচনের জমি তৈরি করে রাখার জন্যে। অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের আপাদমস্তকই প্রতারণা। ধনিক বণিক পুঁজিপতি ধর্মীয় সম্প্রদায় ও সরকারী মহল একে জীইয়ে রেখে প্রতিবিপ্লবের মনস্তাত্ত্বিক শক্তি সঞ্চার করে চলেছেন দিনের পর দিন। আর নেতারা কেউ শান্তি ও অহিংসার নামে, কেউ ইচ্ছাকৃত ভূমিদান ও ঐশ্বর্য বণ্টনের পথে সামাজিক ভারসাম্য সংস্থাপনের নামে, কেউ বা প্রীতি ও সাম্যাশ্রিত নৈতিক পুনরুজ্জীবনের নামে সত্যিকার বিপ্লবকে পিছু হটিয়ে দিয়ে স্থিতাবস্থার পক্ষে প্রচারকার্য চালান। লক্ষ্য করার বিষয় যে সবাই এঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রের জয়গান করেন এবং তার ব্যত্যয়কে সযত্নে পরিহার করতে বলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের এই শঠতার মুখোশটি অনাবৃত করে দেখিয়েছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। এর অন্তর্লোকে যে পুঁজিবাদের নোংরা হাত লুকিয়ে আছে, তা অবশ্য বলাই বাহুল্য এবং এই কারণে সহজ বিচার বুদ্ধিতে এর বিকল্প হিসাবে সাম্যবাদের কথাই সর্বাগ্রে মনে আসবে সবার।

২.

আগের অধ্যায়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি। সেই সূত্রে দেখিয়েছি যে অস্তিবান্ ও নাস্তিবান্ দুই নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত এবং পুঁজিবাদী জাতীয়তার সমর্থক বলেই সংসদীয় গণতন্ত্র মূলত কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ধনিক বণিক শিল্পপতি সরকারী মহল ও ধর্মায়তনের ওপরওয়ালারাই একান্তভাবে তার পৃষ্ঠপোষকতা পান এবং তার কর্ম-ব্যবস্থাপনাও চালিত হয় তাঁদেরই স্বার্থে, যদিও সার্বিক কল্যাণের বুলিটা জীইয়ে রাখতে হয়, চাকরিজীবী নিম্নবিত্তদের এবং কৃষক কারিগর ও দেহশ্রমী অন্যান্য সব মানুষদের ভোট আদায়ের কৌশল হিসাবে। এই জন্যেই সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকল্পরূপে সাম্যবাদের আদর্শ চিন্তাশীল মানুষদের মনোযোগ ক্রমশ আকর্ষণ করছে। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এই আদর্শ বাস্তবে রূপায়ণের প্রয়াস করেন লেনিন, রাশিয়া থেকে রাজতন্ত্র উচ্ছিন্ন করে। কিভাবে ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির চক্রান্ত নিষ্ফল করে সোভিয়েট রাষ্ট্র দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করেছে, কিভাবে সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলারী হূনদের আক্রমণ প্রতিহত

করেছে, সে কাহিনী সারা পৃথিবীতেই সুবিদিত। প্রধানত রাশিয়ার এই জয়লাভ ও সফল নেতৃত্বেই পৃথিবীতে আরো কয়েকটি দেশের সাম্যবাদী রূপান্তর সম্ভব হয়েছে। সেই দেশগুলির মধ্যে প্রধান হল এশিয়ায় চীন, আর পূর্ব ইউরোপে পোলাণ্ড হাঙ্গারী চেকোশ্লোভাকিয়া রোমানিয়া যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি। আদিতে এরা সবাই ছিল সোভিয়েট শিবিরের অর্থাৎ মস্কোর প্রতি আনুগত্য সম্পন্ন। কিছুকাল পরে, যুগোশ্লাভিয়া এই আনুগত্যের শিকল ছিঁড়ে প্রথম স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করল, যদিও সাম্যবাদের আদর্শে অনড়ই থাকল। তারপর বাধল চীন রাশিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব। সার্বভৌম সাম্যবাদের তুনিয়া এসবের ফলে এক ও অবিভাজ্য থাকল না, পরস্পরবিরোধী আত্মাধিকারের দ্বন্দ্ব মাথা তুলতে লাগল তার ইতস্তত। এরই আধুনিকতম পরিণতি হল ইউরো-কম্যুনিজম, যা প্রকৃতপক্ষে হল সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যেই সাম্যবাদী আদর্শের মোটা কথাগুলি অনুসরণের প্রয়াস। ফ্রান্স ইতালী প্রভৃতি দেশ এবং পূর্বোল্লিখিত ইউরোপীয় দেশগুলি এখন এই কাঠামোকেই শ্রেয় এবং অভিপ্রেত পথ বলে মনে করছে।

এই আলোচনায় আমি কম্যুনিজম ও সোশ্যালিজম তুইয়েরই প্রতিশব্দরূপে সাম্যবাদ কথাটি ব্যবহার করেছি। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক বিচারে তুইয়ে অনেক তফাৎ। খাঁটি কম্যুনিজম যা মার্কস্ এঙ্গেল্স পুঁথিবদ্ধ করে গেছেন, তা এখনো বাস্তবে মূর্ত হয়নি কোথাও। তার আদর্শ হল এমন এক সাম্যাশ্রিত নীতি-নির্ভর সমাজের ছক, যা কার্যকর হলে রাষ্ট্র আপনা থেকেই ধীরে ধীরে একদিন মুছে যাবে এবং মানুষ শোষণ ও ভেদবিভেদ-বিমুক্ত নূতন এক জাগতিক পরিবেশের মধ্যে বাঁচার সুযোগ পাবে। সেই সার্বিক সমাজ-বিবর্তন হবে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সামর্থ্য, কৃষিক্ষেত্র, কলকারখানা ও উৎপাদনযন্ত্র মুনাফামুখী ব্যক্তিগত মালিকানা ভ্রষ্ট হয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত হলে এবং রক্ত-ও-ধর্মকৌলীন্য হীন অর্থাৎ শ্রেণীভেদহীন সমতার ও সমবণ্টনের ভিত্তিতে ব্যক্তি মানুষের পুনর্বসতি সম্ভব হলে। সেই অবস্থা প্রকাশমান হবে যখন, তখন সমাজ প্রতি মানুষের কাছে তার যোগ্যতানুযায়ী কাজ নেবে, আর প্রতি মানুষকে দেবে তার প্রয়োজনানুযায়ী চাহিদার জোগান। অর্থাৎ জিনিসটা এখনো হয়ে রয়েছে আকাশ-কুসুমের মত, আর তারই পথে আগুয়ান হবার প্রাথমিক সোপান বলে গণ্য করা হচ্ছে সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদকে, যা রাশিয়া চীন ও অন্যান্য সাম্যবাদী দেশে সক্রিয় হয়েছে। সমাজতন্ত্র বলাই

বাহুল্য মুনাফা ও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে না, স্বীকার করে না, ধন-ও-বংশভিত্তিক শ্রেণীভেদকে যদিও একজনের সঙ্গে অন্যের বুদ্ধি ও যোগ্যতার এবং এক কাজের সঙ্গে অন্য কাজের উপযোগিতার বৈষম্য, সেই কারণে মজুরির বৈষম্য অস্বীকার করেনা। সমাজতন্ত্রে ঈশ্বর-অদৃষ্ট ও পাপ-পুণ্যের, অর্থাৎ প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ঠাঁই নেই। ভৌগোলিক দেশপ্রেম আগে বর্জনীয় ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে তার পুনর্বসতি হয় নূতন করে। ব্যক্তি মানুষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশুদ্ধ একক নন, তিনি সমষ্টির অংশ এবং বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী শিল্পী শ্রমিক কৃষক যে ভূমিকাতেই নিযুক্ত থাকুন যিনি, তিনি গণ্য হন রাষ্ট্রের কর্মী হিসাবে। রাষ্ট্রের আদেশ ও আদর্শের প্রতিকূলতা করার স্বাধীনতা তাঁর নেই। এই জন্যেই এরকম রাষ্ট্রে কেউ বেকার থাকতে বাধ্য হন না, অন্ন ও আশ্রয়ের ধান্দায় কারোকে পথে পথে ঘুরতে হয় না। রাষ্ট্র প্রতি মানুষকে শিক্ষা চিকিৎসা ও জীবিকার যথাসম্ভব সংস্থান করে দেয়। ফলে সমাজের সকল স্তরেই গড়পড়তা একটা স্বস্তির ও সুবিচারের আবহাওয়া আসতে পারে।

ভারতবর্ষের মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অনগ্রসর ও নিরক্ষরতা-অধ্যুষিত যে সব দেশ এবং সেই কারণেই শিল্পে বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়ে আছে যারা অগ্রগামী দুনিয়ার তুলনায়, তাদের ক্ষেত্রে সাম্যবাদী ছাঁচই একমাত্র বাঁচার উপায়। অতএব বৈপ্লবিক কর্মপন্থার সাহায্যে মুনাফামুখী মালিকানা ও কায়েমী স্বার্থ উচ্ছিন্ন না করা হলে, সে রকম দেশে প্রতি মানুষকে সর্বনিম্ন শিক্ষা জীবিকা ও অন্নবস্ত্র জোগান কোনদিনই সম্ভব হবে না। মুষ্টিমেয় পুঁজি-পতি ও সুবিধাভোগী অভিজাতবর্গের স্বার্থ বজায় রেখে সংসদীয় গণতন্ত্র শুধু ধনীকে অধিকতর ধনী এবং গরীবকে অধিকতর গরীবই করে তুলবে। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, সাম্যবাদী ছাঁচই কি ষোল আনা সার্থক এবং সর্ব সমা-লোচনার উর্ধ্বে? বলা বাহুল্য পৃথিবীর কোন জিনিসই তা নয়, কম্যুনিজমও নয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সংঘটিত নভেম্বর বিপ্লব থেকে দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছরে কম্যুনিজম যত পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে, তার ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ ও বিচিত্র সন্দেহ নেই। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে তার তাত্ত্বিক কাঠামোতে যে সব অদল বদল অনিবার্য ভাবে প্রকাশমান হয়েছে, তাও অবশ্যই রীতিমত প্রণিধানযোগ্য। তবু মনে রাখতে হবে যে নূতন সমাজ-বিন্যাসের আলোয় নূতন করে মানুষকে গড়ে পিটে তৈরী করার জন্যে কম্যুনিজম এক দিকে যেমন রাষ্ট্রকেই করে তোলে সর্বশক্তির অধীশ্বর, অন্যদিকে ব্যক্তিকে তেমনি সংস্থাপিত

করে ফেলে সমষ্টির মধ্যে। ফলে যেন বিরাট এক রাষ্ট্রযন্ত্রের নাটবল্টু হিসাবে তারা অটুট নিয়মানুবর্তিতায় কাজ করে যায়, তার বিনিময়ে পায় পালন ও পোষণ। মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ দার্শনিকরা তাই কম্যুনিজমের ছাঁচে আর্থিক সাম্যের সঙ্গে সঙ্গেই রুচি চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রতি মানুষের ব্যক্তিক স্বাধিকারটুকুও যুক্ত করতে চান। সংসদীয় গণতন্ত্রে খালি-পেটে থেকে যদৃচ্ছ চালাও চেঁচানর অধিকার বলা বাহুল্য ব্যক্তিস্বাধীনতার ভ্যাংচানি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে নিছক অন্নবস্ত্রের মূল্যে আত্মস্বাতন্ত্র্য খোয়ানও মানুষের সহজাত প্রবণতার বিরোধী। দুইয়ের নির্যাস আহরণ করে সুষ্ঠু কোন তৃতীয় পন্থা হয়ত আগামী দিনে আবিষ্কৃত হবে। জানি না সেদিন কবে বা কোথায় দেখা দেবে প্রথম।

**। ভারত বিভাগের অনিবার্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ।**

ভারত বিভাগ কি অনিবার্য ছিল? অর্থাৎ পূর্ব-শর্ত হিসাবে ভারতবর্ষকে দুটি দেশে বিভক্ত না করা হলে কি স্বাধীনতা লাভ হত না? এই প্রশ্নটি বর্তমান লেখককে করেছিলেন একজন বিদেশী সাংবাদিক। তাঁর মতে ভারতবর্ষে ভৌগোলিক নৃতাত্ত্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাসম্পন্ন সুচিহ্নিত বলয় অতীতে অনেকগুলি থাকলেও, আজ সবগুলি অঞ্চল একসঙ্গে মিলেই ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের কাঠামো তৈরী করেছে। তাই বিগতদিনের বৈষম্যগুলি খুঁজে পাওয়া আজ মুস্কিল। তাছাড়া এই নৃতাত্ত্বিক বৈষম্যের কথা আদৌ ওঠে না হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মীয় গোষ্ঠী সম্পর্কে। ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র ধর্মীয় ও আচার-অনুষ্ঠানগত পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনরকম পার্থক্যই ত চোখে পড়ে না। তাঁরা একই নৃগোষ্ঠী-সম্ভূত এবং একই দৈহিক ও মানসিক প্রবণতার অধিকারী। এ অবস্থায় তাঁরা একই রাষ্ট্রীয় সংরক্ষায় ও একই আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনায় অনায়াসে থাকতে পারতেন না কি, যদি তাঁদের স্ব-স্ব ধর্মীয় এবং তৎসংক্রান্ত সাংস্কৃতিক স্বাধিকারগুলির উপর কোনরকম হস্তক্ষেপ না হত? আমি তাঁকে পালটা প্রশ্ন হিসাবে বলি যে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মানুষদের মধ্যে ত একই নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বহমান, তবে ঐ দুটি দ্বিধাবিভক্ত হল কেন? তার উত্তর তিনি কবুল করেন যে রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধই এর কারণ। দুনিয়ার নিজ-নিজ প্রভাবাধীন এলাকা সম্প্রসারিত করার মতলবেই এইসব বিভেদকে পিছনে থেকে উস্কেছেন বিশ্বের প্রধান শক্তি-শিবিরগুলি। তাঁর

বক্তব্যে মধ্যেই মিলবে আমারও উত্তর, এই কথা বলেছিলাম আমি তাঁকে, যদিও বিষয়টি আমার মন থেকে মুছে যায় নি কোন দিনই। আমার বরাবরই মনে হয়েছে এবং এখনো হয় যে, ভারতবিভাগের ব্যাপারটা মোটেই অপরিহার্য ছিল না। রাজনীতিক দূরদর্শিতার অভাবে জাতীয় আন্দোলনের শুরু থেকেই আমরা মুসলমান সমাজকে কাছে টানতে পারিনি। শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তরাই প্রথম স্বাধীনতার যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা আত্মাদর বশে নিজেদের গণ্ডীর বাইরে তাকাতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই মুসলমানদের কথা তাঁরা ভাবেনই নি। এমন কি নিম্নবিত্ত হিন্দু চাষী শ্রমজীবী ও কারিগর শ্রেণীর দিকে তাকানরও অবকাশ হয়নি তাঁদের।

গান্ধী যখন রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন, তখন অবশ্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে মিলিত কর্মসূচী রচিত হয়। কিন্তু বিপদ যা হবার তা হয়ে গেছে আগেই। বন্দেমাতরম্ রাখীবন্ধন বীরাষ্টমী গীতাচর্চা ও শিবাজী উৎসবের দাপটে আমাদের জাতীয় আন্দোলনটা আগাগোড়াই হিন্দুত্ব-কেন্দ্রিক হয়ে গেছে এবং চতুর সাম্রাজ্যবাদীরা এখানেই আবিষ্কার করেছে প্রথম তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ। মুসলমান সমাজকে তারা বোঝাতে পেরেছে যে হিন্দু প্রাধান্যময় ভারতে তাঁরা চিরদিন থাকবেন ছোট শরিক হয়ে। তাঁদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নিজস্বতা এবং রাজনীতিক স্বাধিকার পদে পদে খর্বিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে। এই মতবাদকে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত করার জন্যে অতঃপর স্যার সৈয়দ আহমদ গড়েছেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, আর রাজনীতির পথে এই চিন্তাকে প্রবাহিত করার ভূমিকা নিয়েছে মুসলীম লীগ, যার জন্ম ঢাকার নবাব সলিমুল্লার আনুকূল্যে।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি-বিবর্জিত গান্ধী-রাজনীতি এই সমস্যার সার্থক মোকাবিলা করতে পারেনি। গোড়ার পর্বে গান্ধী দ্বিজাতিতত্ত্বটা অস্বীকার করেননি, আর সেই কারণেই মুসলমানরা পৃথক পিতৃভূমি দাবী করলে সেটা অন্যায় হবে না বলেছেন। তারপরেই কংগ্রেস যখন এই দাবী নাকচ করেছে, তিনিও তখন গেছেন বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, একা রাজাগোপালাচারী যখন অনন্তকাল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্যে বসে না থেকে, ভারত বিভাগ মেনেই স্বাধীনতা নেবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তখন তাঁকে দলীয় শৃংখলাভঙ্গের অপরাধে বহিষ্কৃত করা হয়েছে কংগ্রেস থেকে। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস লক্ষ্য করুন। সেই দেশ বিভাগ করুল

করেই স্বাধীনতা নেওয়া হল এবং সেই রাজাগোপালই হলেন স্বাধীন ভারতের একটি রাজ্যের রাজ্যপাল রূপে অধিষ্ঠিত। যে গান্ধী একদা বলেছিলেন তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে ভারত বিভাগ হবে, সেই তিনিই এই স্বাধীনতাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর স্নেহাধিকারী জওহরলাল দেখা দিলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়ে।

কেন কংগ্রেসী রাজনীতিতে এই মৌল পরিবর্তন ঘটল? জওহরলাল প্যাটেল রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ গান্ধী-অনুগামীরা রাতারাতি শাসন কর্তৃত্বে গদীয়ান হবার লালসায় দেশ ভাগের এই বিষবড়ি গলাধঃকরণ করলেন? না, অহিংসা ও সত্যের প্রতীক বলে কথিত গান্ধী স্বয়ং ইতিমধ্যে আবার দ্বিজাতি-তত্ত্বটাই খাঁটি বলে বুঝতে পারলেন এবং তা তাঁর অনুগতজনদেরও বোঝাতে সমর্থ হলেন, জানি না। তবে ১৯৪৭-এ দেখা গেল এক ভারত ভেঙে দুই দেশ হল।

কংগ্রেস যদি এই বিভাগ মেনে না নিত এবং '৪৭-এর বদলে '৫৭ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে বলেই দৃঢ়সংকল্প হত, তাহলে ইংরেজের উপায়ান্তর ছিল না সিংহল ও বর্মার মত ভারত থেকেও নিঃশর্তে হাত গোটান ছাড়া। সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ইংরেজ ও ফরাসী কোন মতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দেশব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ রক্ষা আর তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাশিয়া ও আমেরিকা তখন বিশ্ব-কর্তৃত্বের সদর দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে। ওদিকে চীনও উঠে দাঁড়িয়েছে সাম্যবাদের মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে। অতএব এশিয়া আফ্রিকার শোষণভূমিগুলি থেকে ইংরেজ ফরাসী ডাচ ও পর্তুগীজদের পাততাড়ি গুটান ছাড়া রাস্তা কি ছিল? সর্বত্র তাই কায়েমি স্বার্থের অছি স্বরূপ জাতীয়তাবাদীদের হাতে শাসনভার ন্যস্ত করে তারা পিছু হঠতে শুরু করল। কারণ সাম্রাজ্য গেলেও এশিয়া আফ্রিকায় তারা এইভাবে রাজনৈতিক তাঁবেদার গোষ্ঠী রেখে যেতে পারবে, এ সত্যটি পরিষ্কার বুঝেছিল। এখানেও তাই-ই করত তারা, কিন্তু আমাদের তর সইল না। আগে ভাগে এগিয়ে গিয়েই আমরা পার্টিশানের হাঁড়িকাঠে গলা এগিয়ে দিলাম। আরো কিছুকাল দম ধরে থাকতে পারলে, অখণ্ড ভারতই বন্ধনমুক্ত হত, এ আমরা ভাবতে ভরসা পাইনি। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তখন সাম্যবাদী চিন্তার অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। পুঁজিবাদী ভারতীয় বুর্জোয়ারা তাই আর দেরী

করতে অবসরও দেয়নি আমাদের জাতীয় নেতৃত্বকে। চীন ও রাশিয়ার সংহত শক্তি ভারত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হলে তার পরিণাম কি দাঁড়াবে, তা তাদের ভাল করেই বুঝিয়েছিল ইঙ্গ-মার্কিন দোস্তরা। তার মানে কংগ্রেসীরা যা বুঝেছিলেন, ঠিক তাই লীগপন্থীরাও বুঝেছিলেন এবং দু-তরফই হাতে গভর্নমেণ্ট পাবার ব্যগ্রতায় আখের ভুলে বৃটিশ কূটনীতির ক্রীড়নক বনেছিলেন। তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ অবশ্য চরিতার্থ হয়েছে, হাতে দেশের ষোল আনা শাসনভার এসে পড়ায়। কিন্তু বিভক্ত দুই মুল্লুকের সাধারণ মানুষরা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়েছেন যে তাঁদের শ্রম ও দুঃখের মূল্যে অর্জিত হলেও, এ স্বাধীনতার সুফলভোগী তাঁরা হবেন না। তাঁরা সেই অর্ধাহার অনাহার ও অশিক্ষার গাঢ় অন্ধকারে ঘাড় গুঁজেই পুঁজিবাদের পরিসর পুষ্ট করে চলবেন। আর ধূর্ত পশ্চিমা শক্তিবর্গ এই জেনেই খুসী হয়েছে যে, দুই বিভক্ত মুল্লুক রকমারি খণ্ড স্বার্থ নিয়ে অবিরাম কাটাকাটি করবে, কোনদিনই শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিল্পবাণিজ্যে সমুন্নত হয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে না।

২.

আগের অধ্যায়ে দেখিয়েছি কি কারণে আমরা ভারত বিভাগে সম্মত না হলেও ইংরেজের পক্ষে সাম্রাজ্য রক্ষা সম্ভব হত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ যে দিকে মোড় ঘুরছিল, তাতে তাঁদের হাত গুটিয়ে পালাতেই হত। তথাপি শেষ মুহূর্তে তাঁরা আর একবার চেষ্টা করেছেন ভারতকে পার্টিশানের বড়ি গেলাতে পারেন কিনা। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশভাগ হলে, সেই বিভক্ত দুইখণ্ড অবিরাম কাটাকাটি করবে, কোনদিনই সাম্যবাদ তাদের মাটিতে আসন গেড়ে বসতে পারবে না। এই সুযোগে তাঁরা বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক স্বার্থ দীর্ঘদিন জীইয়ে রাখতে পারবেন এই বৃহৎ উপমহাদেশে। আর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জাতীয়তাবাদীরা এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ধনিক বণিক জমিদার পুঁজিপতি সরকারী মহল ও ধর্মীয় নেতারা ভেবেছিলেন স্বয়ং-সম্পূর্ণ দুটি ভারত [ হিন্দু ভারত ও মুসলীম ভারত ], আত্মপ্রকাশ করলে, তাঁদের কায়েমি স্বার্থ সংরক্ষার পথ প্রশস্ততরই হবে। তাই মন্ত্রী মিশনের টোপ তাঁরা স্বেচ্ছায় গলাধঃকরণ করলেন।

কিন্তু দেশ বিভাগ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হলেও, স্বয়ং-সম্পূর্ণ হিন্দু ভারত ও মুসলীম ভারত জন্মাল না। দূরদৃষ্টি ও বাস্তবতাবোধ বিবর্জিত

কংগ্রেসী রাজনীতি অধিবাসী ও সম্পত্তি বিনিময়ের শর্তে বিভাগকে পাকা দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সম্মত হল না। ফলে ভারতবর্ষে প্রায় ৬ কোটি মুসলমান তাঁদের বিষয়াশয় ও কাজ-কারবার নিয়ে পূর্ণ নাগরিক অধিকারেই বহাল থাকলেন, আর ৪ কোটি হিন্দুও অনুরূপ অধিকারের দাবীদার রূপে পাকিস্তানের নাগরিক হলেন। জিন্না প্রথমে অধিবাসী ও সম্পত্তি বিনিময়ের সর্তেই বিভাগ চেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্বুদ্ধিতায় প্রীত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ সর্ত প্রত্যাহার করে নিলেন তিনি। তারপর কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করে ফেললেন অল্পদিনেই লীগপন্থীরা এবং মারপিট ও ও লুটপাটের সাহায্যে জবর দখল করে নিলেন তাঁদের পরিত্যক্ত জমি জায়গা ও বিষয় সম্পত্তি সবই। অবশ্য সিন্ধু সীমান্ত ও পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে উৎখাত হিন্দুরাও এর বদলা নিলেন ভারতবর্ষে ফিরে। তাঁরাও পূর্ব পাঞ্জাব এবং দিল্লীর উপকণ্ঠ থেকে উৎখাত করলেন মুসলীমদের এবং দখল করলেন তাঁদের জমিজিরেত ও ক্ষেতখামার। বাধ্য হয়েই তখন দুই প্রান্তের সরকারকে আগুয়ান হতে হল এবং অধিবাসী বিনিময় ও সম্পত্তি বিনিময়টা কাগজে কলমে বাস্তবায়িত হল। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান কার্যত বিশুদ্ধ মুসলীম রাষ্ট্রই হয়ে পড়ল ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে।

পূর্ব [বাংলা] পাকিস্তান সম্বন্ধেও দুই তরফের সরকার অগ্রণী হয়ে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, সবাই এই আশা করেছিলেন। কিন্তু নেহরুর অনুৎসাহ ও বিপ্লববাদী বাঙালীর মনোভাব সম্পর্কে অবিশ্বাস বাধা হল তার পথে। এদিকে কার্যত কিন্তু পূর্ব থেকে উৎখাত করা হতে লাগল সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধারাবাহিকভাবে। ধন মান হারিয়ে তাঁরা দলে দলে এসে জড় হতে শুরু করলেন ক্ষীণায়তন পশ্চিমবাংলায় এবং উদ্বাস্তু নামে নূতন একটি চাল চুলোহীন নিঃস্ব শ্রেণীতে পরিণত হলেন। উপযুক্ত আর্থনীতিক পরিকল্পনা ও বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে তাঁদের পুনর্বসতির কোন উদ্যোগই হল না। এমন কি এই ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ মানুষকে যাতে সুষ্ঠু ভাবে পুনর্বসতির কাজে সহায়তা করা যায়, তার জন্যে যশোহর ও খুলনা জেলা দুটি পূর্ব বাংলা থেকে ফিরে পাবার দাবী করা হোক বলে যে প্রস্তাব উঠেছিল, প্যাটেল তা সমর্থন করলেও, নেহরু কথাটা উচ্চারণই করতে দিলেন না। এইভাবে পূর্ববাংলাও প্রথম পাঁচ বছরেই প্রায় হিন্দুশূন্য হয়ে পড়ল এবং যাঁরা থাকলেন সেখানে, তাঁরা অনিবার্যভাবেই হলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে

পরিণত। অর্থাৎ কংগ্রেস পার্টিশানের রাজনীতিকে বুদ্ধির সঙ্গে কার্যকর করে তুলতে পারল না, চেষ্টাও করল না। তার ফলেই ২ কোটি বাঙালী হিন্দু চূড়ান্ত দুর্ভোগের শিকার হলেন।

কিন্তু ও কথা থাক। দেশ বিভাগ ভারত ও পাকিস্তান, কারো পক্ষেই কি কোন দিক থেকে লাভজনক হয়েছে? বলা বাহুল্য তা হয়নি। মাঝখানে দু-হাজার মাইলের ব্যবধান রেখে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অখণ্ড একদেশ সেজেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পূর্ববাংলা বনেছিল পশ্চিমী কায়েমি স্বার্থের তাঁবেদার। বিরাট এক গৃহযুদ্ধের পর এই তাঁবেদারীর অবসান হয়েছে এবং পূর্বাংশ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু কি পূর্বে, আর কি পশ্চিমে, অশান্তি ও অন্তর্বিরোধ ত একটানাই টগবগ করে ফুটছে। বিভাগের পর পাক-ভারত সম্পর্কও সহজ হয়েছে কি কিছুমাত্র? আদৌ না। যা আশংকিত ছিল, সেই পাক-ভারত যুদ্ধ দফায়-দফায় কতবার হয়েছে ভাবুন ত। কাশ্মীর ও অন্যান্য যে সব সমস্যা নিয়ে বারবার বেধেছে সেই যুদ্ধ-গুলো, তার কোনটারই শিকড় ত দুই দেশের মাটি থেকে উৎপাটিত হয়নি। যে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভারতের সহায়তা ছিল সর্বাধিক, তারও জনমন-স্তত্ব মোটেই অনুকূল নয় ভারতের সম্পর্কে। এ রাজনীতিতে তা হতেই পারে না। ভারতের সামাজিক জীবনেও কি কোথাও স্বাচ্ছন্দ্য আছে? ক্রমস্ফীত বেকারী ও আকাশ-ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য একদিকে, অন্যদিকে প্রগতি-বিমুখ সরকারী নীতি—স্বাচ্ছন্দ্য আসবে কোথা থেকে?

আসলে ভারত বিভাগ ও তথাকথিত জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রের ছকে শাসনযন্ত্রের রূপায়ণই হল সর্ববিধ দুর্দশার মূল। কংগ্রেসী রাজনীতিতে শূন্য-চারী দেশপ্রেম যে পরিমাণ ছিল, তার তুলনায় ইতিহাস ও বিজ্ঞানসিদ্ধ বস্তুজ্ঞান ত প্রায় ছিলই না। তাই রাতারাতি হাতে ক্ষমতা পাবার মত্ততায় তাঁরা ফাঁদে পা দিয়েই ৬৫ কোটি মানুষের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। কথা উঠতে পারে, হিন্দুদের সঙ্গে আনুপাতিক হিসাবে সংখ্যাল্প হলেও, ভারতের মুসলমানরা সংখ্যায় যখন একটা গোটা জাপানী বা জার্মান জাতের সমান ছিলেন, তখন তাঁরা নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র পিতৃভূমি দাবী করলে, জোর করে তা অস্বীকার করা সমীচীন হত কি? তাতে খুব বড় একটা গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া হত নাকি? বলা বাহুল্য এই ধর্মীয় জাতীয়তা ও পুঁজিবাদী অর্থ-নীতির ছক বাতিল করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা হলে সে

রকম কিছুই হত না। হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব অতিক্রম করে সবাই পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হতেন এবং শোষণহীন সাম্যাশ্রিত অর্থনীতির সহায়তা পেলে একই সঙ্গে যেমন হুজুরে মজুরে ব্যবধান কমে আসত, তেমনি সর্বনিম্ন আশ্রয় অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা ও জীবিকার সন্ধান পেয়ে মানুষ বাঁচার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারতেন। দুঃখের বিষয় সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের অধিকর্তারাও সে পটভূমি চান নি ভারতের জন্যে। দেশের কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধি পলিটিশিয়ানরাও চাননি। উভয়ের মিলিত প্রয়াসই পার্টিশান ডেকে এনেছে। অথচ তাঁরা সত্যিকার হিন্দু ভারত ও মুসলীম ভারতও গড়তে পারেন নি। তা করা হলে অন্তত সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে দেশ ভাগের মানেটা খুঁজে পাওয়া সহজসাধ্য হত। মুসলমানরা অবশ্য স্বকীয় চেষ্টায় পশ্চিম অংশকে মুসলীম ভারতে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন, পূর্ব তা পারেনি বলে তার জীবনে এখনো একটা সংখ্যালঘু সমস্যা মৃদু আকারে বেঁচে আছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত থাকবে না তা। কিন্তু কি পূর্বে আর কি পশ্চিমে, সংসদীয় গণতন্ত্র থেকেও একাধাপ পিছু হঠে গিয়ে তাঁরা হয়েছেন সামরিক একনায়কতন্ত্রের অনুগামী। প্রায় একই অবস্থা হতে চলেছিল ভারতেও। সুখের কথা যে সে দুঃস্বপ্ন শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। তথাকথিত গণতন্ত্রই টিঁকে আছে, যদিও পরস্পর-বিরোধী নানা স্বার্থের সংঘাতে উদ্বেল পুঁজিপতি-দের হাতে এই গোঁজামিলের গণতন্ত্রে নীচু সোপানের মানুষরা শুকিয়েই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন।

**। ইতিহাসের আলো-আঁধারি।**

শাসক শ্রেণীর স্বার্থে ইতিহাসের বিকৃতি-সাধন পৃথিবীতে চিরদিনই হয়েছে। অনেক সময় শক্তিশালী সম্রাট সামন্ত নরপতি বা রাষ্ট্রাধিনায়করা নিজেই আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা জাতীয় বই পুঁথি লিখেছেন স্বমহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে,নয়ত তাঁবেদার সভাসদ বা মুন্সীদের দিয়ে লিখেয়েছেন। এসব লেখায় শত্রু বা প্রতিপক্ষ বলে বিবেচিতদের সম্বন্ধে একদিকে যেমন যথেচ্ছ কটূক্তির ছড়াছড়ি দেখা যায়, অন্য দিকে তেমনি যাঁরা স্বয়ং নায়ক এবং যাঁরা তাঁদের অভিপ্রেত জন, তাঁদের সম্পর্কে পল্লবিত- অত্যুক্তির খতিয়ানে দেখা যায় কিছুমাত্র কার্পণ্য করা হয়নি। সমসাময়িককালে দলিল দস্তাবেজ থেকে, বিশেষত বিরোধী পক্ষের রচনা থেকে, তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করলে দেখা যায় যথোচিত পরিমাণ অনুসন্ধান ও পরীক্ষার আলোয় আহৃত বৃত্তান্তের

সত্যাসত্য যাচাই করার পরিবর্তে কল্পনার সাহায্যে নয়ত গুজব ও জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে এসব বইয়ে এমন সমস্ত সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো হয়েছে, পরবর্তীকালের বিচারে যা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। অথচ মানুষের উপায়ও নেই এইসব তথাকথিত ইতিহাস গ্রন্থের সাক্ষ্য-প্রমাণ মোটামুটি কবুল করে নেওয়া ছাড়া। কাজেই সমসাময়িক বিবরণ নামে অভিহিত পুরান ইতিহাসের যা বা যেটুকু আমরা পাই, তার মধ্যে খাঁটি ইতিহাস কতখানি, তা বুক ঠুকে বলা কঠিন। পুরান পৃথিবীর সম্রাট সেনানায়ক ধর্মগুরু পর্যটক প্রমুখের জীবন বৃত্তান্ত রূপে যে সব বই আমাদের কাল পর্যন্ত চলে এসেছে, তার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কিত যে সমস্ত শিলালিপি তাম্রশাসন মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে, সে সবের কি-বা-কতটা মিল অমিল, একালীন প্রত্নেতিহাসবিদ্‌রা তা এই জন্যে যাচাই বাছাই করে দেখছেন। অর্থাৎ হেরোডোটাস মেগাস্থিনিস জেনোফোন থুকিডিডিস প্লিনি লিভি সিজার তাসিতাসই হন, আর ইউয়ান-চুয়াং ফাহিয়ান ইৎসিন ইবন বতুতা আলবেরুনি মার্কোপোলো বার্ণিয়ার ট্রাভার্নিয়ারই হন, কারো সম্বন্ধেই তাই ষোল আন নিঃসংশয় হওয়া চলে না। এই জন্যেই লিখিত ইতিহাস অপেক্ষা ভূপ্রোথিত নৃতাত্ত্বিক ও প্রাত্নিক নিদর্শন, তুলনামূলক ধর্ম ও ভাষাতত্ত্ব এবং প্রাচীন সাহিত্যকে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে এ যুগে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় সব দেশেই।

প্রাচীন ইতিহাসের সত্যাসত্য নিরূপণে স্বীকৃত এই সীমাবদ্ধতাগুলো ছাড়াও আছে আরো অনেক সমস্যা। তার মধ্যে জাত্যভিমানজনিত মিথ্যাভাষণের এবং তাথ্যিক অসম্পূর্ণতা সম্ভূত ভ্রান্ত ধারণার স্থানই বোধ হয় সর্বাগ্রগণ্য। ইউরোপে বহুদিন পর্যন্ত মনে করা হত গ্রীস এবং রোম হল পৃথিবীতে পরের পর দুটি প্রাচীনতম সভ্যদেশ এবং এরাই হল মানব সভ্যতার সূতিকাগৃহ। আজ সবাই জানেন, মিশর সুমেরিয়া ইজরাইল মহেঞ্জোদাড়ো প্রভৃতির তুলনায় গ্রীস ও রোম যথেষ্ট অর্বাচীন, মাত্র সেদিনের দেশ। এমন কি বৈদিক ভারত ইরাণ এবং চীনও ওদের চেয়ে প্রাচীন। আসলে উনবিংশ শতাব্দীর আগে মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার অন্তরঙ্গ পরিচয় কেউ জানতেন না, কারণ তাঁদের বর্ণমালার পাঠোদ্ধারই সম্ভব হয় নি তখনো। এখন সবাই জানেন প্রাচীনতম সভ্যদেশ এগুলিই। শুধু তাই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা-কৃষ্টির অনেক মৌলিক তত্ত্বই আদিতে এঁদের দান। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পার লিপি অবশ্য এখনো অপঠিতই আছে। কিন্তু অন্য তথ্য যা জানা গেছে,

তাতেই আমাদের আর্যামির ইমারত ধ্বসে গেছে। আমরাও মনে করতাম বৈদিক আর্য সভ্যতাই ভারতে তথা বিশ্বে প্রাচীনতম এবং যাবতীয় ধ্যান জ্ঞানের মূল উৎস। মহেঞ্জোদাড়োর সমুন্নত প্রাত্নিক ঐশ্বর্য এই ধারণার মূলোচ্ছেদ করে একটি বলিষ্ঠ প্রাগার্য সভ্যতার পরিচয় তুলে ধরেছে। এই ভাবে নিত্য নূতন তথ্য ও উপকরণ যত হাতে আসছে, তত আসছে ইতিহাসে পালা বদলের দিন। এই সঙ্গেই আছে যুগ ও জীবনের ক্রমবিবর্তনজনিত মূল্যবোধের বিবর্তন ব্যাপারটাও, যার ফলে একদিন যে সমস্ত ব্যক্তি বিষয় বা ঘটনাকে যে চোখে দেখা হত, আর একদিন সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে দেখা হয়ে থাকে তাদের। গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতির প্রাণরসে পুষ্ট জড়বাদী প্রতীচ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রসার নিয়ে, রেনেসাঁস, ফরাসী বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব ইত্যাদি নিয়ে ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গীতে দীর্ঘদিন ধরে কত ভাঙাগড়া হয়েছে, এখনো হচ্ছে, তার খবর কমবেশী সবাই জানেন আশা করি। যে ক্রমওয়েলকে একদিন কবর থেকে তুলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, আজ তাঁকে জনমুক্তির অগ্রদূত বলা হচ্ছে। যে নেপোলিয়ান সমসাময়িকদের দ্বারা এক দিন ধিক্কৃত হয়েছিলেন ভাগ্যান্বেষী যুদ্ধবাজ নামে, তাঁকেই এখন বলা হচ্ছে ইউরোপীয় সংহতি ও সংসদীয় শাসনপদ্ধতির আদি পরিকল্পনাকার রূপে। আবার উল্টো-টাও দেখি। যে স্তালিন তাঁর জীবন কালে সোভিয়েত দেশে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁকে লেনিন মৌসলিয়াম থেকে ক্রেমলিনের সাধারণ কবরে সমাধিস্থ করা হয় এবং তাঁর সমস্ত কীর্তির আদ্যন্ত অবমূল্যায়ন শুরু হয়ে যায় এবং তা হয় সরকারী খবর্দারিতেই।

ভারতবর্ষের মানুষ আমরা ইউরোপীয়দের তুলনায় অবশ্যই একটু কম ইতিহাস সচেতন, একটু বেশী রক্ষণশীলও। তবু ঐতিহাসিক ধ্যান-ধারণার রাজ্যে আমাদের এখানেও ত ভাঙাগড়া হয়নি কম। মহেঞ্জোদাড়োর কথা আগেই বলেছি, যার ফলে বৈদিক ভারতের স্বপ্ন দিয়ে গড়া কল্পিত কাঠামোর অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। নূতন নূতন তথ্যের আলোয় বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ও শংকরের নেতৃত্বে হিন্দুত্বের অভ্যুদয় সম্পর্কীয় সাবেকী ধারণার ভিতও যথেষ্টই নড়ে গেছে। নড়ে গেছে মুঘল ভারতের তথাকথিত শান্তি ও সম-দর্শিতামূলক ধারণার ভিতও। আজ এ নিয়ে বিশেষ তর্ক নেই যে মুসলীম শাসনে হিন্দুর সামাজিক ও রাজনীতিক অধিকার খুবই সীমিত ছিল। এরই প্রতিবাদে হয়েছিল শিখ রাজপুত ও মারাঠী অভ্যুত্থান। চৈতন্যের নবদ্বীপ

ছেড়ে নীলাচল যাত্রা যে প্রেম বিতরণের জন্যে নয়, আসলে একই সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্র শক্তির প্রতিকূলতার ক্রিয়া এবং সন্ত-সাধুদের ঐক্যবাণী যে সরকারী অসমদর্শিতার প্রতিষেধক হিসাবেই সমাজের নিম্ন সোপানে হিন্দু মুসলমান সমন্বয়-সাধনের নিঃশব্দ প্রয়াস, এ ও আজ সবাই স্বীকার করেন। পরবর্তী কালে বর্গীরা যে মারাঠী দস্যু নয়, তারা যে করেছিল মুসলীম শাসকদের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিরোধের উদ্যমই এবং সিপাহী বিদ্রোহ যে গদীভ্রষ্ট সামন্ত নরপতিদের মতই আর্থনীতিক বঞ্চনাপ্রপীড়িত জনসাধারণেরও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা, এ নিয়ে আজ বোধহয় অধিকাংশ মানুষের মনেই কোন সংশয় নেই। এই ভাবে ত হয় ইতিহাসের পট পরিবর্তন এবং নিত্য নূতন উপকরণ ও তথ্য উদ্‌ঘাটনের ফলে, নিত্য নূতন জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাবে এই পরিবর্তনগুলি আসে, যা মেনে নিতে অনেক সময় আটকায় অভ্যস্ত ধারণায় অচলপ্রতিষ্ঠ মানুষদের। অন্ধ আত্মগরিমা বোধ, প্রগতিবিমুখ শিক্ষা-দীক্ষা, দলীয় রাজনীতির অনিষ্টকর প্রভাব, নানা জিনিসই একযোগে বাধা হয় সত্য ইতিহাসের অন্তর্লোকে অনুপ্রবেশের, আর জনগণের এই অচেতনতার সুযোগেই শাসকশক্তি ও বিশেষ বিশেষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী মতলব করে বিকৃত ইতিহাস প্রকাশ ও প্রচার করেন এবং বার বার বলার ফলে মিথ্যাই যে শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রকৃত সত্য যে যায় পিছু হঠে, এ নিশ্চয় বুঝিয়ে বলতে হবে না কারোকে।

২.

১৯৭৩ সালে স্বাধীনতার পঁচিশ বর্ষ পূর্তি অর্থাৎ রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের এক সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী একটি নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের আধারে ভূপ্রোথিত করা হয়। উদ্দেশ্য, দূর ভবিষ্যতে যখন আজকের দেশ ও মানুষের কোন চিহ্নই থাকবে না, বিচিত্র ভৌগোলিক ভাঙাগড়ার ফলে দুনিয়ার চেহারাই হয়ত আমূল পাল্টে যাবে, আর তার পরিপূরক রূপে বদলে যাবে মানুষের সামাজিক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীও, তখন একদা আমরা কিভাবে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতায় উন্নীত হয়েছিলাম, মানুষ তার ইতিহাস জানবেন এই ঘটনাপঞ্জী থেকে। উদ্দেশ্য বলা বাহুল্য সাধু। কিন্তু ধ্বংসশীল মহাকালের কবল থেকে এই আধারই যে রক্ষা পাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাছাড়া তখনকার মানুষ আজকের ভাষায় লেখা এই লিপির মর্মোদ্ধার করতে পারবেন, তারই

বা ভরসা কি? মিশর ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার লিপি মানুষ মাত্র সেদিন পড়তে পেরেছেন। গিলগামিস মহাকাব্যের বা হাম্মুরাবির ঘোষণার বা মিশরীয় মৃতের পুঁথির মর্ম তারপর জানা গেছে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পার লিপি বা মধ্য-দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা আজতেকদের গ্রন্থিলিপি এখনো অপঠিতই আছে। প্রিন্‌সেপ পাঠোদ্ধার করতে না পারলে ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ অশোকের লিপিরই বা পরিণাম কি হত? কাজেই খণ্ডকালের আধিপত্যে অন্ধ হয়ে অনাগত মহাকালকে যুদ্ধে আহ্বান করার সার্থকতা কি? তাছাড়া যতদূর জানা যাচ্ছে এই ঘটনাপঞ্জীতে নাকি একান্ত একপেশে ধরণের একটা ইতিহাসই দাঁড় করান হয়েছে। অনেক ঘটনার উল্লেখ নেই, অনেক নাম বাদ পড়েছে এবং ঐসময় যিনি শাসনতন্ত্রে প্রধান রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন শুধু তাঁর অভিপ্রেত ঘটনাবলীই গ্রথিত হয়েছে। অর্থাৎ ইতিহাস হিসাবেও এতে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচারের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

আমরা আগের অধ্যায়েই দেখেছি কিভাবে সুপ্রাচীনকাল থেকে ক্ষমতা-সম্পন্ন সম্রাট সামন্ত ও রাষ্ট্রনায়করা ইতিহাসকে আপন স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছেন। স্বমহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন স্পর্ধিত ঘোষণাবাণী কিভাবে গিরিগাত্রে পাথরে ধাতুফলকে উৎকীর্ণ করেছেন। সদম্ভ আত্মকাহিনী লিখেছেন, অথবা তাঁবেদার পণ্ডিত মন্ত্রী ও সভাসদদের দিয়ে লিখিয়েছেন। এসব শূন্যগর্ভ ইতিহাস হয়ত মানুষকে শাসকশ্রেণীর কল্পিত-শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে অবহিত করেছে। কিন্তু দেশ জাতি ও শিল্প সংস্কৃতির বা মানুষের জীবন ও জীবিকার বার্তা কি পাই আমরা এতে? প্রকৃতপক্ষে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যাত্রা শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত, অতীতের কতটুকু বিবরণ মানুষের গোচরে এসেছে অদ্যাবধি? সামান্যই নয় কি? কত দেশ জাতি ধর্ম ও সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে। কত আবিষ্কার অভিযান যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে পৃথিবীতে। কত জ্ঞান বিজ্ঞান ও কলাকৃষ্টির ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছে। তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশের পরিচয়ও কেউ আজ জানেন না। ভূতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব লিপিবিদ্যা মুদ্রাবিজ্ঞান, নানা জ্ঞানের সমীকরণ করে প্রাচীনতম দিন ও জীবনের একটা আলেখ্য তৈরি করেছেন এ যুগের সন্ধানী মানুষরা। তারপর ধাপে ধাপে কিছু উপকরণ, কিছু অনুমান আশ্রয় করে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা মধ্যযুগ পর্যন্ত। এই যাত্রা ধারাবাহিক ত নয়ই, এমন কি সম্পূর্ণও নয়। মাঝে মাঝে আছে দুরতিক্রম্য ফাঁক, যা পূরণের অব্যাহত

উত্তম চলেছে একদিকে, অন্যদিকে চলেছে যুগে যুগে নূতন নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে পুরান সব কিছুর নব মূল্যায়নের প্রয়াস। এর পরের ধাপ হল আধুনিক যুগ। কাজেই ইতিহাসের এই স্মৃতি বিস্মৃতির মোহানায় দাঁড়িয়ে, চিরচলমান কালকে উপেক্ষা করে ইস্পাতের আধারীভূত একটি লিখনের সাহায্যে অমর হবার চেষ্টা নিবুর্দ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ মনুষ্য জাতির নিত্য বহমান মিছিলের দিকে তাকিয়ে আমরা কে বা কি করেছি, সেই আত্মজিজ্ঞাসাই হওয়া উচিত আধুনিক ইতিহাসের লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যে সাফল্যের সঙ্গে উন্নীত হতে হলে চাই দেশ জাতি ও মানুষের প্রতি অকপট প্রেম, চাই বিনয় ও সত্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা। এ দুইয়ের কোনটাই আলোচ্য উত্তমের পিছনে ছিল বলে জানা যাচ্ছে না। কাজেই এই আধার তুলে ফেলা হয়েছে, এতে খুসী হওয়াই শ্রেয় বা সমীচীন মনে করি।

কিন্তু ইতিহাসের বিকৃতি সাধন শুধু আমরাই করছি বা করি তা নয়। তা করেছেন ও করেন সব দেশের, সব যুগের মানুষই। সাবেকী ইতিহাসের কিছু কিছু প্রসঙ্গ আগেই বলেছি। সাম্প্রতিককালের ইতিহাসেও একই জিনিস দেখতে পাই। প্রচারদক্ষ শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া আফ্রিকার যে ইতিহাস বিশ্বে প্রচার করেছেন, তা সর্বৈব অসত্য ও বিদ্বেষপূর্ণ। এই মিথ্যার আবরণ ভেদ করে যথার্থ ইতিহাস নূতন করে লেখার কাজ নিতে হবে দেশবাসীকেই। কিন্তু এখানেও বিপদ আছে। জাত্যভিমান, দলীয় রাজনীতি এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচারের মানসিকতা পদে পদে বাধা হতে পারে। মুসলীম ভারতের প্রকৃত ইতিহাস আমরা চিরদিন যথাসম্ভব অনুদ্‌ঘাটিতই রেখেছি জাতীয় আন্দোলনের স্বার্থে। আমরা দেখাতে চেয়েছি যে দেশে আদিতে হিন্দু-মুসলমান অক্ষুণ্ণ ঐক্যেই ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভেদনীতি সঞ্চারিত করেছে ইংরেজ শাসন। এ মিথ্যা যে কোন কাজে আসেনি ভারত-বিভাগই তার প্রমাণ। কংগ্রেস অহিংস যুদ্ধের পথে দেশ স্বাধীন করেছে, এ মিথ্যা ইতিহাসও ধোপে টেঁকেনি। আমরা জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বিচিত্র ঘটনা ধারাই পরাধীন এশিয়া আফ্রিকার মুক্তি এনে দিয়েছে। কংগ্রেসী রাজনীতি বরং অখণ্ড ভারতকে দ্বিখণ্ডিতই করেছে। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকাকে, আগষ্ট বিদ্রোহ ও আজাদ হিন্দের তথা ট্রেড ইউনিয়ন ও বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাসে বরাবরই ছোট করে দেখান হয়েছে। এককালে কংগ্রেস যেসব কাজের বিরোধিতা

করেছেন, পরে তা নিজেদের কীর্তি বলে দাবী করেছেন, এমন নজীরও আছে। দুঃখের বিষয় ইচ্ছাকৃত এইসব অসত্য ভাষণে মদৎ দেবার জন্যে ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিতের অভাব হয় না। তা না হলে এমনই একজন ইতিহাস-কারই বা ঐ বিতর্কিত কালাধারের বয়ান রচনা করলেন কেন ?

**। প্রত্যয় ও প্রমাণ ।**

বিচিত্র ধর্মবিধি দর্শন সাহিত্য কলাকৃষ্টি ও আচার সংস্কারের আলোয় ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি এবং জীবনচর্যার ক্রমিক ইতিহাস যথাসম্ভব সময়ানুক্রমে আলোচনা করা হল। এই দীর্ঘ আলোচনায় প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের অনুবৃত্তি না করে সর্বত্র যুক্তি বিচারের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তার ফল অনেক পুরান প্রত্যয়ের কাঠামো আমূল পাল্টে গেছে। এমন অনেক নূতন কথা এসেছে, যা আপাতদৃষ্টিতে অস্বস্তিকর ঠেকতে পারে। আসলে আমরা চেয়েছি সাধারণ নিঃসংস্কার মানুষের মন ও চোখ নিয়ে যথার্থ ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করতে। কল্পনার অনুরঞ্জনে রাঙিয়ে ব্রাহ্মণ্য বা আর্য ভারতের মহিমান্বিত চিত্র আঁকার চেষ্টা আমরা করিনি। সমস্ত বিষয় বৈষম্য ও অনৈক্যের উর্ধ্বে সুস্থ একটি সমন্বয়ে পৌছনই যে ভারতীয় জীবনচর্যার চির-দিনের লক্ষ্যরূপে গণ্য হয়েছে, জোর করে একথাও বোঝাতে চাইনি। বরং দেখিয়েছি যে উন্নততর প্রাগার্য সভ্যতার সৃষ্টি বেশির ভাগই যাযাবর আর্যদের হাতে ধ্বংস হয়েছে এবং প্রাগার্যেরা অনিবার্য কারণেই জাতীয় জীবনের মূল প্রবাহ থেকে স্খলিত হয়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন, অথবা শূদ্র-দাস হয়ে আর্য প্রভুদের তাঁবেদারি করেছেন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-বিরোধী নিরীশ্বর বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম উঠেছে এই নিগৃহীত শূদ্রদের জাগ্রত প্রতিবাদ হিসেবেই এবং ঈশ্বর আত্মা অদৃষ্ট [ কর্মফল ও পুনর্জন্ম ] ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ভ্রান্ত প্রত্যয়ের মূলো-চ্ছেদ করে তা বস্তুমুখী ও সাম্যাশ্রিত এক নূতন জীবনদর্শন প্রবর্তনের প্রয়াস করেছে। ক্রমে অবশ্য অভিজাত গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ হয়েছে বৌদ্ধধর্মে এবং বৈপ্লবিক ভাবমূর্তি হারিয়ে তা সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষকও হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কায়েমি স্বার্থ তাকে বাঁচতে দেয়নি। উঠেছে সংঘাতশীল হিন্দুধর্ম এবং স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের মধ্যে ফের দুরতিক্রম্য ভেদের প্রাচীর তৈরি হয়েছে। এই পটভূমিতেই পরের অধ্যায়ে এসেছে ইসলাম এবং অবনমিত হিন্দুর সুবৃহৎ একাংশ তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন সুবিচারের আশায়। সুবিচার সেখানেও মেলেনি। সেই নীচু সোপানেই দেহশ্রমী ও সর্বাধিকার-

বঞ্চিত ভূমিদাস হয়ে থেকেছেন তাঁরা। সব শেষে এসেছেন ইংরেজ এবং সমাজের উপরতলায় তাঁরা লাগিয়েছেন আধুনিকতার পালিশ। কিন্তু নীচু-তলা সেই অন্ধকারেই থেকেছে।

অর্থাৎ অন্যূন পাঁচ হাজার বছর ব্যাপী ভারত ইতিহাসের এই ত্বরিত প্রেক্ষণে আমরা দেখলাম, যেদিন থেকে বৈদিক আর্যদের অনুপ্রবেশ হয়েছে, সেদিন থেকে এদেশের সাধারণ শ্রমকারী মানুষ, চাষী কারিগর ও দেহশ্রমী মজুর, সর্বনিম্ন মানবিক অধিকারটুকুও পান নি। তাঁদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গত দাবীও উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ তাঁদের পুরুষের মেহনত ও নারীর ইজ্জত দুহাতে ভাঙিয়ে ওপরতলার ভাগ্যবানেরা স্ফীত হয়েছেন। লোকায়ত অর্থাৎ বস্তুবাদী দর্শনের প্রবক্তারা ও বৌদ্ধেরা এর বিরোধিতা করেছেন। তার ফলে তাঁরা যা কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন জীবন এবং জীবিকার ক্ষেত্রে, প্রতিক্রিয়ার মুঠি সজোরে ছিনিয়ে নিয়েছে তা।

ঐসলামীয় সাম্য হোক, খ্রীষ্টীয় মানবতা হোক, আর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র-গান্ধী-সংস্কৃতি হোক, কোন কিছুতেই অবস্থার হেরফের হয়নি। হয়নি তার কারণ ঈশ্বর, অবতার, জন্মান্তর ও কর্মফল এবং পাপ পুণ্যে বিশ্বাসী জীবনবোধ, আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফামুখী অর্থাৎ অস্তিবান্ ও নাস্তি-বানে বিভক্ত সমাজ-কাঠামো একটানা অনড় হয়ে থেকেছে বলে। ইতিহাসের শিক্ষায় যাঁরা আস্থাসম্পন্ন, তাঁরা জানেন একটি সর্বাত্মক বিপ্লব ছাড়া এই জীবন ও সমাজ কাঠামো বদলাবে না কোনদিন। ডাল ছাঁটাই করে যেমন কখনো বিষবৃক্ষ ধ্বংস করা যায় না, তেমনি সদ্বুদ্ধির আবেদনে শোষণ ও অসাম্য কলুষিত সমাজ-সংস্কৃতিরও বিবর্তন ঘটান যায় না। মধ্যযুগীয় সন্ত-সাধুদের আমল থেকে আজকের নায়ক ও সংস্কারকরা পর্যন্ত সবাই সে চেষ্টা করে কি ফল পেয়েছেন? প্রকৃতপক্ষে কিছুই না। যে দেশে মোট অধিবাসীর দুই-তৃতীয়াংশই নিরক্ষর, ভদ্র ও উন্নত বলে কথিতদের বিচারে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য এবং বেশির ভাগই ভূমিহীন, বিষয়-বৈভবহীন ও অনিশ্চিত রুজি-রোজগারের মুখাপেক্ষী, সেদেশে মানুষের সর্বাত্মক মঙ্গল একমাত্র আর্থনীতিক ছক আমূল পাল্টানর দ্বারাই ঘটান যেতে পারে। সমস্ত উৎপাদন যন্ত্র কৃষিক্ষেত্র কল-কারখানা যানবাহন যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শিক্ষা চিকিৎসা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সরকারী এক্তিয়ারে নেওয়া, শ্রেণী ও বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শিশু ও কিশোরকে শিক্ষার ও সমর্থদেহ সমস্ত বয়স্ক নরনারীকে উপার্জনের আওতায়

আনা, আর বিজ্ঞান ও ইতিহাস-ভিত্তিক জগৎ ও জীবন-চেতনায় প্রতিটি মানুষকে পুনর্বসতি দেওয়া অর্থাৎ অলৌকিক আশ্চর্য উদ্ভট বা অবিশ্বাস্যের মোহ-মুক্ত করে বস্তুসম্মত নূতন বোধে প্রতিষ্ঠিত করাই হল সেই সার্বিক মঙ্গলের উপায়। তা ধর্মের দোহাইয়ে হবে না, ভূদান, নৈতিক পুনরুজ্জীবন, সার্বভৌম মৈত্রী ও মানবতার আবেদন, কোনটাতেই হবে না। হবে না তথাকথিত গণতান্ত্রিক উপায়ে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমেও। রুশ বিপ্লব বা চীন বিপ্লবের মত একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব চাই। চাই নীচে ওপরে হুজুরে মজুরে একাকার করে দেবার মত একটি বৃহৎ বিপর্যয়। কায়েমি স্বার্থের যেখানে যত ঘাঁটি আছে, সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দেবার এবং প্রতিরোধের সমস্ত প্রাচীর গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেবার মত শক্তিশালী প্রস্তুতি চাই।

তার মানে সতেজ ও সমুন্নত যে নূতন ভারতের স্বপ্ন দেখি আমরা, তাকে শুধু কল্পনার মধ্যে লালন করলে হবে না। শুধু সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত ও অগ্রবর্তী মানুষের ভারতবর্ষকে সমগ্র দেশ ভাবলে এবং তাঁদের বিচরণ ক্ষেত্র-গুলিতে গড়ে-ওঠা নগর বন্দর বাণিজ্যকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিকেই দেশ-কল্যাণের শেষ কথা ভাবলে চলবে না। প্রকৃত দেশ জনগণকে নিয়ে, তাঁদের সার্থক মানবিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তা করার উপায় হল তাঁদেরকে অশিক্ষা দারিদ্র্য ভয় ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেওয়া। নিছক অজ্ঞানতার বিপাকেই জীবজন্তুর মত নির্বিচারে বংশবৃদ্ধি করে তাঁরা দৈন্যের পঙ্কে হাবুডুবু খান। তা থেকে ত্রাণের উপায় হাতে তুলে দিলেও তা নিতে ভরসা পান না, ধর্মহানির ভয়ে। সাধু মোহান্ত গুরু পুরোহিত দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষীরা এই সর্বগ্রাসী অজ্ঞানতার সুযোগেই তাঁদের সর্বক্ষেত্রে দাবিয়ে রাখেন। জড়তা ও কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমগ্ন এই মানুষরা মুক্তির বার্তা কোন্ পথে তা জানতেও পারেন না, কেননা মানুষের প্রধান বল যে দুটি জিনিস, শিক্ষালব্ধ আত্মচেতনা ও আর্থিক স্বাবলম্বিতা, তার সহায়তায় তাঁদের বলীয়ান করে তুলতে এবং সকলকে জীবনের পথে সমপরিমাণ সুবিবেচনায় বড় করে দাঁড় করাতে চাইনি আমরা কোনদিন। জাতি ভেদ ধর্ম ভেদ অধিকার ভেদ, নানা কৃত্রিম ভেদ বিভেদের গণ্ডী তৈরি করে মানুষকে আমরা মানুষের সঙ্গে এক হতে দিই নি। আজ সময় এসেছে, যখন সাম্যাশ্রিত নূতন সমাজের অভিমুখে পা বাড়াতে হবে আমাদের। আর তার জন্যেই সমস্ত অবরোধ চূর্ণ করে খোলা আলো হাওয়ায় বেরিয়ে আসতে হবে। তারই অনুপ্রেরণায়

বলা বাহুল্য এই কালানুক্রমিক ভারত-ইতিহাস-সমীক্ষা একেবারে বেদপূর্ব কাল থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরবর্তী কংগ্রেসী শাসনের সাম্প্রতিক পতন ও পুনরুত্থানের কাল পর্যন্ত টানা হয়েছে। এই বিস্তীর্ণ সময় সীমায় যত রকম ধর্মীয় রাজনীতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রবাহ এই উপ-মহাদেশের জীবন মনন ও মৃত্তিকাকে স্পর্শ করেছে, তার একটা ধারাবাহিক আলেখ্য মেলে ধরা হয়েছে এতে এবং কবি কল্পনা ও ভাবুকতার কুয়াশায় ইতিহাসকে আবৃত করার বা বিশেষ রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে সত্য ইতিহাস বিকৃত করার অপপ্রয়াস যা হয়েছে, তা খণ্ডনেরও চেষ্টা হয়েছে একই কারণে। কোন প্রসঙ্গেই বিশেষজ্ঞতার দাবী না রেখে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও জীবনবোধের যথার্থ রূপটি উপলব্ধির পথে সহায়ক হবে মনে করে এশিয়া আফ্রিকার মুখ্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলিকেও আলোচনার পটভূমি হিসাবে বহুক্ষেত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা এর আগে বোধহয় খুব বেশী করা হয় নি।

॥ কথাসাঙ্গ ঃ ভাবী ভারতের খসড়া ॥

ভাবী দিনের ভারতবর্ষ কি রকম হবে, কি রকম রাজনীতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ছাঁচ তদানীন্তন প্রশাসকরা অনুসরণ করবেন, তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে লাভ নেই। কারণ পৃথিবীর কোন দেশই এযুগে আর একক না, তাকে চলতে হয় সমগ্র দুনিয়ার অগ্রযাত্রার সংগে এক তালে পা ফেলে। যদি বিশ্বে আবার একটা মহাযুদ্ধ বাধে এবং যদি তা শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত হয়, তাহলে অন্যদের সংগে আমাদের ভাগ্যেও দুর্যোগের কালো মেঘ দেখা দেবে। সেই জন্যেই সারা পৃথিবীর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নরনারী আজ শান্তি আন্দোলনে সংহত হয়েছেন। এই আন্দোলনের দ্বারা নৈতিক চাপ সৃষ্টি করে বিশ্বের রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অধীশ্বরদের মতি পরিবর্তন ঘটাতে সচেষ্ট হতে হবে আমাদের সকলকেই।

কিন্তু আত্মরক্ষার এই সংগ্রামে শক্তি সঞ্চয় যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শিক্ষায় স্বাস্থ্যে জীবিকায় ছোট-বড় নির্বিশেষে দেশের সমস্ত মানুষকে স্বনির্ভরশীল করে তোলা। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও অগ্রগামী মানুষ নিয়ে কোন দেশই বড় হতে বা বাঁচতে পারে না। জাতি মানেই সমষ্টি মানুষ। সেই মানুষ এখনো যে দীন-দশায় আছেন, তার নানা দিক এই বইয়ের পূর্ব অধ্যায়-গুলিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। নিছক প্রশাসনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে এ

দুরবস্থার কোন দিন প্রতিকার হবে না। সমস্ত বিদ্বৎ সংস্থা, দায়িত্বশীল সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতিক সংঘকে একযোগে অগ্রণী হতে হবে এই সুপ্রাচীন কলঙ্ক অপসারণে। মানুষকে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন দেশের মঙ্গল নেই, একথা যেন আমরা কোন দিন বিস্মৃত না হই।

অর্থাৎ ধনসাম্য ও অধিকার-সাম্যই যদিও সমুন্নত দেশ গড়ার প্রাথমিক ভিত্তি, তবু তত দূর যেতে হয়ত সময় লাগবে। ইতিমধ্যে ধনী দরিদ্রের মাঝখানের ব্যবধান একটু একটু করে কমিয়ে আনা ত যায় এবং অশিক্ষা ও জড়তার পাষাণভার থেকে জনগণকে হাত ধরে একপা একপা করে মুক্তির পথেও ত এগিয়ে আনা যায়। সর্বনিম্ন শিক্ষা জীবিকা ও চিকিৎসা যাতে সবাই পান, সবাই যাতে মাথা গোঁজার মত নিজস্ব একটু ঠাঁই পান, সে ব্যবস্থা ত করা যায়। তাই হল সুস্থ সমাজতান্ত্রিক পুনর্বাসনের পথ এবং শুভ-বুদ্ধির প্রেরণায় সেই পথে যত দিন না আগুয়ান হচ্ছি আমরা, তত দিন যথার্থ হিতব্রতী রাষ্ট্র কিছুতেই জন্মগ্রহণ করবে না এবং তা না করলে প্রকৃত মঙ্গলেরও আশা নেই, যতই কেন না আমরা নূতন নূতন পরিকল্পনা করি এবং দেশে বিদেশে প্রশংসা ও জয়ধ্বনিতে সংবর্ধিত হই॥

## ।। প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী ।।


Adhya, G. L. : Economics of Earlv India

Basham, A. L. : Wonder that was India

Chanana, D. R. : Slavery in Ancient India

Chattopadhyay, D. P. : Lokayata

Dasgupta, S. N. : History of India Philosophy [ Vols. 1-4 ]

Dyakov. A. M. & Balabushevich, V. V. : A Contemporary History of India

Engels, F. : Origin of the Family Private Property & State

Gordon, D. H. : The Pre-historic Background of Indian Culture

Gordon-Childe, V : Social Evolution

Husaini, S. A. Q. : The Economic History of India [ Vol. 1 ]

Kosambi, D. D. : An Introduction to the Study of Indian History

: The Culture & Civilisation of Ancient India

Sen, A. K. : People & Politics of Early Mediaeval India

Spellman. J. W. : Political History of Ancient India

Sharma, R. S. : Sudras in Ancient India

চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ : তন্ত্রশাস্ত্র

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ : ভারতীয় সমাজপদ্ধতি [ ১ম খণ্ড ]

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ : ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য

বন্দ্যোপাধ্যায়, জীতেন্দ্রনাথ : পঞ্চোপাসনা

রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙালীর ইতিহাস [ আদিপর্ব ]

সাংকৃত্যায়ন, রাহুল : বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ [ অনূদিত ]

সেন, ক্ষিতিমোহন : মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা

সুর, অতুল : হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য

হালদার, গোপাল : সংস্কৃতির রূপান্তর